প্রকাশক :—
সুধীন্দ্র চৌধুরী
৮২, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রকাশ : ১৩৬৭

মুদ্রক :
শ্রীলক্ষ্মী প্রেস
শ্রীশক্তিপদ পাল
৩৬ ডি, [illegible]
কলিকাতা

রাশিয়ার রাজদূত মাইকেল স্ট্রগফ

এক

ইয়োর একসেলেনসি, টেলিগ্রাম।

টেলিগ্রাম? কোথা থেকে?

টমস্ক থেকে একসেলেনসি।

ওদিকেও কি টেলিগ্রাফের কানেকশন কেটে দিয়েছে?

হাঁ, টমস্কের ওদিকে কোনো তার পাঠানো যাচ্ছে না, কানেকশন একেবারে কেটে দিয়েছে।

যাক্ তাহলে আমাদের টেলিগ্রাম ঠিক সময়েই পাঠিয়েছিলুম, শোনো, কোনো খবর এলেই আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে।

জেনারেল কিশফ বুটের সঙ্গে বুট ঠেকিয়ে স্যালুট করে বলল, ভুল হবে না একসেলেনসি।

হিজ একসেলেনসির সঙ্গে জেনারেল কিশফের যখন এইমত কথা হচ্ছিল তখন মধ্যরাত্রি পার হয়েছে। প্রাসাদ আলোয় ঝলমল করছে, আনন্দ উল্লাস চলেছে।

নানা দেশ থেকে মিলিটারিরা এসেছে। সন্ধ্যা থেকে তারা কত রকম কসরৎ দেখিয়েছে বিশেষ করে একোয়েষ্ট্রিয়ান, ঘোড়ার খেলা।

এখন চলছে আঞ্চলিক লোকনৃত্য। চলছে তলোয়ারের খেলা।

রাজপ্রাসাদ সবে তৈরি হয়েছে, আধুনিক রুচি অনুসারে সাজানো হয়েছে, জলের মতো রুবল খরচ করা হয়েছে। এখানে ওখানে শার্সিতে কাঁচই বসানো হয়েছে কতরকম, দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, অবাক হয়ে যেতে হয় কারুকার্য দেখে। চারদিকে আলোর বন্যা বইছে। আলোই কতরকম। বারান্দার বাহার আর কারুকার্য দেখলে প্রশংসা না করে পারা যায় না।

বন্দুক কাঁধে জরি বসানো পোশাক পরে সিপাইরা পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে। অর্কেস্ট্রার সুমধুর আওয়াজ এখানেও ভেসে আসছে। তারা যেন তালে তালে লেফট রাইট করছে। মাঝে মাঝে আলো পড়ে তাদের হেলমেট ঝকঝক করে উঠছে।

নানারকমের নরনারীর ভিড়—জানালা পথে উৎসব সমারোহ দেখছে।

কাছেই সেই ছোট্ট নদী। ছোট ছোট নৌকো স্রোতে ভেসে চলেছে। ভূতের চোখের মতো অন্ধকারে মিটি মিটি আলো জ্বলছে।

নতুন প্রাসাদে এই আনন্দ উল্লাসের মধ্যে একজন পুরুষ একদিকে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। শান্ত, প্রতিভাদীপ্ত, অচঞ্চল। কাছেই ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকটি অফিসার, কসাক ও সার্কাসিয়ান বডিগার্ড।

পোশাকে কোনো জাঁকজমক নেই। দীর্ঘ, বলিষ্ঠ গড়ন, খাড়া নাক। সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অভ্যাগতদের দিকে চেয়ে ধীরভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন। কারও সঙ্গে নম্রভাবে দু' একটা কথাও বলছেন।

ওদিকে নাচগান অব্যাহতভাবে চলেছে। অতিথিরা নিজেরাই মশগুল। কত রকম কথা বলছেন, মন্তব্য করছেন। তিনি নির্বিকার, গম্ভীর।

কিন্তু কাছেই হয়ত ভিন্ন প্রকৃতির কেউ কেউ ছিলেন। তাঁরা লক্ষ্য করলেন তাঁর মুখে যেন একটা অশান্তির ছায়া। আসন্ন কোনো বিপদ। তাঁরা নানারকম অনুমান করতে লাগলেন।

নৃত্যগীত সমানে চলতে লাগল।

এক পা দু' পা করে তিনি প্রশস্ত হলের এক পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে টেলিগ্রামখানা বার করে মন দিয়ে পড়তে লাগলেন। ভ্রূ কুঞ্চিত হল তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ডান হাতটা নেমে পড়ল কোমরে ঝোলানো তলোয়ারের হাতের ওপর। কিন্তু তৎক্ষণাৎ হাত তুলে নিয়ে চোখ ঢাকলেন হয়ত চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আড়াল করতে চাইলেন।

একটু পরেই হাত তুলে নিয়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে দাঁড়ালেন। কিপকভ সঙ্গে এসেছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

তাহলে গ্রাণ্ড ডিউকের কোনো খবরই পাওয়া যাচ্ছে না?

তাইত দেখছি এক্সেলেন্সি। সাইবেরিয়ার দিকে বোধহয় আর কোনো খবরই পাঠানো যাবে না।

কিন্তু তোমরা কি আমুর ও ইরকুটস্ক প্রদেশের আর ট্রান্সবৈকাল রাজ্যের আমিরকে ইরকুটস্কে যাবার অর্ডার দিয়েছ?

নিশ্চয় স্যার, সে অর্ডার চলে গেছে আগের টেলিগ্রামে। সে খবর লেক পার হয়ে গেছে আশা করছি।

কিন্তু সেই ট্রেটরটা কোথায়? নরাধম ওগারেফ? তার কোনো খবর জান?

তারই কোনো খবর নেই। বদমাইস বেইমান নেমকহারামটা বর্ডার পার হয়ে পালিয়েছে কি না সে খবর পুলিশ এখনও পায় নি।

তাহলে একটা কাজ কর। এখনও ত অনেক জায়গায় টেলিগ্রাফের কানেকশন আছে। তোমরা শয়তান ট্রেটরটার চেহারার বর্ণনা দিয়ে সেইসব জায়গায় খবর পাঠাও। দেখতে পেলেই যেন গ্রেফতার করে কিন্তু খুব সাবধান, খুব গোপনে, ঘুণাক্ষরেও কেউ যেন টের না পায়।

কিশফ আবার স্যালুট করে চলে গেল।

একটা ব্যবস্থা করতে পেরে তিনি অনেকটা সহজ হয়ে অভ্যাগতদের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে লাগলেন।

গেস্টদের জন্যে সংরক্ষিত গ্যালারিতে দু'জন বিদেশী ফিসফাস করে কথা বলছে। সাধারণ পোশাক এবং দু'জনের পোশাক প্রায় একই রকম। দুজনেই লম্বা।

দু'জনের মধ্যে একজন ইংরেজ, অপরজন ফরাসী। ইংরেজের গায়ের রং লাল আর ফরাসী ধবধবে। ফিসফাস করে কথা বলার মাঝে মাঝে ওদের দুজনের চোখ কিন্তু চারদিকে ঘুরছে, কান সজাগ। দুজনের মধ্যে একটু তফাত আছে। ফরাসীর চোখে কিছু এড়াচ্ছে না তেমনি ইংরেজের কানেও সব কিছু রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর যত চক্রান্ত, মন্ত্রণা, আর ষড়যন্ত্র সব এদের বুঝি জানা আছে।

দু'জনেই সাংবাদিক। ইংরেজটি লণ্ডনের ডেলি টেলিগ্রাফের রিপোর্টার আর ফরাসীটি রহস্যময়, সে তার কাগজের নাম করে না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে অদ্ভুতভাবে হাসে। চাপাচাপি করলে বলে, আমার সিস্টার ম্যাডালিনের হয়ে আমি খবর শিকার করি।

সংবাদ শিকারে তারা অত্যন্ত উৎসাহী। একটু গন্ধ পেলেই হলো। তারপর লাফিয়ে ওঠে। তাদের সাহস আছে। খবর সংগ্রহের জন্যে তারা সব বিপদ তুচ্ছ করে। নদ-নদী সাঁতরে পার হয়, বরফ ঢাকা পাহাড় ডিঙিয়ে যায় আর বাঘে ভর্তি অরণ্য তাদের কাছে যেন কিছু নয়। কর্তব্যের ডাকে তারা যদি কি বাজি ধরে যেন ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়।

ফরাসী সাংবাদিকের নাম অলসাইড জুলিভেট আর ইংরেজটির নাম হ্যারি ব্লাউন্ট। নতুন প্যালেসে তারা তাদের এই পরিচয় দিয়েছে তবে খবর সংগ্রহ করতে তারা কিছু ছদ্মবেশের আশ্রয় নিয়েছে।

সেদিন সন্ধ্যা থেকেই অলসাইড জুলিভেট আর হ্যারি ব্লাউন্ট দুজনেই খুব

সড়ক। নতুন প্যালেসে ঢুকে তাদের মনে হল উৎসব আনন্দে মুখরিত হলেও বাতাস যেন ভারি। ওরা বুঝি গন্ধ পায়।

জলিভেট ক্যামেরা প্যান করে নেবার মতো করে চারদিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে আপন মনেই বলল, যদি সাধারণ একটা জংলী হাঁস হয়ে থাকলেও তুমি শিকারীর চোখে ধরা পড়ে গেছ।

ব্লাউন্ট তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শুধু চাইল মাত্র।

অর্কেস্ট্রা কিছুক্ষণ চলে যাওয়া মাত্র তারা নড়েচড়ে বসল, আরম্ভ হল গুড়ুর গুড়ুর দুদুর দুদুর।

খুশি খুশি মনে জলিভেট বলল, শাভনি।

ব্লাউন্ট বলল, মারভেলাস। আমি আগেই টেলিগ্রাম করে দিয়েছি।

জলিভেট বলল, আমার সিস্টারকে জানাতেই হবে…

বাধা দিয়ে হ্যারি বলল, তোমার সিস্টার?

অলসাইড বলল, আরে হাঁ। আমার সিস্টার, বোন, ম্যাডালিন। ও সব সময়ে ফ্রেশ নিউজ চায়। আমি ওকে বলেছি এই নতুন প্যালেসের ব্যাংকেট হলে ছোট হলেও কালো মেঘ দেখা দিয়েছে আর সেই মেঘের ছায়া পড়েছে তাদের মুখে।

হ্যারিও এই ছায়া লক্ষ করেছে কিন্তু তা প্রকাশ করল না। অলসাইডের মুখ থেকে নতুন কিছু শোনবার আশায় প্রশ্ন করল, কিসের ছায়া? ও তোমার মনের ভুল।

অলসাইড ভীষণ ধূর্ত। তার ইংরেজ সহযোগীর চালাকি বুঝতে পেরে বলল, আমি বলে দিই আর তুমি তা ডেলি টেলিগ্রাফে ছাপিয়ে দাও আর কি!

হ্যারি হেসে ফেলেও বলল, তা পারি বই কি।

অলসাইড অন্য পথে গেল। হ্যারিকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা মিঃ ব্লাউন্ট তোমার কি মনে পড়ে সেই এইটিন টুয়েলভে ব্যাংকেট সিটিতে কি ঘটেছিল?

মনে পড়বে না মানে? চোখের সামনে সব জ্বলজ্বল করছে। মনে হচ্ছে আমি নিজেই বুঝি সেখানে হাজির ছিলুম।

অলসাইড বলল। তাহলে ত তুমি সবই জান, সেখানে সেদিনও চলেছিল এমনি মহোৎসব। উৎসবের হোতা ছিলেন স্বয়ং এমপারার আলেকজান্ডার। আর সেই সময়ে দুঃসংবাদ এল দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ন দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসছেন। তিনি অলরেডি নিমেন রিভার ক্রস করেছেন। তা সত্ত্বেও এমপারার যেন নির্বিকার। রাজধানী বিমর্ষ, খুবই খারাপ খবর, তবুও

উৎসবের যদি অবহানি হয় এই ভেবে তিনি অবিচলিত থাকবার চেষ্টা করলেন।

হ্যারি নিজেকে আর সামলে রাখতে পারল না, বলেই ফেলল, কিন্তু দেখ আজ এই উৎসবের যিনি নেতা তাঁর ধৈর্য কিন্তু আলেকজাণ্ডারের চেয়েও বেশি। তুমি কি লক্ষ্য করেছ কিশক যখন টেলিগ্রামখানা হাতে দিল তখনই তিনি জানালেন যে বিদ্রোহীরা সীমান্ত ও ইরকুটসের টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়েছে তবুও তিনি অবিচল।

জুলিভেট হো হো করে হেসে উঠল, আরে তুমিও জেনে ফেলেছ ?

ব্লাউন্টও নিজেকে চাপতে পারল না, হুঁ হুঁ, তুমি একাই জানবে ?

জুলিভেট বলল, তাহলে শোনো, এই খবর টেলিগ্রাম মারফত এতক্ষণে ওডিনস্ক স্টেশনে পৌঁছে গেছে।

ব্লাউন্টও গম্ভীরভাবে বলল, আমার টেলিগ্রামও এতক্ষণে ক্রেলনেয়ার্সি-এ পৌঁছে গেছে।

তাহলে তুমি জান যে নিকলেভস্কের সেনাবাহিনীকে রেডি থাকবার জন্যে হুকুম দেওয়া হয়েছে ?

জানি, এদিকে টবলস্ক রাজ্যের কসাক আর্মির ওপরও হুকুম হয়েছে।

খবর সত্যি মিঃ ব্লাউন্ট, আমিও পাকা খবর পেয়েছি। এ খবরটাও আমার সিস্টার ম্যাডালিন কাল ভোরে পেয়ে যাবে।

কাল ভোরে ডেলি টেলিগ্রাফের পাঠকরাও আমার পাঠান এই খবর পড়বে।

তাহলে এবার চল আমরা এখান থেকে কেটে পড়ি। এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়।

কিছুক্ষণ পরে জেনারেল কিশক আবার ফিরে এল ব্যস্তভাবে। জানাল টমস্কের লাইন কেটে গেছে।

সৌম্যমূর্তি অফিসার কি ভাবলেন। বললেন : একজন পাকা সংবাদবাহক আমার কাছে পাঠাও। এখনি।—এই বলেই তিনি উৎসব-ঘরের বারান্দা পেরিয়ে একটা ছোট কামরায় ঢুকলেন।

প্রাসাদের এক কোণে এই নির্জন কামরা। ভেতরে আসবাব-পত্রের পারিপাট্য নেই,—একটি সাধারণ টেবিল ও দুখানি চেয়ার। দেয়ালে টানানো প্রসিদ্ধ শিল্পীর আঁকা খানকয় বাঁধানো ছবি।

প্রথমেই তিনি বন্ধ জানালা খুলে দিলেন। বাতাসের অভাবে তাঁর প্রাণ

যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল। তাই তিনি জানালার ধারে হাত রেখে বাহিরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

গভীর রাত্রি। তখন চাঁদ উঠেছে চাঁদের আলোয় প্রকৃতির মনোরম রূপ। নীচে সুরক্ষিত প্রাচীর। পাশে দুইটি গির্জা ও একটি বড় অস্ত্রাগার। এই সীমারেখার বাইরে স্পষ্ট দেখা যায় আরও তিনটি শহর। শহরের বড় বড় দেয়াল, শত শত গির্জার রূপালি রং-করানো চূড়া আর মসজিদের গম্বুজ। অদূরে জোৎস্নায় কলকল করছে একটি ছোট্ট নদী।

নদীর নাম মস্কোভা। পারে মস্কো শহর। একপাশে প্রাচীর-ঘেরা নূতন ক্রেমলিন রাজপ্রাসাদ। সাধারণ পোষাক-ধারী সৌম্য শান্ত অফিসার স্বয়ং রাশিয়ার জার। জানালার পাশে তিনি দাঁড়িয়ে। চিন্তিত মুখ, কুঞ্চিত ভ্রূ। ঘুম কোথায় চলে গেছে কে জানে। উৎসব-কলরব তখনও অবাধে চলেছে। তারই অস্পষ্ট রেশ ক্ষণে ক্ষণে ভেসে আসছে বাতাসে।

দুই

বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল সাইবেরিয়া।

সাইবেরিয়া খুব বড় রাজ্য। বিস্তৃতি ১১,৯০,২০৮, বর্গমাইল। ইউরোপ ও এশিয়ার সীমায় উরাল পর্বত। সেখান থেকে এই রাজ্যের আরম্ভ। পূর্বদিকে প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণে চীন সাম্রাজ্য ও তুর্কিস্থান, উত্তরে মেরুসাগর, কারা-সাগর ও বেরিং প্রণালী। মরুময় দেশ—নীরস, শীতল; কচিৎ কোন কোন অঞ্চল উর্বর। অধিকাংশ অধিবাসীই যাযাবর কিরঘীজ জাতি।

এই রাজ্যের ভেতর দিয়ে চলেছে য়েনিসী নদীর একটি শাখা-স্রোত। দুই পারে পূর্ব ও পশ্চিমে দুইটি বিভাগ— রাশিয়া সাম্রাজ্যের অধীন। শাসনভার দুইজন রাজপ্রতিনিধির উপর। পশ্চিম সাইবেরিয়ার রাজধানী ইরকুটস্ক নগর

যে সময়ের ঘটনা, তখনও সাইবেরিয়ায় রেলপথ হয়নি। তবে পূর্ব-সীমান্ত অবধি টেলিগ্রাফের লাইন বসানো হয়েছিল। শাসন-কার্যে রাশিয়ার সঙ্গে এভাবে ছিল সাইবেরিয়ার যোগাযোগ।

১৫ই জুলাই মস্কোর নূতন প্রাসাদে উৎসব-সমারোহকালে যে টেলিগ্রাম আসে, তাতে জানা যায়, উরাল সীমান্তে তাতার দল বিদ্রোহী হয়েছে। বিদ্রোহীরা এরমধ্যেই টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলো উপড়ে ফেলে তার কেটে দেয়।

ফলে রাশিয়া ও সাইবেরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মহারাজা জার এই কারণেই উৎসব-সভা ছেড়ে অতি সত্বর চলে আসেন।

ইতিমধ্যে আহ্বান পেয়ে পুলিশের বড়কর্তা সেখানে এলেন। জার তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন: আসুন জেনারেল, আইভান ওগারেফ সম্পর্কে সকল খবর আমার জানা দরকার।

পুলিশ অফিসার বললেন: সে লোক ভীষণ দুর্দান্ত।

—এক সময়ে সে রাশিয়ার কর্নেল ছিল, না?

—হাঁ, হুজুর!

—লোকটি কি যথার্থই কৌশলী?

—ভয়ানক কূট-কৌশলী। এবং তাকে নিরস্ত করা সহজ ব্যাপার নয়। লোকটি দুরন্ত সাহসী ও ক্ষমতালোভী। এই ক্ষমতার লোভেই একবার সে গোপন-ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। মাননীয় গ্র্যাণ্ড ডিউক টের পেয়ে তাকে পদচ্যুত করে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দিয়েছিলেন।

—সে কতদিনের কথা?

—দুবছর আগের। কিন্তু ছয়মাস পরেই হুজুরের অনুগ্রহে সে মুক্তি পায়।

—এ ঘটনার পরে সে কি আর কখনও সাইবেরিয়ায় যায় নি?

—গিয়েছে বৈকি। কিন্তু সে যাওয়া তার নিজের গরজে যাওয়া।

এই বলেই সুর নরম করে পুলিশ অফিসার আবার বললেন: কিন্তু এমন একদিন ছিল হুজুর, যখন সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হলে কেউ ফিরতে পারত না।

—নিজের গরজে সাইবেরিয়া ঘুরে সে কি দ্বিতীয়বার ফেরে নি?

হাঁ, ফিরেছিল।

—তখন থেকে পুলিশ কি তার গতিবিধির খবর রাখেনি?

—রেখেছে হুজুর। তবে কথা এই—দুরন্ত অপরাধী যদি একবার ক্ষমা পায়, তাহলে সে আরও সাংঘাতিক হয়ে ওঠে।

—শেষ পর্যন্ত কোথায় তার খবর পাওয়া গেছে?

—পার্ম প্রদেশে।

—সে কবে?

—গত মার্চ মাসে।

—পুলিশ কি আর কোন খবর পায়নি?

—না হুজুর।

—বটে! তবে জানুন তার পরের ব্যাপার।—জার বললেন: [illegible]

উৎকোবয়র থেকে আমি এমন সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করেছি যা পুলিশ বিভাগের চোখেও পড়েনি। সীমান্তে যে গোলযোগ দেখা দিয়েছে তাতে সে-সব খবর সঠিক বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

পুলিশ অফিসার এবার বিচলিত হলেন। বললেন হুজুর কি মনে করেন—এই তাতার-বিদ্রোহের মূলে আইভান ওগারেফের গোপন হাত রয়েছে?

—নিশ্চয়। আরও শুনুন। এমন খবর এখনও আপনারা পান নি। আইভান ওগারেফ পার্ম প্রদেশ থেকে উরাল পর্বত পেরিয়ে সাইবেরিয়ায় যায় এবং কিরঘীজ অঞ্চল ঘুরে যাযাবর জাতিদের উত্তেজিত ক'রে তোলে। তারপর আরও দক্ষিণে স্বাধীন তুর্কীস্থানে গিয়ে বোখারা, খুখণ্ড, কুন্দুজ প্রভৃতি স্থানের শাসনকর্তাদের হাত করে। এমনিভাবে গোপনে গোপনে বিদ্রোহের কালো মেঘ সঞ্চার হয় সাইবেরিয়ার নির্মল আকাশে। সেই মেঘই এখন প্রকাশ পেয়েছে দুর্দিবকের গুরুগর্জনে। শেষপর্যন্ত টেলিগ্রাফের লাইন নষ্ট করে দিয়ে আইভান ওগারেফ প্রতিহিংসায় মেতে উঠেছে। তার আক্রোশ গ্র্যাণ্ড ডিউকের উপর।

মহারাজ জার ভীষণ উত্তেজিতভাবে পদচারণা করতে লাগলেন। পুলিশ অফিসার কোন কথা বলতে পারলেন না। কেবল মনে মনে বলতে লাগলেন—যদি মহারাজ জার কোন নির্বাসিতকে মুক্তি না দিতেন, তা হলে আইভান ওগারেফের মতো কূটনীতিক কুচক্রী কিছুতেই রাশিয়ার অশান্তি ঘটাত না।

মহারাজ জার একবার চেয়ারের হাতলে হাত রেখে দাঁড়াতেই পুলিশ অফিসার নীরবতা ভঙ্গ ক'রে বললেন: এই বিদ্রোহ সত্বর দমন করার জন্য নিশ্চয়ই হুজুরের হুকুম হয়েছে?

—সে ব্যবস্থা হয়েছে। সবশেষে যে টেলিগ্রাম নিজনী-উডিনস্কে পৌঁছেছে, তাতে জেনিসী, ইর্কুটস্ক, ইয়াকুটস্ক-এর গভর্ণমেণ্টকে সেনা সমাবেশ করতে হুকুম দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমুর প্রদেশ ও বৈকালহ্রদ অঞ্চলের শাসনকর্তাদের উপরেও সে আদেশ বলবৎ হয়েছে। তাছাড়া নিজনী-নভগরডের সেনাদলকে এবং সীমান্তের কসাকদের বলা হয়েছে উরাল পর্বতের দিকে অগ্রসর হ'তে। কিন্তু দুর্ভাবনার কথা এই যে, তাতারদলকে তাদের আক্রমণ করতে আরও কয়েক সপ্তাহ লাগবে।

—ইর্কুটস্ক নগর এখন তো মস্কো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে কি রকম সাহায্য পাওয়া যাবে—মহারাজ গ্র্যাণ্ড ডিউক শেষ টেলিগ্রামে নিশ্চয়ই জেনে থাকবেন।

জার বললেন: এ সংবাদ তিনি পেয়েছেন। কিন্তু তিনি এখনও জানেন

না—আইভান ওগারেফ বিদ্রোহের নায়ক, বরং গ্র্যাণ্ড ডিউকের ওপরই তার যত আক্রোশ। এ চক্রান্তের খবরই তাঁর আগে জানা দরকার।

—তাহ'লে একজন সুচতুর সাহসী সংবাদবাহক…

—হাঁ, আমি তেমনি একজন লোকের অপেক্ষা করছি…

—হয় ত সে যোগ্য লোকই হবে। কিন্তু হুজুর হয়ত জানেন যে সাইবেরিয়া বিদ্রোহের উর্বর ক্ষেত্র।

মহামান্য জার রুষ্ট হলেন। বললেন: আপনি কি মনে করেন এই বিদ্রোহে নির্বাসিত রাজবন্দীরাও যোগ দেবে?

পুলিশ অফিসার সন্দিগ্ধ মনে বললেন: হাঁ হুজুর।

—কিন্তু আমি তাদের দেশপ্রেমে বিশ্বাস করি।—জার দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন।

—কিন্তু এই রাজনৈতিক বন্দী ছাড়াও তো বহু কয়েদী সেখানে রয়েছে।

—ওহো জেনারেল, সে সব দুরাত্মাদের ভার আপনাদের হাতে ছেড়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। ওরা মনুষ্যসমাজের অধম। কিন্তু এই উপদ্রব বা বিদ্রোহাচরণ রাজবিদ্রোহ নয়। এই বিদ্রোহ দেশ-বিদ্রোহ। রাশিয়া যাদের স্বদেশভূমি—রাজবন্দীরা যার স্বপ্ন দেখে, একদিন যেখানে তারা ফিরে আসবে বলে আশা করে, এ বিদ্রোহ সেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে। না—না, কোন স্বদেশপ্রেমিক রাশিয়ান তাতারদের সঙ্গে যোগ দিয়ে স্বদেশের মর্যাদা হেয় করতে পারে না।

মহামান্য জারের এ অনুমান মিথ্যা নয়। জার শাসনের নীতি-গত ব্যাপারে বিরোধী বলেই রাজবন্দীরা সুদূর সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত—তাই ব'লে তাদের স্বদেশ-ভক্তি তো উপেক্ষার জিনিষ নয়।

পুলিশ অফিসার এবার বিদায় নিলেন।

মহামান্য জার আবার এসে দাঁড়ালেন জানালার পাশে। মনে নিদারুণ দুর্ভাবনা। সবচেয়ে আশঙ্কার হেতু এই: সাইবেরিয়ার অসভ্য যাযাবর কিরঘীজ দল যদি বিদ্রোহী তাতারদের সঙ্গে যোগদেয়, তাহ'লে বিদ্রোহের আকার এমন গুরুতর হয়ে দাঁড়াবে যে তাদের দমন করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। কেন না, কিরঘীজরা নানা দলে বিভক্ত হ'লেও প্রতি দলে লক্ষ লক্ষ লোক। যুদ্ধ-ব্যাপারে পাকা না হ'লেও লুট-তরাজে সুশিক্ষিত সেনাদলের চেয়ে ঢের পটু। তারা সচরাচর রাত্রির অন্ধকারে হঠাৎ হৈ-হৈ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে পথচারী বণিকদলের ওপর এবং চক্ষের নিমেষে লুঠপাট শেষ করে কোথায় মিলিয়ে যায়। অবশ্য সম্মুখ-যুদ্ধে একটা ছোট পদাতিক দলও তাদের অনায়াসে

হাজারবার ক'রে দিতে পারে ; একজন পাকা যোদ্ধাকে নিমেষে উড়িয়ে দিতে পারে হাজার হাজার কিরগীজকে। তা হ'লেও তাদের বসানো সহজ ব্যাপার নয়। এই বড়ো রাজকীয় পদাতিক দলকে ভারি ভারি কামান আর রাশি রাশি গোলাবারুদ ব'য়ে নিয়ে যেতে হবে মস্কো থেকে বন-জঙ্গলময় দুর্গম সাইবেরিয়া পেরিয়ে—যে পথের দূরত্ব কম হলেও তিন হাজার ভার্স্ট।[1]

তাছাড়া সকল রকম বাধা অগ্রাহ্য করেও বিদ্রোহীদের অঞ্চলে যেতে হ'লে যে সময়ের দরকার, তার মধ্যেই বিদ্রোহীরা হয়ত দলে-বলে দুর্ধর্ষ ও অপরাজেয় হয়ে উঠবে।

বিদ্রোহী তাতাররা ককেশিয়ান জাতি, তুর্কিস্থানের অধিবাসী। বোখারা, খুখন্দ, কুন্দুজ এ রাজ্যের কয়েকটি বিভাগ। এক-এক বিভাগে এক-একজন শাসনকর্তা। প্রাকৃতিক কারণে সামরিক দিক দিয়ে সে-সময়ে বোখারা প্রদেশই ছিল সুরক্ষিত। চারদিকে পাহাড়—মাঝে মাঝে দুর্গম প্রান্তর। রীতিমত যুদ্ধের আয়োজন না ক'রে সেখানেও আক্রমণ করা সহজ নয়।

আইভান ওগারেফের প্ররোচনায় বোখারার আমীর ফেওফার খান ৩০ হাজার পদাতিক ও ৩০ হাজার অশ্বারোহী সেনা নিয়ে যুদ্ধে নেমেছেন।

মাননীয় গ্র্যাণ্ড ডিউক এ সময়ে সাইবেরিয়ার রাজধানী ইরকুটস্কে। মহামান্য জার বিদ্রোহী আইভান ওগারেফের চক্রান্ত এবং আমীর ফেওফার খানের গতিবিধি সম্পর্কে অনেক খবরই পেয়েছিলেন। এ অবস্থায় অবিলম্বে গ্র্যাণ্ড ডিউককে সতর্ক করে দেওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু কি ক'রে তা সম্ভব ?

মস্কো থেকে ইরকুটস্কের দূরত্ব ৫ হাজার ২ শত ভার্স্ট্। পথে বিদ্রোহীদের অঞ্চল। এ সময়ে এমন একজন সংবাদবাহকের প্রয়োজন—যে হবে অসাধারণ কৌশলী—দুরন্ত সাহসী, তীব্র শীত যাকে দমাতে পারবে না, অসহ রৌদ্র-তাপে সে কাতর হবে না। যে-পথে বিদ্যুৎ চলাচল বন্ধ হয়ে গেল, সে-পথে তার গতি হবে বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্র। সকল রকমের বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে তাকে যথাসময়ে ইরকুটস্কে পৌঁছতে হবে।

এমন লোক কেউ আছে কি ?

মহামান্য জার এক অসম্ভব আশা নিয়ে তারা-ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

---

[1] ১১৬৬ গজে ১ ভার্স্ট।

তিন

জেনারেল কিসফ ভেতরে এলেন।

জার আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করলেন: কোথায় দূত?

—বাইরে দাঁড়িয়ে, একসেলেনসি!

—কেমন সে লোক?

—একসেলেনসি, শীত-গ্রীষ্ম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, পরিশ্রম—কিছুই তাকে দমাতে পারে না।

—কি নাম?

—মাইকেল স্ট্রগফ।

—সে কি এই মুহূর্তে রওনা হতে পারে?

—হাঁ একসেলেনসি, শুধু হুকুমের অপেক্ষা।

—তাকে নিয়ে এসো।

মাইকেল স্ট্রগফ ভেতরে এল। জার অবাক হলেন। অপূর্ব স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল এক মূর্তি। দীর্ঘ শরীর, প্রশস্ত বুক, ককেশিয়ানদের মতো পরিপুষ্ট সুন্দর চেহারা। মাথার ঘন কোঁকড়ানো চুল কপালের ওপর ঝুলে পড়েছে। চোখের তারা ঘোর কালো। নির্মল স্থির দৃষ্টি। ঈষৎ বাঁকা ভ্রূ। দেখলেই মনে হয়, অদ্ভুত সাহসী সে—ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে একচুলও সরান অসম্ভব।

মাইকেল অভিবাদন জানিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

মাইকেল স্ট্রগফের জন্ম হয়—রুক্ষ আবহাওয়ার ভেতর। তার বাবা ছিলেন সাইবেরিয়ার বিখ্যাত শিকারী। মায়ের নাম মার্ফা স্ট্রগফ। সাইবেরিয়ার ওমস্ক শহরে তাদের বাড়ী। মা সেখানেই থাকেন।

মাইকেল পিতার ধারায় গড়ে উঠেছিল। আট বছর বয়স থেকে সে পিতার সঙ্গে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। বাপ ভোজালী হাতে আগে আগে চলত, আর ছেলে বর্শা-বন্দুক ঘাড়ে ফেলে চলত পিছু পিছু। ভালুক শিকার ছিল তার প্রিয় খেলা।

এমনি ধারায় শৈশব কাটিয়ে মাইকেল বড় হয়। ফলে হাড়-কাঁপানো শীত, ঝাঁঝালো গরম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, অমানুষিক পরিশ্রম— সবকিছুই তার অভ্যাস দাঁড়িয়ে যায়। এক কথায় উত্তর মেরুর ইয়াকুটদের মতো সে লোহার মানুষ

হয়ে গড়ে ওঠে। কিছুদিন না খেয়েও সে চলতে পারে। দশদিন না ঘুমিয়ে থাকা তার কাছে এমন কিছুই নয়। দারুণ শীতের রাত্রিতে বরফে-ঢাকা বিশাল প্রান্তরে—যেখানে সাধারণ মানুষের রক্ত পর্যন্ত জমে যায়, মাইকেল সেখানে অনায়াসে চলাফেরা করতে পারে। দুর্গম মেরুদেশ; সেখানে যখন রাত্রি ঘনিয়ে থাকে বহুদিন ধ'রে—কুয়াশায় দিক আচ্ছন্ন হয়ে যায়, দৃষ্টি চলে না, পথের নিশানা পাওয়া যায় না, সে-সময়েও মাইকেল ঠিকমত চলতে পারে। পথ হারিয়ে সে বিভ্রান্ত হয় না। এ সকল গুণ সে পেয়েছিল পিতার কাছ থেকে। তা ছাড়া অতি অদ্ভুত তার অনুভূতি-শক্তি। সে দেখতে পায় আলুথালু বরফের স্তূপে কি অব্যক্ত রহস্য, তুষার-ঢাকা গাছের শাখায় শাখায় কি নীরব ভাষার কানাকানি, শিশির এবং কুয়াশার আবরণে, আকাশে মেঘের আস্তরণে, পাখীর ডানায় ঝটপট শব্দে কি অপরূপ মাধুর্য। আর এমন সব খুঁটিনাটি শত শত ব্যাপারে সে অনুভব করত—কত কি গোপন কথা যেন লুকিয়ে রয়েছে চির রহস্যময়ী প্রকৃতির মধ্যে!

এই রকম অদ্ভুত তার প্রকৃতি। আর দেহের আবরণ যেন কঠিন লোহার পাতে তৈরি। কিন্তু আসলে সে সোনার মানুষ। অন্তর ফুলের মতো কোমল।

জগতে একমাত্র বন্ধন—তার মা। যাকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে—ভক্তি করে। মায়ের স্নেহে সে ননীর পুতুল। বিশ বছর বয়সে মাকে ছেড়ে ভাগ্যের সন্ধানে সে আসে রাশিয়ায়। সে শপথ করে এসেছিল সুযোগ পেলেই মায়ের কাছে ফিরে যাবে। এই শপথ সে পুণ্যধর্ম ব'লে এ পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে।

কোথায় মস্কো আর কোথায় ওমস্ক। বছরে শীতকালে কচিৎ সে ছুটি পায় সে-সময় সে ফিরে যায় মায়ের কাছে। পথে পাহাড়-প্রান্তর। দারুণ শীতে বরফ জমে সকল দিকে একাকার। কিন্তু কিছুই তাকে দমাতে পারে না। মায়ের সঙ্গে দেখা করে আবার সে ফিরে আসে। কিছুদিন আগে দক্ষিণ-প্রদেশে এক গুরুতর কাজের ভার তার ওপর পড়েছিল; এ কারণে এই তিন বছর ধ'রে সে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে পারেনি। এতদিন পরে সে মাত্র কয়েক দিনের ছুটি পেয়েছে। ভোর বেলা রওনা হবে ওমস্ক শহরে।

কিন্তু বাধ পড়ল হঠাৎ সরকারী পরোয়ানা পেয়ে। তখুনি তাকে হাজিরা দিতে হ'ল রাজপ্রাসাদে।

মহারাজ তার একদৃষ্টিতে মাইকেলের আপাদমস্তক লক্ষ্য করলেন। একটি কথাও বললেন না। মাইকেল দাঁড়িয়ে রইল পাষাণ-মূর্তির মতো।

সম্রাট খুশী হলেন। মাইকেলের চোখের দিকে তাকিয়ে সহসা জিজ্ঞেস করলেন।

—তোমার নাম ?

মাইকেল বিনীতভাবে জবাব দিল। মাইকেল ষ্ট্রগফ।

—তোমার পেশা ?

—সংবাদ-সংগ্রাহক দলের অধ্যক্ষ।

—সাইবেরিয়ার পথঘাট তুমি চেন ?

—আমি নিজেই সাইবেরিয়ান, হুজুর !

—কোথায় বাড়ী ?

—ওমস্ক শহরে।

—সেখানে তোমার কে আছেন ?

—আমার মা।

সম্রাট কি ভাবলেন। পরে শিলমোহর করা একটা খাম দেখিয়ে বললেন : মাইকেল, এই চিঠিখানা তুমি গ্রাণ্ড ডিউকের হাতে পৌছে দেবে। কিন্তু সাবধান—আর কারও হাতে নয়।

—তাই হবে, হুজুর।

—গ্রাণ্ড ডিউক ইর্‌কুটস্কে আছেন।

—আমি ইরকুটস্কে যাব।

—পথে বিদ্রোহীদের বাধা। তা'রা এ চিঠি আটক করতে চাইবে।

—আমি সাবধানে তাদের এড়িয়ে যাব।

—কিন্তু খুব হুঁসিয়ার। বিশ্বাসঘাতক আইভান ওগারেফ বিদ্রোহীদলের নেতা। পথে তার সঙ্গেও তোমার দেখা হ'তে পারে।

—আমি হুঁসিয়ার হয়ে যাব।

—তুমি কি ওমস্ক হয়ে যাবে ?

—হাঁ হুজুর—ঐ তো পথ।

—কিন্তু একটা কথা। তুমি মায়ের সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। কেননা, তাহ'লে তোমার পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়বে।

মাইকেল ইতস্তত করল ; কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্যে। তারপর স্থিরভাবে সে বলল : তাই হবে হুজুর ! আমি মায়ের সঙ্গে দেখা করব না।

—শপথ কর, ঘুণাক্ষরে যেন তোমার পরিচয় কেউ জানতে না পারে।

—আমি শপথ করছি…

সম্রাট আবার তার চোখের দিকে তাকালেন। গম্ভীরভাবে বললেন: মাইকেল স্ট্রগফ, মনে রেখো, এই চিঠির ওপর নির্ভর করছে সাইবেরিয়ার ভবিষ্যৎ,—বিশেষ করে গ্র্যাণ্ড ডিউকের জীবন।

—এই চিঠি আমি মহামান্য গ্র্যাণ্ড ডিউকের নিজের হাতেই পৌঁছে দেব, হুজুর!

—তাহ'লে বিপদ-আপদ যাই ঘটুক, যেমন করেই হোক, তুমি এ নিয়ে যাবে?

—আমার কর্তব্য আমি করে যাব—যতক্ষণ বেঁচে থাকি।

—তুমি বেঁচে থাক, এই আমি চাই।

—হাঁ হুজুর, আমি বেঁচে থাকব—কর্তব্য পালন করব।

মহামান্য জার নিশ্চিন্ত হলেন। মাইকেল স্ট্রগফের বীর সরল উত্তর এবং দৃঢ়সংকল্প তাঁকে মুগ্ধ করল। তিনি আবার মাইকেলকে বললেন: তবে তাই হোক মাইকেল স্ট্রগফ, মঙ্গলময় ভগবানের নাম নিয়ে তুমি এবার রওনা হও। মনে রেখো, রাশিয়ার ভবিষ্যৎ, সম্রাটের মঙ্গল এবং গ্র্যাণ্ড ডিউকের জীবন এখন তোমার হাতে।

মাইকেল স্ট্রগফ অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে পড়ল সেখান থেকে। তার চলার ভঙ্গিতে প্রকাশ পেল মনের দৃঢ়তা ও সজীবতা।

মহামান্য জার আপন মনে বললেন: অদ্ভুত!

জেনারেল কিসফ নম্রভাবে বলল: আমিও তাই মনে করি, হুজুর। মানুষের পক্ষে যা অসম্ভব—মাইকেল স্ট্রগফ তা করবে।

জার স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। মনের ভার হালকা হ'ল যেন। শুধু বললেন: হাঁ, মানুষের মত মানুষ বটে!

চার

তখন গ্রীষ্মকাল। বরফ গলে পথ পরিষ্কার হয়ে গেছে।

শীতকালে সাইবেরিয়ার প্রান্তরে চলাফেরা করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক বাধা-বিপত্তি এবং ভয়াবহ দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। গাঢ় কুয়াশায় দিক আচ্ছন্ন থাকে। বরফে খানা-ডোবা, হ্রদ নদী, বিল—সব একাকার সমতল, পথের নিশানা পাওয়া যায় না। তীব্র তুষার-ঝড়ে গাছপালা পর্যন্ত বরফের তলায় চাপা পড়ে। তা ছাড়া ক্ষুধার্ত

নেকড়েরা পাল হা-হা করে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু মাইকেল অন্য ধাতের মানুষ। শীতকাল হ'লে তার অসুবিধা না হয়ে বরং বেশি সুবিধা হত। শীতের জন্যে বিদ্রোহীদল প্রান্তরের ঘাঁটি উঠিয়ে আশ্রয় নিত কোন নিরাপদ শহরে, যাযাবর দস্যুদল ঘুরে বেড়াত না পথে পথে। কাজেই এই সুযোগ নিয়ে মাইকেল দিগন্তব্যাপী বরফের ওপর দিয়ে স্লেজগাড়ী চালিয়ে ইরকুটস্কে পৌঁছোতে পারত কিন্তু এ-সব সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করার অধিকার তার নয়, কর্তব্যের ডাক এসেছে, যে-কোন অবস্থায় তাকে সাড়া দিতে হবে।

মাইকেল প্রস্তুত হ'ল।

পথ চলতে বহু অর্থের প্রয়োজন। তা সে পেল। কিন্তু এই অর্থের নিরাপত্তার জন্যে কোন সরকারী নজীর-পত্র দেওয়া হল না। তার বদলে সে পেল পথ চলার অনুমতি—একটা ছাড়পত্র। তাতে লেখা ছিল—

> নাম : নিকোলাস কোর্পানফ। পেশা : সওদাগরী। নিবাস : ইরকুটস্ক। এই ছাড়পত্রের বলে একজন বা দুইজন সহকারী চলতে পারবে। কোন অবস্থাতেই এই ছাড়পত্র বাতিল হবার নয়।

সে সময়ে ঘোড়া ডাকের সরকারী বন্দোবস্ত ছিল। কিছু দূরে দূরে ছিল স্টেশন বা পোস্টিং-হাউস। ভাড়া দিয়ে এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে ঘোড়া বদল করে পথ চলা যেত। মাইকেল ইচ্ছা করলে ছাড়পত্র দেখিয়ে তেমন এক বন্দোবস্ত করে নিতে পারত। কিন্তু তা সে করল না। সে ভাবল বিশেষ করে এই ইউরোপীয় রাশিয়ায় এ সুবিধা নিতে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয় তাতে তার পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বিশেষত মাইকেল স্ট্রগফ এখন নিকোলাস কোর্পানফ। মহারাজ জারের সংবাদবাহক নয়—সওদাগর, একজন সাধারণ যাত্রী মাত্র।

১৬ই জুলাই।

মাইকেল স্ট্রগফকে দেখা গেল মস্কো স্টেশনে। সাধারণ সওদাগরের বেশ পরণে পায়জামা, গায়ে আঁটসাঁট আঙরাখা, কোমরে বেল্ট, হাঁটু পর্যন্ত মোজা, পায়ে উঁচু বুটজুতো। পিঠের ওপর ঝোলানো বেশ বড়-সড় সওদাগরী ব্যাগ তা ছাড়া কোমরে লুকোনো একটি রিভলভার। ভেতরের পকেটে একটি তামুক তোড়ানী ও একটি ছোরা। বিপদের সহায়। অপর কারও চোখে যাতে না পড়ে, সেজন্যে অতি সাবধানে সে এই হাতিয়ারগুলোকে লুকিয়ে রেখেছিল।

মাইকেলের প্রথম গন্তব্যস্থল নিজনী-নভগরড স্টেশন—মস্কো থেকে দশ ঘণ্টার পথ। তার উদ্দেশ্য, সেখানে নেমে প্রথমে সে বিদ্রোহী অঞ্চলের খবর নেবে। তারপর অবস্থা বুঝে হয় রেলপথে অথবা ভল্গা নদীর জাহাজে চেপে উরাল পর্বত-অঞ্চলে যাবার বন্দোবস্ত করবে।

মাইকেল স্ট্রগফ গাড়ীর এক কোণ দখল করে বেশ আঁটসাট বেঁধে বসেছিল—যেন একজন পদস্থ নাগরিক। ইচ্ছা ছিল, কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে কাটাবে কিন্তু কামরায় আরও অনেক যাত্রী ছিল এবং সরগরম হয়ে উঠেছিল তাদের কথাবার্তায়। কাজেই দু চোখ বুজে ঘুমোবার উপায় ছিল না। সে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে খুব সতর্কভাবে শুনতে লাগল কে কি বলাবলি করছে।

কিরঘীজদের অভ্যুদয় এবং তাতার বিদ্রোহের সত্য মিথ্যা অনেক রকম খবর তখন অনেকেই শুনেছিল। কোন কোন যাত্রী সহযাত্রীর কানে কানে এই নিয়ে ফিসফাস্ও করছিল। এ রকমভাবে কথা বলা রাশিয়ানদের স্বভাব। কেননা, সবাই জানে—দেয়ালেরও কান আছে। কে জানে কি কথা কি ভাবে বেফাঁস হয়ে যায়।

যাত্রীদের অনেকেই নানাদেশের ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক। ইহুদী, তুর্কি, কসাক, রাশিয়ান, জর্জিয়ান, কালামুক—আরও কত জাতি। বিভিন্ন ভাষার গুঞ্জনে কামরাটি বেশ মুখর হয়ে উঠেছিল। নিজনী নভগরডের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মেলার যাত্রী ওরা।

পশমী টুপি পরা একটি লোক বলে উঠল: শুনতে পেলাম এবার চায়ের দরটা নাকি বেশ উঠেছে।

লোকটির গায়ে কটা রঙের জামা। অতি পুরানো—বেশি দিনের ব্যবহারে খাড়ের রোম বেরিয়ে পড়েছে। সে একজন পারসিক।

পাশেই একজন বুড়ো ইহুদী এতক্ষণ গম্ভীর হয়ে ব'সে ছিল। সে জবাব দিল: তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। চায়ের দর এবার আর পড়ছে না। পশ্চিম দেশের লোকেরা ও জিনিসটা খুব ধরবে, নিজনী নভগরডের বাজার ঝেড়েপুঁছে নিয়ে যাবে এবার। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে বোখারার কার্পেটের চাহিদা এবার আর হ'ল না।

—বা-রে, বোখারার মাল এবারও পাওয়া যাবে ব'লে আশা করো নাকি?

—না, তা নয়। তবে সমরকন্দ থেকে পাওয়া যেতে পারে। এদিকে তো খিবা থেকে চীন সীমান্ত অবধি বিদ্রোহের ঢেউ লেগেছে।

কামরার অপর দিকে আর কজনের কথাবার্তা চলছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের

কথা নয়, আলোচনা চলেছিল—তাতার-বিদ্রোহের বিরক্তিকর গোলমেলে ব্যাপার নিয়ে।

একজন বলল : এই যুদ্ধের ব্যাপারে সাইবেরিয়ার ঘোড়াগুলোও রেহাই পাবে না দেখছি। মধ্য-এশিয়ার খবরাখবর পাওয়াও ভারি মুস্কিল হবে।

অন্য একজন বলল : তাতারদের সঙ্গে মধ্য-এশিয়ার কিরঘীজরাও নাকি যোগ দিয়েছে?

এই রকমই তো শুনি।—খুব নিচু সুরে বলল প্রথম লোকটি। কিন্তু কে জানে কি ব্যাপার কোথায় গড়িয়েছে আর কোন্‌টাই বা সত্যি।

দ্বিতীয় লোকটি মাথা নেড়ে বলল : আমার কিন্তু আশংকা হচ্ছে, নিজনী নভগরডের মেলার জাঁকজমক এবার বুঝি মাঠেই মারা যায়। তবে সবার আগে অখণ্ড রাশিয়ার নিরাপত্তা। ব্যবসা তো ব্যবসা। ভারি তো!

ঠিক এ সময়ে একটি লোক কেবল চোখের সদ্ব্যবহার করছিল। সে আমাদেরই পরিচিত সাংবাদিক অলসাইড জুলিভেট। সকল দিকেই তার সতর্ক দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবং একটা সাধারণ ব্যাপার নিয়েও যাত্রীদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে চলেছে—নিতান্ত এলোমেলো ভাবে। তার ধারণা ছিল—অবান্তর কথার জবাব থেকেই হয়ত কোন কৌতূহলজনক ঘটনার আভাস পাওয়া যাবে। কিন্তু ব্যাপার হ'ল ঠিক উল্টো। যাত্রীরা ভাবল—লোকটি পুলিশের নয়—হয়ত স্পাই। কাজেই সহসা সবাই চুপ করে গেল।

তাতার বিদ্রোহের ব্যাপারে বিশেষ কোন কথাই আর পাওয়া গেল না। অলসাইড জুলিভেট হতাশ হয়ে নোট বই খুলে লিখল :

যাত্রীরা ভারি সতর্ক—যুদ্ধের আলোচনায় খুব হুঁশিয়ার

অন্য একটি কামরায় তখন সাংবাদিক হ্যারি ব্লাউন্ট নিজের কাজে ব্যস্ত সে স্বভাবতই মুখচোরা—কিন্তু কানদুটি খুব সজাগ। সাধারণ যাত্রীর মতো চুপচাপ ব'সে সে শুনে যেতে লাগল—কে কি বলছে। আরোহীরা তাকে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করল না। ব্যবসায়ী মহলের কাছ থেকে সে পেল—তাতার বিদ্রোহের টাট্‌কা খবর। সে আর ইতস্তত করল না। এক সুযোগে চুপিচুপি নোট বইয়ে টুকে রাখল :

সহযাত্রী ব্যবসায়ী বন্ধুরা ভারি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। যুদ্ধের কথা ছাড়া তাদের আর কথা নেই। মন খুলে অবাধে বলাবলি করছে—যেন ভল্‌গা এবং ভিস্‌চুলা নদীর উচ্ছ্বসিত স্রোত।

রাশিয়ার সব জায়গায় তখন বসে গেছে গুপ্তচরের সতর্ক পাহারা। বিদ্রোহী আইভান ওগারেফের সন্ধান তখনও রাশিয়ার পুলিশ পায়নি।

নিজনী-নভগরডের মেলায় কত দেশের কতরকম লোক কতরকমের উদ্দেশ্য নিয়ে আসে। এখানেও জড় হয়েছে নানাদেশের নানা শ্রেণীর লোক। তাদের ভেতর আইভান ওগারেভের চরেরা নানা বেশে লুকিয়ে থেকে বিদ্রোহের বীজ ছড়াবার চেষ্টা করছে — এও বিচিত্র নয়। অথবা আইভান ওগারেভ নিজেও হয়ত ওদের ভেতর মিশে পুলিশের চোখ এড়িয়ে চলছে। এ ধারণাবশেই এতটা সতর্কতা। ট্রেন থামলেই গুপ্তচর এবং পুলিশের লোকের আনাগোনা শুরু হয়। যাত্রীদের আপাদমস্তক দেখে নেয়। খানাতল্লাসী ও দেহতল্লাসী চলে।

রাশিয়ার পুরনো রাজধানী ব্লাডিমির ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে কয়েক মিনিটের জন্য ট্রেন দাঁড়ায়। ট্রেন থামতেই একটি ষোল সতের বছরের কিশোরী মেয়ে ধীরে সুস্থে গাড়ীতে উঠল। মাইকেল যেখানে বসেছিল তারই বিপরীত দিকে একটু জায়গা খালি ছিল; মেয়েটি সেখানে গিয়ে বসল। তার সঙ্গে একটি সাধারণ লাল চামড়ার ব্যাগ। তা ছাড়া সম্বল কিছুই ছিল না। সে একপাশে ব্যাগটিকে পরিপাটি করে রেখে চুপ ক'রে ব'সে রইল; গাড়ীর অন্যান্য যাত্রীদের দিকে একবারও মাথা তুলে তাকাল না। বোধ হয়, নিকটেই কোথাও সে যাবে — হয়ত কয়েক ঘণ্টার পথ।

মেয়েটির এই শান্ত নম্র মূর্তি মাইকেলের চোখ এড়াল না। চেহারা সুন্দর, অথচ চোখে মুখে কেমন যেন এক বিষাদের ছায়া! যেন শোক দুঃখের ঝড় ঝাপটা সে বহু সহ্য করেছে। যে অবস্থায় পড়লে মানুষ একেবারে এলিয়ে পড়ে, তেমন অবস্থায়ও তার কর্তব্য বুদ্ধি যেন খুব তীক্ষ্ণ ও অটুট — শান্ত ও অনমনীয়।

মাইকেলের কৌতূহল বাড়ল। কিন্তু যেচে প'ড়ে কারও সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তোলা তার স্বভাব নয়। কাজেই সে নীরবে সতর্কভাবে লক্ষ্য রাখল মেয়েটির ওপর।

স্টেশন ছেড়ে ট্রেন আবার জোরে ছুটে চলেছে। অবিরাম ঠকর-ঠক ঠকর ঠক শব্দ হচ্ছে তালে তালে। যাত্রীদের অনেকেরই তখন ঢুলুনি শুরু হয়েছে — মাথা ঢুলছে এপাশে ওপাশে।

ঘুমের ঘোরে একজন বুড়ো ব্যবসায়ীর মাথা ঢুলে পড়ল মেয়েটির দিকে।

মাইকেল ক্ষিপ্র হাত বাড়িয়ে বাধা দিল।

বুড়োটি ছিল একটু বদমেজাজী। বাধা পেয়ে সে বক্ বক্ করতে লাগল। কিন্তু মাইকেল তার দিকে এমনভাবে তাকাল যে তার মুখ দিয়ে আর দ্বিতীয়

কথাটি বেকল না। শান্ত ছেলের মতো একটু স'রে গিয়ে অন্ত দিকে মাথা হেলিয়ে আবার ঢুলতে লাগল।

মেয়েটি একবার চোখ তুলে তাকাল মাইকেলের দিকে। কোমল শান্ত দৃষ্টিতে প্রকাশ পেল সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা।

প্রায় এক ঘন্টা পর···

নিজনী নভগরড তখনও অনেক দূরে। এমন সময় ঘটল এক দুর্ঘটনা। বাঁকা পথে মোড় ঘুরতেই গাড়ী লাইন ছেড়ে একটা বাঁধের ওপর গিয়ে পড়ল এবং প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে গেল।

আরোহীরা চমকে উঠল। আতঙ্কের ভাব দেখা গেল সকলের চোখে মুখে, কেউ কেউ চীৎকার ক'রে উঠল ভয়ে। হুড়োহুড়ি প'ড়ে গেল। ভিড় হ'য়ে গেল দরজা জানালায়। কে কার আগে বেরুবে সেই চেষ্টা।

মাইকেল স্ট্রগফ তাড়াতাড়ি মেয়েটির দিকে তাকাল। দেখল, এত হুড়োহুড়ি দেখেও সে শক্ত হয়ে ব'সে আছে। এই আকস্মিক ঘটনায় তার চেহারা মলিন হয়ে গেছে, তবু আত্মরক্ষার উত্তেজনা নেই।

মাইকেল মনে মনে বলল: কি অদ্ভুত!

গাড়ীর লাগেজ ভ্যানের সংযোগ স্থলের একটা অংশ ভেঙে গিয়েই এই বিপত্তি ঘটেছিল। এমন অবস্থায় ভীষণ দুর্ঘটনার সম্ভাবনাই ছিল। হয়ত গাড়ীর ইঞ্জিন বাঁধ ছাড়িয়ে পাশের খাদে প'ড়ে যেতে পারত। কিন্তু ভাগ্যক্রমে ততদূর হ'ল না। এক ঘন্টার মধ্যেই ট্রেন আবার চলতে লাগল।

রাত্রি ৮টার সময় নিজনী-নভগরড স্টেশনে গাড়ী থামল। কেউ নামবার আগেই প্রত্যেক কামরা ভ'রে গেল পুলিশের লোকে। তারা যাত্রীদের পরীক্ষা আরম্ভ ক'রে দিল।

মাইকেল স্ট্রগফ তার ছাড়পত্র খুলে দেখাল। একজন পুলিশ ইনস্পেক্টর সেটাকে দু'তিনবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ফিরিয়ে দিল তার হাতে। তারপর মেয়েটির দিকে তাকাল।

মেয়েটির সঙ্গে তেমন কোন ছাড়পত্র ছিল না। রাশিয়ার সীমার ভেতরে যাতায়াতের জন্তে ছাড়পত্রের দরকারও ছিল না। মেয়েটি তখন সরকারী মোহরের ছাপ্-মারা একটি কাগজ ইনস্পেক্টরের হাতে দিল।

পুলিশ ইনস্পেক্টর তাকে জিজ্ঞেস করল: তুমি রিগা থেকে এসেছ?

—আজ্ঞে হাঁ।

—ইরকুটস্কে যাবে?

—হাঁ।

—কোন্ পথে যাবে?

—পার্ম হয়ে।

—ভাল। নিজনী-নভগরড পুলিশ স্টেশনে এ হুকুমনামা সই করিয়ে নিতে হবে। ভুলো না যেন।

মেয়েটি মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

মাইকেল আশ্চর্য হল মেয়েটি ইরকুটস্কে যাবে শুনে। অতটুকু মেয়ে, একা সে চলেছে ইরকুটস্কের পথে—যেখানে পদে পদে সহস্র বিপদ। তার ওপর পথে পথে তাতারদের দুরন্ত আনাগোনা চলেছে। এরকম বিপদের ভেতর দিয়ে কেমন করে সে যাবে?

পুলিশ ইনস্পেক্টর তাঁর কর্তব্য সেরে আগেই নেমে গিয়েছিল। কামরার সব দরজা এখন খুলে দেওয়া হয়েছে। এবার মেয়েটিও নামল।

তারপর নামল মাইকেল স্ট্রগফ। প্ল্যাটফর্মে ব্যাগটি নামিয়ে রেখে সে একবার সামনের দিকে তাকাল। কিন্তু মেয়েটিকে আর দেখা গেল না। এরই মধ্যে জনতার ভিড়ে সে কোথায় মিশে গেছে।

পাঁচ

নিজনী-নভগরড।

ভল্গা ও ওকা নদীর মোহনায় অবস্থিত প্রধান নগর। জনসংখ্যা পঁয়ত্রিশ হাজারের বেশি নয়, কিন্তু প্রতি বছর এ সময়ে মেলা উপলক্ষে দশ গুণ লোক জড় হয়। তিন সপ্তাহ পর্যন্ত রাস্তায় মাঠে ঘাটে লোকে লোকারণ্য থাকে। এবং ক্রেতা-বিক্রেতার নিরবচ্ছিন্ন দর-কষাকষিতে নিদারুণ সরগরম হয়ে ওঠে।

এপারে ওপারে নগর। মাঝখানে ভল্গা নদীর ওপর সেতুর সংযোগ। ওপারে পাহাড়ী দুর্গ আর এপারে শহর। পথে পথে চলমান জনসমুদ্র।

মাইকেল স্ট্রগফ প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে এই জনসমুদ্রে মিশে গেল।

নিজনী-নভগরড থেকে পার্ম শহর অনেক দূরের পথ। কাজেই মাইকেল কোথাও আর দেরী না করে আগে খোঁজ নিতে গেল কখন জাহাজ ছাড়বে। জানা গেল—'ককেশাস'-নামে একখানা জাহাজ ছাড়বে বটে, তবে সেদিন নয়—পরদিন বেলা ১২টায়। সে বিরক্ত হ'ল শুনে। তা হ'লে দেখছি পুরো সতেরটি ঘণ্টা এখানে ব'সে ব'সে ঝিমুতে হবে! কিন্তু আর কোনও রকম

যানবাহনও তো চলে না পথে! ঘোড়া চ'ড়ে গেলেও জাহাজের আগে পৌঁছান সম্ভব নয়। কি আর করা যায়? শেষ পর্যন্ত তাকে পরদিনের জাহাজের অপেক্ষায়ই থাকতে হ'ল।

মাইকেল এক হোটেলে গিয়ে উঠল। সেখানে আহারাদি ক'রে আবার বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। তখনও সন্ধ্যার আবছায়া আলো-আঁধারে মিশে যায় নি। কিন্তু রাস্তায় ভিড় ধীরে ধীরে কমে এসেছিল। আঁধার হ'তে না হ'তেই পথঘাট একেবারে খালি হয়ে গেল।

প্রায় এক ঘণ্টা ঘুরে ফিরে মাইকেল একটা বড় বাড়ীর কাছে এসে পড়ল। কাঠের তৈরি বাড়ী—কাঠের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। দেয়ালের পাশে একটি বেঞ্চি পাতা ছিল। বিশ্রামের দরকার মনে ক'রে মাইকেল সেখানে ব'সে পড়ল। সামনে অনেক দূর পর্যন্ত খোলা যায়গা। সন্ধ্যার ঝিরি ঝিরি বাতাস তার কাছে বেশ মধুর বোধ হল।

মাইকেলের এবার মনে পড়ল সেই পথে দেখা মেয়েটির কথা। কি আশ্চর্য! কোথায় সাইবেরিয়া আর কোথায় ইরকুটস্ক। কেমন ক'রে এই মেয়েটি একা বেরিয়ে পড়ল পথে! যাযাবর উপজাতিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে পথে-প্রান্তরে। কেন সে এই বিপৎসাগরে ঝাঁপ দিল? কর্তব্যের ভার নিয়ে আমার পথ চলা। বিপদ-আপদের কথা আমাকে তো ভাবলে চলে না! কিন্তু এই মেয়েটি কেন—কি কারণে এমন দুরন্ত অভিযান সুরু ক'রে দিল?

এক মিনিট, দুমিনিট—এভাবে পাঁচ মিনিট পর হঠাৎ তার চমক ভাঙল। মনে হল, এক বলিষ্ঠ হাত যেন তার কাঁধের ওপর এসে পড়েছে।

—কে হে তুমি? কি করছ এখানে রূঢ়ভাবে জিজ্ঞেস করল একটি অপরিচিত লোক। লোকটির সুদীর্ঘ শরীর, বলিষ্ঠ চেহারা দেখলেই মনে হয়, বেশ ক্ষমতা রাখে।

মাইকেল উত্তর দিল: একটু আরাম করছিলাম।

—এই বেঞ্চিটাতেই আজকের রাত কাটাবার মতলব করেছ নাকি?

—কি আর করি!—বিরক্তভাবে মাইকেল জবাব দিল। তার গলার স্বর ঝাঁঝালো—একজন বিদেশী ব্যবসায়ীর পক্ষে যা স্বাভাবিক নয়।

—ওহে, তবে এখানে নয়—এদিকে এসো—লোকটি বললে।

মাইকেল একবার নিজের অবস্থাটা ভেবে নিল। বুঝতে পারল—এখানে উপস্থিত-বুদ্ধির দরকার। সাবধানে কথা বলতে হবে। কাজেই সুর নরম করে বলল না, ওদিকে গিয়ে দরকার নেই।—এই ব'লেই সে কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

মাইকেল এবার ভাল ক'রে তাকাল লোকটির দিকে। চেহারা অনেকটা ভবঘুরে বোহেমিয়ানদের মতো। তার মনে হ'ল, এমন-সব লোকের সঙ্গ ভাল নয়। অনুমানে বুঝা গেল ঐ কাঠের বাড়ীটি সাধারণ এক সরাইখানা। রাশিয়ার যেখানে-সেখানে যে-সব যাযাবর জিপসীর দল দলে-দলে ঘুরে বেড়ায়—তারা এসে জড় হয় এ সব জায়গায়।

মাইকেল পিছিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বোহেমিয়ান লোকটিও দু' পা এগিয়ে এসে আলাপ জমাতে চাইল। এমনি সময় খুট করে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল একটি স্ত্রীলোক। এবং এক মিশ্রিত ভাষায় বলল: কি হচ্ছে কী? অচেনা লোক নিয়ে টানাটানি কেন? মনে করো লোকটি স্পাই। তাড়াতাড়ি এসো। তোমার খানা তৈরি হয়েছে।

এ কথায় লোকটিও কি ভেবে বলল, তাইতো, সাঙারে। যা হোক, চল এবার! হাঁ, শোন, ভগবানের ইচ্ছায় কালই আমরা এ জায়গা ছেড়ে আর কোথাও চ'লে যাচ্ছি।

হঠাৎ এ কথায় সাঙারে অবাক হল: বল কি। কালকেই

—হাঁ কালকেই, বোহেমিয়ান লোকটি বলল: কালকেই আমাদের যেতে হবে। চল এবার ভেতরে যাই।

এই বলেই তারা দরজা বন্ধ করে দিল।

চমৎকার! বিস্মিত মাইকেল মনে মনে বলল। জিপসী দু'জন ভেবেছে যে ওদের কথা আমি মোটেই বুঝতে পারিনি। বেশ ভালই হোল।—আমি যে নিজেই একজন সাইবেরিয়ান এবং সাইবেরিয়ার নানা অঞ্চলের ভাষাও যে আমার কিছু-না-কিছু জানা আছে একথা ওরা মোটেই ভাবে নি।

রাত হয়েছে এবার হোটেলে ফিরতে হবে। ভল্গা নদীর ধার দিয়ে পথ। নদীর বিশাল বুক ছে'য়ে গেছে সারি সারি অসংখ্য নৌকোয়। জল আর দেখা যায় না। যাযাবর বেদেদের তাবুতে তখন নাচের মহড়া চলেছে।

হোটেলে ফিরে এসে মাইকেল এক ঘুমে রাত কাটিয়ে দিল।

পরদিন, ১৭ই জুলাই।

জাহাজ ছাড়বে আরও পুরো পাঁচ ঘণ্টা পরে। সময় যেন আর কাটে না। এক-একটি ঘণ্টা যেন এক একটি যুগ।

মাইকেল প্রাতর্ভোজন শেষ ক'রে বিছানাপত্তর গুছোল। তার পর বেশ ভাল করে পোষাক চোখাক প'রে নিল। চিঠিখানা সে কোটের ভেতর-পকেটে রেখে তার ওপর বেল্ট এঁটে দিল বেশ ভাল ক'রে। নিজনবাব আর

ভোজালি যথাস্থানে রাখল লুকিয়ে। তারপর হোটেলের পাওনা চুকিয়ে দিয়ে কাঁধের ওপর ব্যাগটাকে ঝুলিয়ে রওনা হ'ল জাহাজ ঘাটের দিকে।

ভলগা নদীর সেতুর ওপর দুধারে অশ্বারোহী কশাক সেনার পাহারা লেগেছে। সেতু পেরিয়ে এক বিশাল প্রান্তর। নিজনী নভগরডের পৃথিবী-বিখ্যাত মেলা এখানেই বসে। একধারে দেখা যায় গভর্নর জেনারেলের বিশাল তাঁবু। মেলার ক্রেতা বিক্রেতা ও দর্শকদিগের উপর দৃষ্টি রাখা ও শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা চলে এখান থেকে।

কত রাজ্য থেকে কত লোক এসেছে মেলায়!—রাশিয়ান্, সাইবেরিয়ান্, জার্মান, কশাক, টার্কোমান, পারশিয়ান, আর্মেনিয়ান, গ্রীক, তুর্কি, হিন্দু, চীনা—এশিয়া ও ইউরোপের আরও কত কত রকমের লোক! বিচিত্র বর্ণ, বিচিত্র ভাষা, বিচিত্র সুর, কেনা বেচার আলোচনা, দরকষাকষি—চারদিক সরগরম। নানা দেশের নানারকম সওদায় ভ'রে গেছে অসংখ্য দোকানপাট।

মাঠের এক ধারে খোলা জায়গায় ব'সে বুজরুকি ব্যবসা চালিয়েছে কত হাতুড়ে বৈদ্যের দল। তাদের মুখে কথার খৈ ফুটছে। কত ভাঁড়, বহুরূপী, বাজীকর, সাজপরা সং সাদের অদ্ভুত কসরৎ দেখাচ্ছে—নানা সুরের চীৎকার আর এলোমেলো বাজনার জ্বালায় কান ঝালাপালা হবার মতো। কোথাও কোথাও বেদের দল ব'সে গেছে গণকের ব্যবসা ফেঁদে। কত অদৃষ্টবাদী নির্বোধের দল ভিড় করেছে সেখানে। জিঙারিজ বলে একদল যাযাবর জাত জংলি নাচগানে মুগ্ধ করে তুলেছে এক শ্রেণীর দর্শকের মন। ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে এসেছে বিদেশী নাটুকে দল। সাধারণের মন-যোগানো গোছের ক'রে সেক্সপীয়রের নাটকের অভিনয় তারা চালিয়েছে। তার ওপর ভালুক নাচিয়ে ভালুক নাচাচ্ছে। দর্শকের দল হাততালি দিয়ে উপভোগ করছে এই চারপেয়ে নটের নাচ। মাঠের মাঝামাঝি জায়গায় আর এক অদ্ভুত কসরৎ চলেছে: জাহাজের একদল খালাসী—তারা সারি বেঁধে বসেছে ঘাসের উপর—সারিগান গেয়ে হাত নেড়ে দাঁড় টানার ভঙ্গি দেখাচ্ছে—যেন ভল্‌গা নদীর বুকে তাদের নৌকো ছুটেছে তর্ তর্ করে।

মাইকেল স্ট্রগফ এক মনে এগিয়ে চলেছে। তার এক হাত কোটের পকেটে ঢুকোনো। মুখে পাইপ। বাঁ হাত দিয়ে কাঁধের ওপর ব্যাগ ঝোলানো। ভ্রূকুটি কুঞ্চিত। মুখে বিরক্তির ভাব।

একটা কথা হঠাৎ কানে এল। পুলিশের বড়কর্তার ডাক পড়েছে গভর্নর জেনারেলের তাঁবুতে। মস্কো থেকে তার এসেছে।

কে একজন বলল : এবার মেলা বন্ধ হ'ল ব'লে।

অপর একজন বলল : পথে পথে পুলিশ ব'সে গেছে।

কেউ বলল : নিশ্চয়ই তাতারবা টিবক শহর আক্রমণ করেছে।

সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে একটা হট্টগোল উঠল : দেখো দেখো—পুলিশ সাহেব —ঐ পুলিশ সাহেব—

ঘন ঘন হাততালি পড়ল। হাততালির ধ্বনি প্রথমে উচ্চতর ও ক্রমে থেমে গিয়ে সে জায়গা একেবারে থমথমে নীরব হ'য়ে গেল।

পুলিশ সাহেব মাঠের মাঝখানে একটা উঁচু টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়ালেন। সকলেই দেখতে পেল তাঁর বাঁ হাতে একখানি টেলিগ্রাম। তারপর জনতার দিকে হাত তুলে পুলিশ সাহেব চেঁচিয়ে বললেন—

নিজনী-নভগরডের গভর্নরের ঘোষণা :

প্রথম : কোন রাশিয়ান প্রজা কোন কারণেই দেশের বাইরে যেতে পারবে না।

দ্বিতীয় : বিদেশীদের উপর এই নির্দেশ—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এদেশ ছেড়ে যেতে হবে।

ছয়

নিজনী নভগরডের গভর্নরের ঘোষণা—মহাশূন্য থেকে মহাগর্জনে বাজ পড়ল যেন। সে গর্জনে চমকে উঠল ঘন জনাকীর্ণ নগর।

প্রথমে চারিদিক থেকে প্রতিবাদের অস্বাভাবিক গুঞ্জন শোনা গেল, তারপর হতাশাব্যঞ্জক অস্ফুট চীৎকার। কিন্তু সবই ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল পুলিশ ও কশাক বাহিনীর আকস্মিক আগমনে। তাঁবুগুলো পড়ে গেল বিশাল প্রান্তরে। মেলা ভেঙে গেল, কোলাহল থেমে গেল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এতবড় প্রান্তর প'ড়ে রইল মরুভূমির মতো—নীরব, জনহীন।

মাইকেল স্ট্রগফ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে জাহাজ-ঘাটের দিকে পা বাড়াল। আবার তার মনে পড়ল সেই পথের-দেখা মেয়েটির কথা। কি দুর্ভাগ্য! মেয়েটির আর যাওয়া হ'ল না। যেহেতু সে রাশিয়ান, তাই সরকারের নূতন ঘোষণায় তার রাশিয়া ছেড়ে যাওয়ার পথ বন্ধ। যদিও আগেই সে পথ-চলার হুকুমনামা পেয়েছে, নূতন আদেশে তা বাতিল হয়ে গেল।

আহা অসহায়া! আচ্ছা, তার কোন উপকার করতে পারি না আমি? এক কাজ করলে হয় না? আমার কর্তব্যেরও কোন ক্ষতি হবে না, অথচ···

সহসা একটা চিন্তা মাইকেলের মস্তিষ্ক আলোড়িত করল। সে ভাবল, আমারই তো বেশি প্রয়োজন। যেহেতু আমি একা। একটি লোক দুর্গম প্রান্তর-পথে একা চলেছে, তখন অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগবে—কেন? কিন্তু এই মেয়েটি যদি সঙ্গে থাকে, তাহ'লে সহজে কারুর মনে এ সন্দেহ জাগবে না। ভাববে, আমার পরিচয় পত্রে যা লেখা আছে, তাতে কোন ছলচাতুরী নেই। সত্যি সত্যিই আমি নিকোলাস কোর্পানফ—সাধারণ ব্যবসায়ী। ইরকুটস্কে আমার বাড়ী। সেখানেই চলেছি। সুতরাং মেয়েটিকে আমার সঙ্গে ক'রে নিতেই হবে। কিন্তু কোথায় সে?

ঘড়িতে তখন ৯টা বেজেছে। জাহাজ ছাড়বে ১২টায়। তখনো পুরো তিন ঘণ্টা সময় হাতে। মাইকেল আবার ভল্গা নদীর পুল পেরিয়ে ফিরে চলল মেয়েটির খোঁজে। যে-সব রাস্তায় লোক চলাচল কম, সে-সব রাস্তা ধ'রে শহর ও শহরতলীর সর্বত্র সে ঘুরে বেড়াল। সরাই, হোটেল, গীর্জা, অনাথাশ্রম—কোথাও মেয়েটির সন্ধান পাওয়া গেল না।

এমনি ক'রে হাঁটাহাঁটি করে মাইকেল আবার ফিরল। তখন ১১টা বেজে গেছে। ছাড়পত্রে সরকারী স্বাক্ষর করাবার জন্তে সে প্রথমে গেল পুলিশ সাহেবের অফিসে। অবশ্য তার ছাড়পত্র এখানে দেখাবার কোন দরকারই ছিল না, তবু সাবধানের মার নেই, যেন যাত্রাপথে কোন বাধা না ঘটে এই হিসেবে একবার দেখিয়ে নেওয়াই ভাল মনে করল।

পুলিশ সাহেবের অফিসে তখন ভয়ানক ভিড়। বিদেশীদের বহিষ্কারের সঙ্গে কোন রাশিয়ান যাতে গোপনে রাশিয়া ছেড়ে যেতে না পারে, তাই এখান থেকে অনুমতি-পত্র দেওয়া হচ্ছে। মাইকেল স্ট্রগফ কোনরকমে ভিড় ঠেলে কিছুটা এগিয়ে গেল। কিন্তু সে দেখল, অফিসের ভেতরে কেরানীর ছোট্ট খোপটির কাছে গিয়ে দাঁড়ানো সহজ কথা নয়।

মাইকেল ফন্দী ক'রে নিকটেই একজন পুলিশের লোক দেখতে পেয়ে তার হাতে দুটি রুবল গুঁজে দিল। লোকটি তৎক্ষণাৎ মাইকেলকে ওয়েটিং রুমে বসিয়ে চ'লে গেল ভেতরে।

মাইকেল ওয়েটিং রুমে ঢুকেই চমকে উঠল। অপর একটি বেঞ্চিতে পথে দেখা সেই মেয়েটি ব'সে রয়েছে চিত্রের মতো নীরব, নিঃস্পন্দ। বিষণ্ণ মুখ। বোঝা গেল—সে নিরাশ হয়ে পড়েছে।

মেয়েটি পুলিশ-স্টেশনে এসেছিল তার হুকুমনামা দেখাতে। কিন্তু পুলিশ সাহেব নূতন ঘোষণার কথা উল্লেখ ক'রে তাতে সই দিতে অস্বীকার করেছেন।

এভাবে হঠাৎ ইয়কুটস্কে যাবার পথে বাধা পড়ায় মেয়েটি হতাশায় এলিয়ে পড়েছে।

মাইকেল ধীরে ধীরে মেয়েটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ মুখ তুলে মেয়েটি দেখে—সেই সহযাত্রী! বিশাল সাগরে অসহায় অবস্থায় যেন সে আশ্রয় পেল। সে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু অবস্থা জানাতে গিয়ে লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে উঠল।

এমনি সময় সেই পুলিশের কর্মচারী এসে জানাল: পুলিশ সাহেব ডেকেছেন।

—বেশ চল। বলেই মাইকেল লোকটির সঙ্গে ভিড় ঠেলে চ'লে গেল ভেতরে।

মেয়েটি সাহায্যের আশা করেছিল। কিন্তু মাইকেলের মুখ থেকে একটুও আশ্বাস না পেয়ে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। তার পায়ের শক্তি সহসা যেন শিথিল হয়ে গেল। সে ধপ্ করে বসে পড়ল বেঞ্চিতে।

প্রায় তিন মিনিট পর

মাইকেল ফিরে এসে বরাবর মেয়েটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল নিঃসঙ্কোচে। তার হাত ধ'রে বলল: বোন আমার।

মেয়েটির চেতনা ফিরে এল আবার। নূতন উৎসাহে সে উঠে দাঁড়াল। একটু ইতস্তত করার অবসরও পেল না।

মাইকেল আবার বলল: ভগিনী, ইয়কুটস্কে যাবার হুকুম পেয়ে গেছি। তুমিও যেতে পার। চলো আমার সঙ্গে।

মেয়েটি আনন্দের উত্তেজনায় মাইকেলের দু'হাত চেপে ধরল। ব্যগ্রভাবে বলল: যেতে পারব? আমি প্রস্তুত আমার, চল।

আর কোন কথা হ'ল না। দুজনে তখনই পুলিশ স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

সাত

ঘণ্টা পড়ল।

ভোঁ শব্দ ক'রে জাহাজ ছাড়ল। তাড়াতাড়ি হ'ল জাহাজ আর জেটিতে। জাহাজের দুপাশের দুই বিরাট চাকা জলের উপর ঝপ্ ঝপ্ আঘাত হানতে লাগল।

জাহাজের ভেতরের ব্যবস্থা ছিল খুব সুন্দর। যাত্রীদল যে যার যথাযথ জায়গা নিয়েছিল। প্রথম শ্রেণীর দুইটি কেবিন মাইকেল স্ট্রগফ আগেই রিজার্ভ করেছিল,—একটি নিজের জন্যে ও অপরটি তার সঙ্গী মেয়েটির জন্যে। ইচ্ছামত বিশ্রামের ব্যাঘাত না হয় ঠিক সে রকম ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি হ'ল না।

প্রায় দু'ঘন্টা পরে...

মেয়েটি প্রথমে কথা বলল : তুমি কি তাহ'লে ইরকুটস্কেই যাবে, ব্রাদার ?

—হ্যাঁ বোন—মাইকেল জবাব দিল—আমরা একসঙ্গেই যাব।

মেয়েটি আবার কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। মাইকেল তা লক্ষ্য করল।

মাইকেলের চোখে ধরা পড়ায় মেয়েটি একটু সংকুচিত হয়ে চকিতকণ্ঠে বলল : আজ আর নয়—ব্রাদার, কাল সবই খুলে বলব তোমায়। বলব, কেন আমি বাল্টিক সাগরের তীরভূমি ছেড়ে উরাল পর্বতের পরপারে চলেছি। কিন্তু আজ তো ·

মাইকেল বলল : আমি তো' কিছুই জানতে চাইনি বোন !

মেয়েটি দুর্বল হাসি হেসে বলল : কিন্তু তোমার জানা দরকার। বোন তার মনের কথা ভাইকে লুকোবে কেন ? কিন্তু আমার শরীরটা কেমন করছে, কিছুই তো আজ বলতে পারছিনে, ব্রাদার !

দুঃখে ও অবসাদে মেয়েটি একেবারে ভেঙে পড়ল।

মাইকেল বলল : তুমি কি এখন বিশ্রাম করবে বোন ? কেবিনে দিয়ে আসব ?

দুর্বল কণ্ঠে বলল মেয়েটি : হ্যাঁ ব্রাদার, তাই চল। তোমায় সব বলব কিন্তু আজ আর·

—সে হবে একদিন। এবার চলো কেবিনে।

মাইকেল স্ট্রগফ মেয়েটিকে কেবিনে পৌঁছে দিয়ে নিজের কেবিনে ফিরে এল। কিন্তু বিশ্রাম করতে পারল না সে। সে যে রাশিয়ার রাজদূত—ইরকুটস্কে চলেছে, এই সন্দেহ যাতে কারও মনে না জাগে সে-জন্য যাত্রীদের সঙ্গে মেলামেশা করার প্রয়োজন বোধ করল। সে ঠিক ক'রে রাখল, যদি কেউ তার পরিচয় জিজ্ঞেস করে, সে সানন্দে জবাব দেবে : আমার নাম নিকোলাস কোর্পানফ, যাচ্ছি সাইবেরিয়ার সীমান্তে। কারও মনে সন্দেহের ছায়ামাত্রও রাখবে না। দরকার হলে সাইবেরিয়া যাবার হুকুমনামাটাও সে দেখিয়ে দেবে।

সারাদিনের অসহ্য গরমের পর রাত্রি হ'ল। স্নিগ্ধ মধুর হাওয়ার পরশ লাগল সবার গায়ে। সকলেই ঘুমোবার জন্য ব্যস্ত হ'ল। ক্রমে চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে এল। জাহাজের চাকার একটানা ঝপাঝপ শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। মাইকেল স্ট্রগফ তখনও ডেকে পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছে। একবার সে কলঘর পেরিয়ে সেকেণ্ড ক্লাশ ও থার্ড ক্লাশ ডেকের মাঝামাঝি একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল।

প্রত্যেকটি যাত্রী অকাতরে ঘুমুচ্ছে। দুপাশে বেঞ্চের উপর, পাইট-বক্সার ধারে, ডেকের মেঝের—এখানে ওখানে যাত্রীদল এলোপাথাড়ি শুয়ে পড়েছে। ওপরে দুইদিকে দুটি লাল ও নীল মিটমিটে আলো।

মাইকেল পা টিপে টিপে কেবিনের দিকে চলল। একটু গিয়ে সিঁড়িতে পা দেবে, এমনি সময় সে শুনতে পেল—কারা যেন চুপিচুপি কথা বলছে। শুনেই সে থমকে দাঁড়াল।

শব্দটা আসছিল ইতস্তত শায়িত আরোহীদের মাঝ থেকে। অনেকেরই সর্বাঙ্গ চাদরে ঢাকা। আলোও খুব অস্পষ্ট। কাজেই কে যে কথা বলছে তা সে সঠিক ঠাহর করতে পারল না; কিন্তু মনে হ'ল, কণ্ঠস্বর যেন তার পরিচিত—কোথাও কবে যেন শুনেছে।

সে এবার সিঁড়ির গোড়ায় নিজেকে আড়াল ক'রে দাঁড়াল। প্রথম কথায় সে তেমন কিছু বুঝতে পারল না, তবে মনে হ'ল, যারা কথা বলছে, তাদের একজন পুরুষ ও অপরজন স্ত্রীলোক। অনুমানে সে বুঝতে পারল—ওরা হয়ত সেই জিপসী পুরুষ ও স্ত্রীলোকটি। সম্ভবত সরকারী ঘোষণার পর অন্যান্য বিদেশীদের সঙ্গে ওরাও নিজনী-নভগরড ছেড়ে জাহাজে এসে ঠাঁই নিয়েছে। তার কৌতুহল দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

সে এবার স্পষ্ট শুনতে পেল--স্ত্রীলোকটি বলছে: হাঁগা, মস্কো থেকে গোপন সংবাদ নিয়ে কে নাকি ইরকুটস্কে চলেছে?

এবার পুরুষের কণ্ঠে জবাব শোনা গেল: হাঁ সাঙারে, ঐ রকমই তো শুনলাম। সে কি সময়মত সেখানে পৌঁছুতে পারবে? হয়ত যেতেই পারবে না।

মাইকেল ক্ষণিক চমকে উঠল। নিজের সম্পর্কে এমন প্রত্যক্ষ আলোচনা সে মোটেই আশা করতে পারেনি।

সে আর একমুহূর্তও সেখানে দাঁড়াল না। জাহাজের পিছন দিকে এসে একটি বেঞ্চিতে ব'সে ব'সে ভাবতে লাগল: ওরা এ খবর পেল কি করে? কে ওরা।

আট

পরদিন, ১৮ই জুলাই।

জাহাজ কাসান-স্টেশনে নোঙর করতেই সমস্ত পুলিশ অফিসার এবং কয়েকজন কশাক সেনা এসে দাঁড়াল জেটিতে। তাদের কাজ জাহাজ থেকে যারা নামে আর যারা ওঠে, তাদের উপর নজর রাখা।

মাইকেল দেখল—যারা এখানে নামার আয়োজন করেছে তাদের মধ্যে একদল জিপসী,– গতকালও নিজনী-নভগরডের মেলায় তাদের সে দেখেছে একদিকে বুড়োমতো একজন বোহেমিয়ান ও একটি স্ত্রীলোক বসে রয়েছে। সম্ভবত তাদেরই ইঙ্গিতে প্রায় পনর বিশ বছরের পঁচিশজন তরুণী নর্তকী—ওড়না জড়িয়ে জেটিতে নেমে পড়ল। তাদের পরণে চুমকি-খচিত ঢিলা পোশাক। প্রভাত-সূর্যের আলোয় চুমকিগুলো চিকচিক করছে।

মাইকেল বুঝতে পারল, এই দলে ঐ স্ত্রীলোকটিই সেই সাভারে, আর বুড়োমতো জিপসীটিই সেই বোহেমিয়ান। ওরাই গত রাত্রিতে তার গতিবিধির কথা বলাবলি করেছিল।

বোহেমিয়ান লোকটিকে আসলে বুড়ো বলে মনে হচ্ছিল না। সম্ভবত সে বুড়োর ছদ্মবেশে ওদের দলে ছিল। জিপসীদের চালচলনের সঙ্গে তার হাবভাবের সামঞ্জস্যও বড় ছিল না। মাইকেলের মনে হ'ল, সাধারণের দৃষ্টিকে এড়িয়ে চলার চেষ্টাই যেন সে করছে। মাথায় রোদে-পোড়া ক্যাম্বিশের এক জীর্ণ হ্যাট—তার কুঞ্চিত মুখের উপর ঝুঁকে রয়েছে। কুঁজো দেহে তালি দেওয়া পুরোনো পোশাক—এত গরমেও বেশ আঁটসাঁট ক'রে জড়ানো। এ রকম জঘন্য বেশভূষায় লোকটির শরীরের পরিমাপ নির্ণয় করা যায় না, চেহারার পরিচয় দেওয়াও শক্ত। তার পাশে দাঁড়িয়ে সেই জিপসী স্ত্রীলোকটি, বয়স প্রায় ত্রিশ। লম্বা বলিষ্ঠ গড়ন, দেহের রং কটা। চমৎকার চোখ। মাথায় সোনালী রং এর চুল। চেহারায় পরিপূর্ণ যৌবনের সৌন্দর্য।

শেষে তারাও জেটি বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে গেল। মাইকেল বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সেদিকে।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে জাহাজের ঘণ্টা পড়ল। বাষ্পের চাপে জাহাজ কেঁপে কেঁপে স্টেশন ছাড়বার উপক্রম করেছে ঠিক এই সময়ে মাইকেল দেখতে পেল, একটি লোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে। সিঁড়ি পাটাতন তখন প্রায় তুলে ফেলা হয়েছে, কিন্তু লোকটি তখন সার্কাসের দলের কৌশলী খেলোয়াড়ের মতো প্রচণ্ড লাফ দিয়ে অন্য এক ভদ্রলোকের ঘাড়ের ওপর পড়ল।

ভদ্রলোকটি নিজেকে কোন রকমে সামলে নিয়ে বলল: কে হে তুমি? তারপর মুখের দিকে তাকিয়েই উল্লসিত হয়ে উঠল: ওহো, এখানেও তুমি?

দ্বিতীয় লোকটি ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল: ওহো

তুমি? ভাল—ভাল। কিন্তু এমনিভাবে তুমি আমার পিছু নেবে এ ধারণা আমি করিনি।

প্রথম লোকটি বলল: আমিও তাই বলি। আমি চলেছি আগে আগে কিন্তু তুমি পিছু নেবে—এ আমি চাই নে।

দ্বিতীয় লোকটি গম্ভীর হয়ে গেল। বলল: আমার আগে আগে চলেছ তুমি? এ হ'তেই পারে না, কোন রকমেই নয়। বল—আমরা চলেছি পাশাপাশি যুদ্ধের সৈনিকের মতো চলেছি পা গুনে গুনে।

—বেশ। তবে কথা থাক, যে-কোন অবস্থায় আমরা কেউ কারও কাজ পণ্ড করব না।

—আমি রাজি। দেখি তোমার হাত? —বলেই ফরাসী সাংবাদিক অলসাইড জুলিভেট ইংরেজ সাংবাদিক হ্যারি ব্লাউন্টের করমর্দন করল।

হ্যারি ব্লাউন্ট বলল: আর একটু হ'লেই জাহাজ তোমায় ফাঁকি দিত।

জুলিভেট জবাব দিল: ইয়ার্কি নাকি! জাহাজ ফাঁকি দিলেও তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না কিছুতেই। অন্য জাহাজ ভাড়া ক'রে অথবা রোজ কুড়ি রুবল দিয়ে ডাকের ঘোড়া চুক্তি ক'রে তোমার আগেই, বুঝলে তো! কি, টাকার কথা? টাকাতো আমার বোনই দিত? কি আর করি বল? টেলিগ্রাফ অফিসটা যে অত দূরে কে জানত!

হ্যারি ব্লাউন্ট ঠোঁট কামড়াতে লাগল। শেষে জিজ্ঞেস করল: তুমি টেলিগ্রাফ অফিসে গেছলে?

জুলিভেট দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, ওখানেই তো দেরি হয়ে গেল।

—তাহলে এখনও কলিভান শহর অবধি তার চলে?

—তা ঠিক জানিনে, তবে একথা নিশ্চয় বলতে পারি, কাসান থেকে প্যারিসের পথ খোলাই আছে।

—তাহ'লে তোমার বোনের কাছে খবর পাঠিয়েছ নিশ্চয়?

অলসাইড জুলিভেট ঘাড় নেড়ে বলল: তা আর পাঠাইনি! পাঠিয়েছি খুব ফলাও করে—উচ্ছ্বসিত ভাষায়।

—তা হলে তুমি নূতন কিছু জেনেছ···

—তা আর বলতে। শোন তা হ'লে তোমায় কাছে তো আর গোপন করতে পারি না! টাটকা খবর: বিদ্রোহী তাতারবাহিনী সেমিপোলাটিনস্ক অতিক্রম করেছে। সেভা বরং কেওকার পার। এখন তা'রা ইরতিশ নদীর

তীরে ঘাঁটি ফেলেছে। শুনলে তো। তুমি এখন নি:সন্দেহে এ খবর তোমার কাগজে পাঠিয়ে দিতে পার।

হ্যারি ব্রাউন্ট থমে গেল। এমন খবরটা সে জানতে পারেনি! আশ্চর্য! অথচ তারই প্রতিদ্বন্দ্বী বন্ধুটি আগেই কাসানের কোন লোকের কাছে জেনে নিল? শুধু তাই নয়। দেখছি এতক্ষণে সে খবর প্যারিসেও পৌঁছে গেছে, আর ওদিকে ডেলি টেলিগ্রাফ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব? ক্ষোভে দুঃখে হ্যারি ব্লাউন্টের মন ভরে উঠল। সে উঠে দাঁড়াল। হাত দুটো পেছন দিকে নিয়ে সে দু'চার বার পাইচারি করল। তারপর পিছনের ডেকে একটা বেঞ্চির ওপর ধপাস ক'রে ব'সে পড়ল। আর একটি কথাও তার মুখ দিয়ে বেরুল না।

বেলা প্রায় ১০টা।

মেয়েটি এবার শয্যা ছেড়ে ডেকে এসে দাঁড়াল। তখন প্রাতভোজনের ঘণ্টা পড়েছে। মাইকেল তাকে সঙ্গে নিয়ে গেল ডাইনিং রুমে। মেয়েটি সামান্য কিছু আহার করল—যন নিঃসম্বল অনাহার পক্ষে এ সামান্যই যথেষ্ট। মাইকেল নিজেই উভয়ের দাম চু কয়ে দিল। মেয়েটি তাতে বরং খুসীই হ'ল। প্রায় বিশ মিনিট পরে তারা আহার শেষ ক'রে ডেকের ওপর একটা বেঞ্চিতে এসে বসল। মেয়েটি এবার কোন ভূমিকা না ক'রেই বলতে লাগল নিম্নস্বরে।

—ব্রাদার, আমার নাম নাদিয়া ফেডর। আমি এক নির্বাসিত ব্যক্তির সন্তান। এক মাস হ'ল রিগা শহরে আমার মা মারা গেছেন। তাই এখন আমি ইরকুটস্কে চলেছি নির্বাসিত পিতার আশ্রয়ে

মাইকেল বলল আমিও ইরকুটস্কে যাচ্ছি। ভগবান করুন, আমি যেন নাদিয়া ফেডরকে তার পিতার কাছে নির্বিঘ্নে পৌঁছে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি।

কৃতজ্ঞতার সহিত জবাব দিল নাদিয়া ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

তারপর মাইকেল জানাল—সে যে হুকুমনামা পেয়েছে, তাতে সাইবেরিয়ার সব রাস্তায় যাবার অনুমতি রয়েছে, কাজেই কোন সরকারী লোক তাদের কোথাও বাধা দেবে না।

নাদিয়া মাইকেলের মুখের দিকে তাকাল। এ কথার কোন উত্তর সে দিতে পারল না। মনে মনে বলল, কি শুভমুহূর্তেই-না এই সজ্জন লোকটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। পরে সে জানাল আমিও ইরকুটস্কে যাবার অনুমতি পেয়েছিলাম। কিন্তু সরকারের নূতন ঘোষণায় তা বাতিল হয়ে গেল। তুমি আমায় অনুগ্রহ না করলে আমাকে নিজনী-নভগরডেই পড়ে থাকতে হ'ত। কী মুস্কিলেই না পড়তাম তখন!

মাইকেল বলল : সাইবেরিয়ার প্রান্তর অতি ভীষণ। সে পথ পেরিয়ে যাওয়া সাধারণের পক্ষে সহজ নয়। তার ওপর এখন তাতার জাত বিদ্রোহী হয়েছে। এ অবস্থায় তুমি একা কোন্ সাহসে বেরিয়েছ ?

নাদিয়া বলল : আমি যখন রিগা থেকে রওনা হই, তখন বিদ্রোহের খবর পাইনি। পথে ঐ সংবাদ পাই।

—তা জেনেও তুমি এতদূর এলে ?

—আমাকে যে যেতেই হবে, ব্রাদার ! এ আমার কর্তব্য।

মেয়েটির এই অসীম সাহস ও দৃঢ়তা দেখে মাইকেল অবাক হল।

তারপর নাদিয়া বলতে লাগল তার পিতার কথা : পিতার নাম ওয়াসিলি ফেডর। তিনি ছিলেন রিগা শহরে একজন নামকরা চিকিৎসক। কিন্তু কোন রাজনৈতিক গুপ্তদলের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে এই সন্দেহে তাঁর নির্বাসন হয়। এখন তিনি ইরকুটস্কে আছেন। আমার মনে পড়ে, যখন তিনি মাকে একটি বার দেখে আর আমাকে চুমু খেয়ে বিদায় নিলেন, তখন তাঁর চোখ জলে ভ'রে উঠেছিল।

নির্বাসনের দেড় বছর পর···মা আমার কোলে মাথা রেখে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। হতভাগিনী আমি। সংসারে আর কেউ নেই—একটি কপর্দকও নেই হাতে। কি করি ? শেষে পিতার আশ্রয়ে বাস করবার অনুমতি চেয়ে সরকারের কাছে আবেদন ক'রি। সরকার অনুগ্রহ করেছেন। বাবাকে সকল কথা লিখে জানালাম। তিনি নিশ্চয়ই আমার পথের দিকে চেয়ে আছেন। কোন রকমে যৎসামান্য অর্থ সংগ্রহ ক'রেই বেরিয়ে পড়েছি। পথের দুর্গমতা ? ও কথা আমার মনেই হয়নি। ভগবান আমার সহায়। আমার পক্ষে যা সাধ্য তা আমি করেছি—শেষের উপায় ভগবান করবেন।

মাইকেল অবাক হয়ে সব শুনতে লাগল।

জাহাজ তখন নদীর মাঝ দিয়ে পুরোদমে চলেছে।

নয়

পরদিন, ১৯শে জুলাই। জাহাজ নোঙর করল পার্ম শহরে।

বিশাল সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে বহুলোক এখানে এসে জাহাজে ওঠে। তারা যে-সব যানবাহন নিয়ে আসে, দীর্ঘ পথ-চলার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলোর বেশির ভাগই অকেজো হয়ে পড়ে। যারা এখান থেকে সাইবেরিয়ার দিকে যায়, তারা সেগুলো কিনে রাখে ও প্রয়োজন মতো মেরামত ক'রে চালু ক'রে নেয়।

পার্ম থেকে কিভাবে যেতে হবে—মাইকেল স্ট্রগফ আগেই তা ঠিক ক'রে রেখেছিল। তার ইচ্ছা ছিল, একখানা গাড়ী কিনে নিজেই চালিয়ে নেবে। কিন্তু

তার সে আশা বিফল হ'ল। সরকারের নূতন ঘোষণায় বহু বিদেশী লোক আগেই পার্ক ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কাজেই সেখানে কয়েকটি অকেজো ভাঙা গাড়ী ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পেল না।

এখন কি উপায়?

এ সময় সাইবেরিয়ার পথে দু রকম গাড়ীর প্রচলন ছিল। একরকম গাড়ী—নাম টেলেগা এবং অপরটির নাম—টেরেন্টাস। কাঠের তৈরী চার চাকার সাবেকি ধরণের গাড়ী এই টেলেগা। বেশ খোলামেলা, কিন্তু মোটেই আরামদায়ক নয়। স্ক্রু-পেরেকের বদলে শক্ত দড়ি দিয়ে এর প্রত্যেকটি অংশ বাঁধা। কিন্তু একদিক দিয়ে খুবই সুবিধে এই যে মাঝপথে বিগড়ে গেলে সহজেই মেরামত ক'রে নেওয়া চলে। তবে অনেক সময় চলতে চলতে পেছনের অংশ এমনভাবে আলগা হয়ে যায় যে দু' চাকা নিয়ে হয়ত সে অংশটা পেছনেই প'ড়ে রইল — গাড়োয়ান তা টেরই পায় না।

টেরেন্টাস গাড়ীও ঐ ধরণেরই, তবে বসতে আরাম। মাথার ওপর শক্ত চামড়ার ছাউনি। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেও কিছুটা নিরাপদ। মাঝপথে কোন কারণে ভেঙে গেলে মেরামত করা সহজ না হ'লেও তার পেছনের অংশ কোথাও প'ড়ে থাকার ভয় নেই।

অনেক চেষ্টার পর মাইকেল একটি টেরেন্টাস গাড়ীর খোঁজ পায়। প্রথমে সে কিছুক্ষণ গাড়ীটা নিয়ে দরদস্তুর করে। কেননা, ব্যবসায়ী হ'লে তার পরিচয় এবং দরকষাকষি ব্যবসায়েরই অঙ্গ। শেষ পর্যন্ত বেশ চড়া দামে সে গাড়ীটাকে হাত করে নিল। তারপর পোস্টিংস্টেশনে পরিচয় পত্রটা দেখাতেই তিনটি ঘোড়ারও বন্দোবস্ত হল। সাইবেরিয়ান ঘোড়া। গায়ে ভালুকের লোমের মতো বড় বড় কাল লোমে ঢাকা। আকারে ছোটখাট, কিন্তু ভয়ানক তেজী।

মাঝপথে দূরে দূরে রয়েছে এমন আরও পোস্টিং হাউস। সে সব জায়গায় ঘোড়া এবং সহিস বদলে নিতে হয়। যে লোকটি গাড়ী চালাবার জন্যে এল, সে একজন সাইবেরিয়ান। ঘোড়াগুলোর মতো তারও সারা গা লোমে ভর্তি। মাথায় পাক-মোড়ানো হ্যাট, কোমরে লাল রং-এর বেল্ট, গায়ে মোটা পশমের কোট—সরকারী ছাপ-মোহর বড় বড় বোতাম দিয়ে আঁটা। লোকটি এগিয়ে এসেই তার স্বভাবসুলভ কৌতুহলী নজর ফেলে তাকাল আরোহীদের ওপর। মাইকেল স্ট্রগফ ও নাদিয়ার সঙ্গে লটবহর তেমন ছিল না। তার ওপর পথশ্রমে তাদের চেহারা শীর্ণ-মলিন। কাজেই তাদের পয়সাওয়ালা লোক ব'লে লোকটি ভাবতে পারল না। তাই তাচ্ছিল্যভরে ভ্রূ কুঁচকে আপন মনেই বলতে লাগল: হ্যাঃ, এ যে 'কো'? 'কো' আমাকে আর কত পয়সাই বা দেবে—ছ্যাঃ ছ্যাঃ! মাইল প্রতি জোর ছয় কোপেক!

অবজ্ঞার সুরে আরও কত কি বলতে লাগল সে। আরোহীরা শুনলো কি শুনলো না—তা সে গ্রাহ্যই করল না।

মাইকেল স্ট্রগফ তার কথা শুনে হেসে ফেলল। বলল: না হে, 'ক্রো' নয় বল—'ঈগল'। ওগো [illegible], শুনতে পাচ্ছ—আমরা 'ঈগল'। মাইল প্রতি নয় কোপেক—তার ওপর মোটা বকশিস…

লোকটি এবার অতিরিক্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠল। হাতের কশাটা বার-দুই শাঁই শাঁই ক'রে ঘুরিয়ে একগাল হেসে বলল: ও, তাই নাকি? তা হলে তো…

'ক্রো' এবং 'ঈগল'—এই দুইটি রাশিয়ার গাড়োয়ানী বুলি। অতি সাধারণ যাত্রী যারা, পথ চলতে যারা বেশি খরচ করতে রাজী নয়, গাড়ীর জন্যে দু-তিন কোপেকের বেশি দেবার সামর্থ্য যাদের নেই, গাড়োয়ানী ভাষায় তারাই হোল 'ক্রো'। আর 'ঈগল'? পয়সা খরচ করতে যাদের গায়ে বাধে না, বকশিস-টকশিসও সাধ্যের বেশি যাদের কাছে, তারাই হ'ল 'ঈগল'। পক্ষিরাজ 'ঈগল'—সাধারণ 'কাক' তার সঙ্গে কাজে-কাজেই ওড়ার পাল্লাও দিতে পারে না।

মাইকেল বলল: নাদিয়া, আর দেরি নয়। এসো, উঠে বসি।

এই ব'লেই তারা গাড়ীতে চেপে বসল। নাদিয়ার হাতে ছোট্ট একটি খাবারের পুঁটুলি। যদি কোন কারণে অপর পোস্টিং হাউসে পৌঁছোতে বিলম্ব ঘটে, তাহ'লে ক্ষুধার তাড়না থেকে বাঁচবার জন্যেই এ ব্যবস্থা।

তখন দুপুর হয়েছে। মাথার ওপর ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ। বেশি লাভের আশায় গাড়োয়ান হাতের কশাটা আরও একবার শাঁই ক'রে ঘুরিয়ে নিল ঘোড়া-তিনটির মাথার ওপর দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ধুলোবালি উড়িয়ে ঝড়ের বেগে ছুটল টেরেন্তাস।

এমন উন্মাদের মতো গাড়ী চালানো—রাশিয়ান ও সাইবেরিয়ানদের কাছে যেমন কিছুই নয়, কিন্তু এ দৃশ্য দেখলে সাধারণ পথিকদের বুক কেঁপে ওঠে। পায়ের তলায় এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ে পথ। সামনের ঘোড়াটি সমান বেগে ধীর অথচ দ্রুত ছন্দে সব-কিছু ডিঙিয়ে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে দুপাশের ঘোড়াদুটিও চলেছে সমান তালে পা ফেলে।

এদিকে সহিসও নীরব ছিল না। সে হাতের কশা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাদের নিত্য ব্যবহৃত আর মধুর বিশেষণগুলো উচ্চারণ ক'রে ঘোড়াগুলোকে উত্তেজিত করতে লাগল। এক-এক অবস্থায় এক-এক রকমের বুলি। ঘোড়া ছুটেছে সমান-তালে—গাড়োয়ানের কি উল্লাস! সে বলে উঠল: বাহবা, আমার জংলী ঘুঘু রে—আমার আহ্লাদের চড়ুই! উড়ে চল—উড়ে চল—হা-হা—হা—কেমন

—আমার পক্ষিরাজ পায়রা গো—আহা-হা—এবার ডাইনে—ডাইনে—হুঃ—হুঃ ছোট্ট আমার বাবা গো—ও—ও—

আবার, চলার গতি মন্দ হ'ল কি অমনি সে তিক্তকণ্ঠে তিরস্কার করে উঠল : আঃ, হতচ্ছাড়া কুঁড়ে শামুক, আমাদের দেখছি। চলতে পারো না একেবারে গো—কুঁড়ের বাদশা কচ্ছপ কোথাকার। জোরসে চল্ এইসে—হাঁ—হাঁ—আব্ কাহে বাবা—হাঁ—হাঁ—

যা হোক, একথা সত্যি যে চালকের পেশীবহুল বাহুর জোরেই গাড়ী চলে না—একাজে গলার জোরই খাটে জোর। তাই এই সম্ভাষণ শুনে ঘোড়াগুলোর পিঠে সহসা যেন পক্ষিরাজের পাখা গজায়, আর তারা উড়ে চলে ঘণ্টায় বার-চৌদ্দ মাইল বেগে। যারা 'টঙ্গল'—তাদের গাড়ী এমনি ভাবেই চলে।

দিনটা বেশ ভাল ছিল। আকাশের অবস্থা চমৎকার। মেঘের চিহ্নমাত্র ছিল না। কিন্তু হাওয়াটা ছিল একটু ভারি ভারি। মধ্যে মধ্যে আকাশের দূর সীমারেখায় বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। ঘাসের ওপর পড়েছিল সাদা কুয়াশার জাল। এই পাহাড়ী পথে শীঘ্রই যে ঝড় উঠবে এমন কোন আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু মাইকেলের জীবনে প্রান্তর-পথের ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে অনেক বার। অবস্থা দেখে সে বুঝতে পারল—এ ঝড়ের পূর্বলক্ষণ।

গাড়ী একটানা চলে।

পরদিন, ২০শে জুলাই। ভোরবেলায় দেখা গেল, দূরে পূর্বদিক জুড়ে রয়েছে উরাল পর্বত। পর্বতের চূড়োয় সাদা বরফের মুকুট। ইউরোপীয় রাশিয়া এবং সাইবেরিয়ার সীমানা এই পর্বতশ্রেণী। বহুদূর থেকে মনে হয়, পর্বত আর বেশি দূরে নয়। কিন্তু তা নয়। মাইকেল অনুমান করল, সন্ধ্যার আগে কিছুতেই সেখানে পৌঁছোনো যাবে না।

ভোর থেকেই আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল। সারাদিন ধ'রে এমনি ভাব। শেষবেলায় দিনের গুমোট ভাব অনেকটা ক'মে এল বটে কিন্তু আবহাওয়া হয়ে উঠল ভয়ানক।

এমনি দুর্যোগের মুহূর্তে রাতের বেলায় পাহাড়ে না উঠলেই বরং ভাল ছিল। কিন্তু মাইকেল তাতে রাজী হ'ল না। কোথাও সে অহেতুক বিলম্ব করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত তাদের গাড়ী যখন একটি স্টেশনে এসে পৌঁছোল, তখন আকাশ ভেঙে কড়্‌কড়্ করে বাজ পড়ল। গাড়োয়ান এই দুর্যোগের ইঙ্গিত করতেই মাইকেল একবার আকাশের দিকে তাকাল। তারপর পথের দিকে চেয়ে বলল : অনেক দূরে একটা গাড়ী দেখা যাচ্ছে—না?

গাড়োয়ান জবাব দিল : আজ্ঞে হাঁ, তেলেগা গাড়ী।

—কতদূরে ?

—প্রায় এক ঘণ্টার পথ।

—তা হ'লে আর দেরি নয়। চালাও জোরে। তিনগুণ বকশিষ, বুঝলে ? যদি কাল ভোরে এক্যারেনবার্গ-এ পৌঁছে দিতে পার তা হ'লে বুঝলে—তা হ'লে তিনগুণ বকশিস—তিন গুণ। চালাও…

দশ

পাহাড়ে-পথে আঁধার নেমে এল সন্ধ্যা হবার আগেই। আকাশের দিকে তখনও শাদা কুয়াশার আবরণ। ক্রমে ঐ আবরণ নীচের দিকে নেমে এল। রাশি রাশি মেঘের পাতর ছায়া ঘিরে এল প্রান্তর-পথে। আর ঐ ছায়ার পেছনে ছুটে এল প্রচণ্ড ঝড়।

এ রকম ঝড়ের প্রকৃতি মাইকেলের জানা ছিল। সে বুঝতে পারল—হিমের দিনের তীব্র তুষার-বৃষ্টির মতো এই ঝড় ক্রমেই বেড়ে আসবে।

এই ঝড়ের মুখে রাত্রি ভোর না হওয়া পর্যন্ত কোথাও অপেক্ষা করাই বরং ভাল ছিল। এ ক্ষেত্রেও মাইকেল তা করেনি। তার কারণ আগের গাড়ীটি। তার সন্দেহ হ'ল যে, এমন কোন গুরুতর কারণ আছে যার জন্যে ঐ তেলেগা গাড়ীর আরোহীরা নিশ্চয় অবিবেচকের মতো এই ঝড়ের মুখেও পাহাড় ডিঙোবার চেষ্টা করছে।

রাত্রি ১১টা থেকে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। আকাশের বিশাল বুকে যেন আগুন লেগেছে। এদিকে ওদিকে আধমরা পাইন গাছের ঝাঁকড়া মাথায় যেন চপল আগুনের লুকোচুরি খেলা সুরু হল। বিজুলীর আলোকে সময় সময় দেখা যায়—পাহাড়ের দু'পাশের প্রকাণ্ড খাদগুলো হিংস্র জানোয়ারের মতো রাক্ষুসে ক্ষুধা নিয়ে হাঁ মেলে রয়েছে। পুল পেরুতে গিয়ে এক-একবার গাড়ী অস্বাভাবিক রকম কাৎ হয়ে পড়ে। একদিকে ঝড়ের দাপট, তার ওপর এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ে পথ। বেচারা ঘোড়াগুলো এবার হাঁপিয়ে উঠল। মাইকেল চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল : পাহাড়ের ওপরে যেতে আর কতক্ষণ ?

গাড়োয়ান বিরক্ত হয়ে জবাব দিল : শেষ রাত্তিরের আগে নয়।

এমনি সময় কড়্ কড়্ শব্দে আবার বাজ পড়ল। ভয়ে ঘোড়াগুলো উঠল ক্ষেপে। গাড়োয়ান লাফিয়ে পড়ল নিচে। মাইকেলও তাড়াতাড়ি নিচে নেমে তাকে সাহায্য করল। আকস্মিক বিপদ এড়াল কোন রকমে।

কিন্তু ঝড়ের প্রচণ্ডতা ক্রমেই বাড়তে লাগল। গাছপালা ভেঙে চুরে ধারুণ

ঝাপটা মাতামাতি সুরু ক'রে দিল। পাহাড়-চুড়ো থেকে পাথরের চাপ খসে গড়িয়ে পড়তে লাগল ঢালুপথে।

মাইকেল চেঁচিয়ে বলল : এখানে তো আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না!

গাড়োয়ান ভয়ে মুষড়ে পড়েছিল। নিতান্ত অভদ্রের মতো চেঁচিয়ে জবাব দিল : দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয় কোথাও। নিদারুণ ঝড়ের ঝাপটা এক্ষুণি আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে পাহাড়ের তলায়। তা হ'লেই সব ল্যাঠা মিটে যায়।

মাইকেল গর্জে উঠল : ভীরু কোথাকার, ঐ বড় ঘোড়াটাকে আগে সাপটে ধর শীগ্‌গির। বাকীটা আমি নিজেই সামলাব।

এ সময় আর একটা ঝাপ্‌টা এসে বাধা দিল। বিপদ বুঝে উভয়েই মাথা নিচু করে ব'সে পড়েছিল—নতুবা ঝড়ে তাদের উড়িয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু ঘোড়াগুলোকে কোনরকমেই বাগ মানিয়ে রাখা গেল না। গাড়ী ক্রমেই পিছু হটতে লাগল। পিছনেই গভীর খাদ। আর পেছুলেই তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত কিন্তু, ভাগ্যক্রমে একটা প্রকাণ্ড পাইন গাছে ধাক্কা খেয়ে গাড়ীখানা আটকে গেল। এরা বেঁচে গেল এই আসন্ন মহাবিপদ থেকে।

মাইকেল প্রচণ্ড হাঁপ ছেড়ে চেঁচিয়ে বলল : নাদিয়া, ভয় নেই, ভয় ক'রো না।

—না ব্রাদার, আমি ভয় পাইনি।—নাদিয়া ধীরভাবে বলল। একটুও ভয়ের আভাস পাওয়া গেল না তার কণ্ঠস্বরে।

কিন্তু বিপদ এখানেই কাটেনি। ঝড়ের দাপাদাপি একই রকম চলেছে। বিদ্যুতের আলোতে তারা দেখতে পেল, একটি প্রকাণ্ড পাহাড় চূড়ো ভেঙে প্রচণ্ড বেগে গড়িয়ে নেমে আসছে।

গাড়োয়ান প্রাণের ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

মাইকেল দেখল, আর সময় নেই। প্রথমে ঘোড়াগুলোকে সজোরে চাবুক মেরে সরাতে চেষ্টা করল। কিন্তু নিষ্ফল চেষ্টা। গাড়ী এই মুহূর্তে চুরমার হয়ে যাবে। নাদিয়াকে টেনে বাইরে নিয়ে আসবে এ সময়টুকুও আর নেই।

মাইকেল একলাফে গাড়ীর পেছনে গিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াল বিপদের মুখোমুখি হয়ে। প্রচণ্ড বেগে নেমে এল পাহাড়ের চূড়ো,—যেন নির্মম কামানের গোলা। চক্ষের নিমেষে মাইকেলের বুকের পাশ ঘেঁসে ধাক্কা খেয়ে প্রকাণ্ড চাপ নির্দিষ্ট পথ থেকে স'রে গেল এবং হুড়মুড় করে শত শত ফিট নীচে পাহাড়ের খাদে গড়িয়ে পড়ল।

নাদিয়া চেঁচিয়ে উঠল : ব্রাদার—ব্রাদার…

মাইকেল রুদ্ধশ্বাসে জবাব দিল : ভয় নেই, নাদিয়া!—ভগবান বাঁচিয়েছেন।

নাদিয়া বলল : ভয় আমার জন্যে নয়, ব্রাদার—আমার জন্যে নয়।

মাইকেল বলল : ভেবো না বোন, ভগবান সহায়।

নাদিয়া এবার জবাব দিল না। কেবল আপন মনে বলল : ভগবান আছেন এবং আমার বিপদে তিনিই তোমায় পাঠিয়েছেন।

মাইকেল ও গাড়োয়ান এবার অতিকষ্টে ঘোড়াগুলোকে ঠেলে একটা সুঁড়ি পথে নিয়ে গেল। পথটি উত্তর-দক্ষিণে চ'লে গেছে। কাছেই মুখোমুখি খাপটা থেকে কাছাকাছি একটা মুক্ত একটি পাহাড়-চূড়া ঠেলে রাস্তাটির ওপর এসে পড়েছিল।

অবিশ্রান্ত মাতামাতির শব্দ শোনা যাচ্ছিল তখনও। পাহাড়-চূড়োয় দেবদারু গাছের সারি, ঝড়ের দাপটে মাথাগুলো ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে—কে যেন বিরাট করাত চালিয়ে নিয়ে গেছে তাদের মাথার ওপর দিয়ে।

নিকটেই ছিল একটা গুহা। হয়ত এক সময়ে কোন লোক খনির সন্ধানে এসে সেই স্থান খুঁড়ে গর্ত করেছিল। মাইকেল নাদিয়াকে সেখানে বিশ্রাম করতে বলল।

ঠিক এই মুহূর্তে এক অদ্ভুত দৃশ্য প্রকাশ পেল। আকাশ হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তীব্র আলোয়। মনে হ'ল, মেঘের আবরণ হঠাৎ স'রে গিয়ে ভোরের পথ দেখা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কানফাটানো বজ্রপাত। বাতাস ভারী হয়ে উঠল গন্ধকের ধোঁয়ায়। দাউ দাউ ক'রে দাবানল জ্ব'লে উঠল পাইন গাছের মাথায় মাথায়।

বজ্রপাতের গুরুগম্ভীর শব্দ এসে পাহাড়ের শেষ চূড়োয় ধাক্কা খেয়ে মিলিয়ে গেল। মাইকেলের সতর্ক দৃষ্টি দাবানলের ওপর। এমন মুহূর্তে নাদিয়া তার হাত চেপে ধরল। কম্পিতকণ্ঠে বলল। শোন—শোন কে যেন বিপদে প'ড়ে আমাদের ডাকছে।

এগারো

মাইকেল উৎকর্ণ হয়ে শুনল।

গাড়োয়ানও শুনতে পেল। কিন্তু বলল—বৃথা আশা! এ সময়ে কোন উপকারই আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়।

মাইকেল বিরক্ত হ'ল। বলল : কেন? আমরা যদি এমনভাবে বিপন্ন হয়ে পড়তাম, তাহ'লে কি ওরা আমাদের জন্যে এগিয়ে আসত না।

—কিন্তু ঘোড়াগুলোকে এ সময়ে এক পাও নড়াতে পারবে না তুমি।

মাইকেল বলল : ঘোড়ার প্রয়োজন কি? আমি হেঁটে যাব সেখানে।

—আমিও যাব, ভাই!—নাদিয়া আগ্রহভরে বলল।

—আমিই যাব, বোন, তুমি এখানেই থাক। গাড়োয়ান তোমার কাছে রইল। এত বড় সাহসী লোকটাকে তো আর একলা ফেলে যেতে পারি না।

নাদিয়া আগ্রহ দমন ক'রে হাসিমুখে বলল। তাই হবে, ব্রাদার। আমি অপেক্ষা করব।

—কিন্তু বল, এখান থেকে তুমি এক পাও নড়বে না।

—না ব্রাদার, তোমার বোনটি তোমার অপেক্ষায় এখানে ঠিক ব'সে থাকবে।

মাইকেল নিশ্চিন্তমনে আঁধারে মিলিয়ে গেল।

নদিস এবার মুখ তুলল। বলল। ভয়ানক ভুল করল তোমার ভাই।

শান্তভাবে নাদিয়া জবাব দিল। না, ভুল একটুও করে নি।

মাইকেল ভাবল : আগে আগে যার টেলেগা গাড়ি ছুটিয়ে চলেছিল, সম্ভবতঃ তারাই বিপদে পড়েছে। কড়মড়া ফেলে কিছুদূর যেতেই শুনতে পেল, একজন বলছে : গাড়োয়ানটি কি আহাম্মক বল তো? গাড়োয়ানী বুদ্ধি আর কত হবে? ব্যাটা এতক্ষণে বুঝে এলো?

অপর একজন বলল : পরের স্টেশনে গিয়ে নিই। চাবুকে লাল ক'রে দেব ... বুঝবে বোকামির কি মজা!

প্রথম ব্যক্তি আবার বলল। কি হে নরাবের পো, শুনতে পাচ্ছ না বুঝি! দেখ ছ, তুমি হাড়ে হাড়ে শয়তান!

মাইকেল ব্যাপারটা বুঝে নিল। অন্ধকারে তাকেই ওরা গাড়োয়ান ধ'রে নিয়েছে।

আবার প্রথম ব্যক্তির কথা শোনা গেল : এ দেশের গাড়ির দস্তুরই এই।

দ্বিতীয় জন বলল। ঠিক, টেলেগা গাড়ী এ রকমই...

—আর গাড়োয়ানটাও কি অদ্ভুত লোক বল তো? সে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলেছে তো চলেছেই, আরোহীরা সঙ্গে রইল, কি কোথায় প'ড়ে রইল—একটিবারও ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে না।

হঠাৎ বিদ্যুতের আলোতে দেখা গেল, প্রায় পনর-বিশ গজ দূরে দুটি লোক দু-চাকার এক অদ্ভুত গাড়ীতে পা-গা ব'সে ভিজছে। দুটি চাকাই প্রায় ব'সে গেছে কাদা আর জলে।

মাইকেল এবার চিনতে পারল তাদের। সেই দুজন রিপোর্টার। একই জাহাজের যাত্রী ছিল ওরা।

জলিভেট সাংবাদিক উল্লসিত হয়ে উঠল মাইকেলকে দেখে। বলল : নমস্কার—নমস্কার! তুমি এখানে? তোমাকে জাহাজে দেখেছি, না! এসো, আমার প্রিয় শত্রু হ্যারি ব্লাউন্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

হ্যারি ব্রাউন্টও মাথা হেলিয়ে নমস্কার জানাল : ওহো, তুমি কি—

মাইকেল বলল : আমার নাম নিকোলাস কোর্পানক। কিন্তু জানতে পারি এমন দুর্যোগে ব'সে ব'সে কি নিয়ে এত তর্ক চলেছে তোমাদের ?

—বাস্তবিক মিঃ কোর্পানক—সকৌতুকে জবাব দিল অলরাইট জুলিয়েট।

একবার কল্পনা করতো এভাবে আমাদের জঙ্গলে বসিয়ে রেখে গাড়োয়ান ব্যাটা গাড়ীর সামনের ভাগটা নিয়ে কেমন নিশ্চিন্তমনে সটকে পড়েছে। এই দেখ, টেম্পার পেছনের ভাগটায় আমরা কেমন দিব্যি বসে রয়েছি ! ঘোড়া নেই, গাড়োয়ান নেই,—রসিকতা নয় কি ?

—রসিকতা ? মোটেই রসিকতা নয় :—গম্ভীরভাবে বলল হ্যারি ব্রাউন্ট।

—রসিকতা নয় তো কি বন্ধু ! দেখছি, কোন কিছুর ভাল দিকটা তুমি মোটেই দেখতে পার না।

অলরাইট এমন একটা রসিকতার ভঙ্গিতে কথাটা বলল যে মাইকেল না হেসে পারল না হেসে বলল : এখানে ব'সে থেকে তো লাভ নেই। চল, ওদিকে আমার গাড়ী রয়েছে। ঝড় থামুক, তখন একটা ঘোড়া তোমাদের দেব।

—সাধু প্রস্তাব। তোমায় ধন্যবাদ।—অলরাইট জুলিয়েট বলল।

মাইকেল বলল : আমার টেরেন্টাসে জায়গা নেই। সঙ্গে আমার বোন রয়েছে। নইলে কোন রকমে ঠাঁই ক'রে নিতাম।

হ্যারি ব্রাউন্ট বলল : তোমার পরামর্শ মেনে নিলাম সানন্দে। কিন্তু আমাদের সেই গাড়োয়ানটিকে যে আচ্ছা রকম···

মাইকেল বলল : বিরক্ত হয়ো না—টেরেন্টাস গাড়ীতে এরকম দুর্ঘটনা অনেকের ভাগ্যেই ঘ'টে থাকে।

—কিন্তু ব্যাটা ফিরলো না কেন ? হতভাগা কি জানে না যে আমরা পেছনে প'ড়ে রয়েছি ?

—না, সে টেরও পায়নি যে তোমরা প'ড়ে রয়েছ।—মাইকেল বলল।

—কী যে বল ! শয়তানটা কি জানে না যে গাড়ীর আসল ভাগটাই সে পেছনে ফেলে গেছে ?

মোটেই না। —মাইকেল হেসে বলল। সরল বিশ্বাসে লোকটি গাড়ি হাঁকিয়েই গেছে, পেছনটা যে ভেঙে পড়ে রইল—সে তার কি জানে ?

জুলিয়েট এবার চেঁচিয়ে উঠল সকৌতুকে : কেমন বন্ধু, আমি আগেই তো বলেছি—কি সুন্দর তামাসা !

মাইকেল হেসে বলল : এবার চলো, আমাদের গাড়ীটাকে নিয়ে আসি।

এই কথার পর উত্তরেই মাইকেলের সব নিল।

অলসাইত জুলিভেট এবার তার স্বভাবসুলভ রসিকতা প্রকাশ করতে লাগল। পরে বলল : বাস্তবিক বলছি মিঃ কোর্পানক, মহাসঙ্কট থেকে তুমি আমাদের বাঁচালে।

মাইকেল জবাব দিল : অসময়ে সবাই যা করে আমি তার বেশি কিছু করি নি। পথিক যদি পথিকের জন্যে এ-টুকু না করে, তবে পথে চলাই দায়।

কোথায় যাবে [illegible] পোর্টারদের এই প্রশ্ন এড়াবার জন্যে মাইকেল নিজেই বলল তোমরা কোথায় যাবে? আমি তো ওমস্ক শহরে যাচ্ছি।

অলসাইত জুলিভেট জবাব দিল : আমরা এমন যায়গায় চলেছি, যেখানে নিত্য বিপদ-আপদ লেগেই আছে, অথচ টাটকা খবরের অভাব হয় না।

মাইকেল কি ভাবল। তারপর বলল : তা হ'লে তোমরা ওমস্কে যাবে তো?

অলসাইত বলল : এখন কিছুই বলা যায় না। তবে ইসিম পর্যন্ত যে যাব তাতে ভুল নেই। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

অন্ধকারে তারা এগোতে লাগল সাবধানে পা ফেলে। কিছু দূর যাবার পরই সবাই চমকে উঠল, হঠাৎ পিস্তলের আওয়াজে।

মাইকেল চঞ্চল হয়ে উঠল। বলল : হয় ত কোন বিপদ ঘটেছে। তোমরা তাড়াতাড়ি এসো।

এই ব'লেই সে ছুটে গাড়ীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একটা গম্‌ গম্‌ শব্দ ভেসে এল তার কানে। সঙ্গে সঙ্গে আবার পিস্তলের আওয়াজ।

দুর্দান্ত ভাল্লুকের গর্জন।

মাইকেল চেঁচিয়ে উঠল : নাদিয়া—নাদিয়া—

সঙ্গে সঙ্গে সে-কোমর থেকে ভোজালী টেনে বের করল এবং যেখানে নাদিয়ার অপেক্ষা করার কথা—সেই গুহামুখে লাফিয়ে পড়ল।

দগ্ধ পাইন-বনের মাথায় তখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছিল এবং সে জায়গার আবহাওয়াকে ভয়ানক ক'রে তুলেছিল।

মাইকেল অস্পষ্ট আলোকে দেখল : একটি প্রকাণ্ড জানোয়ার তার দিকে থাবা বাগিয়ে লাফিয়ে আসছে।

ভীষণকায় এক সাইবেরিয়ান ভল্লুক। ঝড়-বৃষ্টিতে টিকতে না পেরে সম্ভবত সে এই চালুপথে এসে পড়েছিল নিজের গুহায় আশ্রয় নিতে। যে গুহায় যাত্রিরা আশ্রয় নিয়েছিল, সে যে ভালুকের বাসা, একথা তাদের মনেই হয় নি।

এই ভীষণ দুর্দান্ত জানোয়ারটিকে দেখেই ঘোড়াগুলো ভয়ে চঞ্চল হয়ে পড়েছিল।

দুটি ঘোড়া কোন রকমে দড়িদড়া ছিঁড়ে ছুটে পালাল। ভয়ে কাঠ হয়ে গেল গাড়োয়ান-বেচারা। তার ঘোড়া পালাচ্ছে—এই অজুহাতে সেও ঘোড়ার পেছনে ছুটল নাদিয়াকে একলা ফেলেই।

অসহায় নাদিয়া। সম্মুখে তার মৃত্যুরূপী হিংস্র জানোয়ার।

কিন্তু এ অবস্থাতেও সে মনের স্থিরতা হারাল না। জানোয়ারটি হয়ত প্রথমে তাকে দেখতে পায় নি। তাই যে-ঘোড়াটি গাড়ীতে তখনও বাঁধা অবস্থায় ছিল, সেদিকেই ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল।

নাদিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে পাশের কাছে গিয়ে মাইকেলের পিস্তলটি উঠিয়ে ভালুকের ওপর গুলি চালায়।

লক্ষ্য ব্যর্থ হয় নি।

আঘাত পেয়ে জানোয়ারটি ফিরে দাঁড়ায় এবং সম্মুখে মানুষ দেখে রাগে গোঙরাতে থাকে। নাদিয়া তখন আশ্রয় নেয় গাড়ীর আড়ালে। ভালুকটি লাফিয়ে আসে তার দিকে। নাদিয়া সঙ্গে সঙ্গে আবার গুলি চালায়।

ঠিক এই মুহূর্তে মাইকেল এসে দাঁড়াল ভালুকটির সামনে। চোখের পলকে তার হাতের তোয়ালি আমূল বসিয়ে দিল ভালুকের বুকে। ভালুকটি বিকট গর্জন ক'রে উঠল এবং পরমুহূর্তেই বিরাট লোমশ দেহ নিয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল জড়স্তূপের মতো।

—তুমি আহত হয়েছ বোন?—মাইকেল ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলে।

নাদিয়া শান্তকণ্ঠে জবাব দিল: না দাদা।

এ সময়ে রিপোর্টার দুজনও কাছে এসে পড়েছিল। মাইকেলের অদ্ভুত সাহস দেখে তারা অবাক হ'ল।

জুলিভেট বাহবা দিয়ে বলল: সাধারণ সওদাগর—কিন্তু কি চমৎকার হাত! চোখের নিমেষে কি কায়দাই-না জানোয়ারটিকে জাহান্নমে পাঠালে! আশ্চর্য!

হ্যারি ব্লাউন্ট তার আপাদমস্তক একবার ভাল ক'রে লক্ষ্য করল। তারপর দু পা এগিয়ে এসে টুপি খুলে নাদিয়াকে নমস্কার জানাল।

নাদিয়াও মাথা হেলিয়ে প্রতি-নমস্কার জানাল।

অলসাইড জুলিভেট মাইকেলের দিকে ফিরে বলল ভাইয়ের উপযুক্ত বোনই বটে। আমি যদি ভালুক হতাম, তা হ'লে কখনো এক্ষেত্রে গোঁয়ার্তুমি দেখাতাম না। জেনে শুনে কে আসত এখানে মরতে!

এ সময়ে গাড়োয়ান ফিরে এল ঘোড়াদুটিকে নিয়ে। মৃত জানোয়ারটির দিকে চেয়েই সে চমকে উঠল। তারপর সকলের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ীর কাছে এসে নিজের কাজে মন দিল।

এই ব'লেই সে পকেট থেকে কয়েকটি কোপেক উঠিয়ে লোকটার হাতে দিয়ে বলল এই নাও প্রিয় বন্ধু। না নিলাম, তোমার পক্ষে এই যথেষ্ট. আরও যে পেলে না, তোমার দোষ নয়।

অলসাইড জুলিভেটের এই ব্যবহারে [illegible] ড্রাইভার আরও ক্ষেপে উঠল চড়া গলায় এই ব'লে শাসাতে লাগল যে তেলেগার মালিকের নামে সে ভয়ানক অভিযোগ আনবে।

অলসাইড সকৌতুকে বলল অভিযোগ—মোকদ্দমা! এই রাশিয়ায়! অসম্ভব। বন্ধু, তা হ'লে অনেক কষ্ট করতে হবে আর হবে এর নিষ্পত্তি হ'তে-হ'তে এত সময় তুমি পাবে কোথা? তুমি হয়ত জান যে প'চিশ বছরের অভিযোগ শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছিল?

—কৈ তেমন কোন গল্প তো আমি শুনি নি।

শোন, তা হ'লে। অভিযোগ ছিল, বারমাস ধ'রে একটি শিশুকে সে বুকের দুধ দিয়ে বাঁচিয়ে তুলেছিল, কিন্তু সে তার পাওনা পায়নি।

তারপর?

তারপর দুধের ধার অবশ্য আদায় হয়েছিল। বিচারে তারই জয় হয় কিনা…

হাঁ, বল তারপর?

রায় যখন বেরুল, তখন সেই বারোমাসের শিশু রাশিয়ার কর্ণেল অর্থাৎ সেনাপতি।

এই কথা শুনে সবাই হো-হো ক'রে হেসে উঠল।

নিজের এই রহস্যজনক গল্পে অলসাইড জুলিভেট নিজেও বেশ কৌতুক উপভোগ করল। হাসিমুখে সে পকেট থেকে নোটবই খুলে লিখল অভিধানের ভাষায়—

টেলেগা—রাশিয়া দেশের চার চাকার গাড়ী: যখন চলে তখন চার চাকার। —কিন্তু যখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছোয় তখন দু-চাকার।

তারপর নোটবইটি পকেটে গুঁজে বলল: টেলেগার এই সহজ ব্যাখ্যা পরবর্তী সংস্করণের ফরাসী অভিধানের জন্যে রইল।

বারো

ভৌগোলিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে একাটেরিনবার্গ শহরটি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত ব'লে ধরা যেতে পারে। কারণ উরাল পর্বতের যে অংশ পূর্বদিকে বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে, এই নগর তারই একপাশে। কিন্তু স্থানটি পার্ম-সরকারের অধী-

—ইউরোপীয় রাশিয়ার একটি বড় প্রদেশ। সাইবেরিয়ার মুখের গ্রাস যেন রাশিয়ার ভল্লুক কেড়ে কামড়ে নিয়েছে।

আলসাইড জুলিভেট ও হ্যারি ব্লাউণ্ট এখানে বাহন বদলে নিল। এবার টেরেন্টাস গাড়ী। অর্ধচন্দ্রমার্কা গাড়ীর যে দুটো চাকা তাদের এ শহর পর্যন্ত নিয়ে এসেছে, তারা এবার তা নির্মমভাবে পরিত্যাগ করল। এতটা পাহাড়ে পথ পেরিয়ে এসেও মাইকেলের গাড়ীর তেমন ক্ষতি হয়নি। সে এবার তিনটি তেজী ঘোড়া তাতে জুড়ে দিল। অতি দ্রুত পথ-চলার জন্যেই তাড়াতাড়ি এই ব্যবস্থা করে নিতে হ'ল।

দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদে দু'খানা গাড়ী একসঙ্গে যাত্রা করল শহর ছেড়ে।

বিশাল প্রান্তরের উপর দিয়ে চলেছে গাড়ী। মরুময় প্রান্তর ধুলোবালিতে একাকার। দিনের অবস্থা মোটামুটি মন্দ ছিল না। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ। এই কারণে রৌদ্রের তাপ অনেকটা সহনীয় ছিল। গাড়ীদুটোতে যদি দুটো স্প্রিং-গদি আঁটা থাকত, তাহলে তাদের এ দীর্ঘ-যাত্রায় কোন অসুবিধার অভিযোগ থাকত না।

পরদিন, ২৩শে জুলাই।

দুখানা গাড়ীই সমান বেগে চলেছে। ইসিম শহর আর মাত্র ত্রিশ ভার্সট্। এমনি সময় মাইকেল দেখল—অনেক দূরে তাদের আগে আগে একখানি গাড়ী চলেছে। টেলেগা বা টেরেন্টাস গাড়ী নয়—সাধারণ পোস্ট বার্লিন গাড়ী। গতি অতটা দ্রুত নয়। মনে হল, দীর্ঘপথশ্রমে ঘোড়াগুলো খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কেবল সহিসের হাতের চাবুকের তাড়নায় আর গালাগালির জোরে কোন রকমে গাড়ীখানা টেনে নিয়ে চলেছে।

মাইকেল ভারি চিন্তিত হয়ে পড়ল। ভাবল: ভাল ঘোড়া পেতে হ'লে ঐ যে গাড়ীটা চলেছে তার আগেই পরের স্টেশনে পৌঁছোতে হবে। একথা সে গাড়োয়ানকে জানাল।

বকশিসের লোভে গাড়োয়ান টেরেন্টাস ছুটাল আরও জোরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা আগের বার্লিন গাড়ীর অতি নিকটে এসে পড়ল। পাশ কাটিয়ে যেতেই খটাস করে খুলে গেল সেই গাড়ীর জানালা। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করার অবসর মাইকেলের ছিল না।

ঠিক এই মুহূর্তেই দৃঢ় গম্ভীর আদেশের স্বর ভেসে এল: থামাও থামাও—কিন্তু মাইকেল সে কথায় কান দিল না। তার ইঙ্গিতে আরও জোরে টেরেন্টাস ছুটল। বার্লিন গাড়ী পিছিয়ে পড়ল অনেক দূরে।

এবার রীতিমত সুরু হল দৌড়ের পালা। সামনের গাড়ীদুটোকে দেখে পেছনের গাড়ীর ঘোড়াগুলো এবার যেন নূতন বল পেল। তিনটি গাড়ীই ডুবে গেল ধুলোবালির আড়ালে। মাঝে মাঝে শোনা যেতে লাগল কশার সাঁইসাঁই আওয়াজ, ঘোড়াগুলোর প্রতি গাড়োয়ানদের অমমধুর বুলি ও রাগ-বিস্ময়-মিশ্রিত চীৎকার।

প্রায় আধঘণ্টা পর সেই গাড়ীটাকে দেখা গেল বহুদূরে বিশাল প্রান্তর আর আকাশের সীমারেখায় একটি গোলাকার বিন্দুর মতো।

রাত্রি আটটার সময় মাইকেলরা দুটি ইসিম ষ্টেশনে এসে দাঁড়াল। এখানে এসে তারা খবর পেল বিদ্রোহের অবস্থা বড় ভয়াবহ। বিদ্রোহীরা এখান থেকে বেশী দূরে নয়। অবশ্য দুদিন আগেই এখানকার সরকারী দপ্তরখানা সরানো হয়েছে টুবলস্ক শহরে। সেনাদল কিংবা কোন সরকারী কর্মচারী পর্যন্ত সেখানে নেই

মাইকেল ঘোড়া বদলে নেবার জন্যে জোর তাগিদ দিল।

বার্লিন গাড়ীটি তখনও অনেক দূরে।

সে সময়ে ষ্টেশনে আর মাত্র তিনটি ঘোড়াই ছিল। ষ্টেশনের কর্মচারীটি তৎক্ষণাৎ গাড়োয়ানকে ঘোড়া বুঝিয়ে দিল।

আলসাইড জুলিভেট ও হ্যারি ব্লাউন্ট এ শহরে কয়েকদিন থাকবে বলে আগেই ঠিক করেছিল। কাজেই তাদের জন্যে আর ঘোড়ার প্রয়োজন ছিল না। তারা গাড়ীটাকে অন্যদিকে সরিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করল।

দশ মিনিটের মধ্যে সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। জানানো হ'ল সব প্রস্তুত।

মাইকেল স্ট্রগফ রিপোর্টার দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল: এবার তা হ'লে ছাড়াছাড়ি হ'ল বন্ধু!

আলসাইড জুলিভেট বলল: কি যে বল! ঘণ্টাখানেকও বিশ্রাম নেবে না?

না, সে ইচ্ছে নেই। পেছনের ঐ গাড়ীখানা পৌঁছোবার আগেই এ জায়গা ছেড়ে যেতে চাই।

তুমি কি এই আশঙ্কা করছ যে ঐ গাড়ীর আরোহীরা ঘোড়া না পেলে তোমার সঙ্গে কোন্দল করবে?

তা না করুক, আমি কোন রকম হাঙ্গামা পোহাতে চাইনে।

জুলিভেট বলল: তা হ'লে ধন্যবাদ, বন্ধু! আমাদের জন্যে যা তুমি করেছ আর তোমার সহযাত্রী হয়ে যে আমোদ পেয়েছি সেজন্য তোমায় সহস্র ধন্যবাদ।

হ্যারি ব্লাউন্ট এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। এবার বলল: হয়ত কয়েক দিন পরেই ওমস্ক শহরে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।

মাইকেল বলল: তা অসম্ভব নয়।

আমি ইচ্ছে করি তোমরা নিরাপদে পৌছোবে। হাঁ আর একটি কথা ভগবান তোমায় যেন কখনো টেঙ্গা গাড়ীর ধাঁধায় না ফেলেন।

এই ব'লেই অলসাইড জুলিভেট হাসিমুখে মাইকেলের করমর্দন করল। হ্যারি ব্লাউন্টও এগিয়ে এল। এমনি সময় পেছনে শোনা গেল গাড়ীর ঘড়ঘড় শব্দ। ঘাড় ফিরিয়েই তারা দেখতে পেল একটি লোক অতিশয় ব্যস্তভাবে গাড়ীর দরজা দড়াম্ ক'রে খুলে নীচে নেমে এল।

লোকটির বয়স প্রায় চল্লিশ। সুদীর্ঘ গড়ন। দৃঢ় বলিষ্ঠ শরীর। প্রশস্ত বক্ষস্থল। মাথার চুল ছোটো। গাল-ভরা দাড়িগোঁফ। পরণে সাধারণ সামরিক বেশ। কোমরের বাঁ পাশে তরবারি ঝুলানো। হাতে ছোট হাতলওয়ালা নকলকে কশা।

লোকটি এসেই আদেশের ভঙ্গিতে বলল : ঘোড়া সাজাও।

পোস্টমাস্টার সবিনয়ে জানাল : গাড়ীতে জোতবার মতো ঘোড়া এখন আর নেই।

ওসব জানিনে। আমার এই মুহূর্তে ঘোড়া চাই!

তা তো সম্ভব নয়!

এই একটু আগেই টেরেনটাস গাড়ীতে ঘোড়া জুড়েছ দেখলাম। কোথায় সেগুলো?

পোস্টমাস্টার মাইকেলকে দেখিয়ে বলল : এই ভদ্রলোক আগেই সে ঘোড়া নিয়ে গিয়েছেন।

রুক্ষস্বরে বলল লোকটি : সেগুলোকে এক্ষুণি খুলে নিয়ে এসো।

পোস্টমাস্টার সহসা এ কথার কোন জবাব দিতে পারল না।

মাইকেল এগিয়ে এল। বলল : সেগুলো আমাকে দেওয়া হয়ে গেছে।

কি হয়েছে তাতে? ঘোড়া আমার চাই। তারপর পোস্টমাস্টারের দিকে ফিরে বলল : দেখো, এখুনি ঘোড়া সাজাতে বল। মুহূর্ত সময়ও আমি নষ্ট করতে পারি না।

রাগে মাইকেলের শরীর জ্বলে যাচ্ছিল। তবু অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে শান্তভাবে বলল : আমারও মুহূর্ত নষ্ট করার উপায় নেই।

ন্যাদিয়া এতক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার অস্বস্তিতে ভ'রে উঠল তার মন। তার ইচ্ছা এই অপ্রীতিকর ঘটনাকে এড়িয়ে চলতে।

ঢের হয়েছে। আর কেন? তারপর পোস্টমাস্টারকে বলল : কি দেখছো তাকিয়ে! এক্ষুণি ঐ ঘোড়াগুলো আমার গাড়ীতে জুড়ে দেবার বন্দোবস্ত কর।

লোকটি এমন অঙ্গভঙ্গি ক'রে কথাগুলো বলে গেল যেন রাজার হুকুম!

পোস্টমাস্টার অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়ল। কার কথা সে শুনবে? অসহায় ভাবে সে একবার মাইকেলের দিকে তাকাল। এই দাম্ভিক লোকটার অন্যায় দাবীতে একমাত্র সে-ই বাধা দিতে পারে।

মাইকেল মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করল। অবশ্য সরকারী হুকুমনামা দেখালেই ঘোড়াগুলো সে অনায়াসে পেতে পারে, কিন্তু পাছে এখানে তার আসল পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ে, এই কারণে সে তা করল না। ঘোড়া না পায়—নাই পাবে, দেরি যদি একটু হয়ে পড়ে—হোক, কিন্তু যে কর্তব্যভার নিয়ে সে চলেছে, তার অবমাননা সে করতে পারে না।

হ্যারি ব্লাউন্ট ও অলসাইড জুলিভেট এবার মাইকেলের হয়ে এগিয়ে এল।

লোকটির এই দুর্ব্যবহারে মাইকেল এখনও কোন রাগ দেখাল না। পরিষ্কৃতভাবে শান্ত-সহজভাবে জানাল—ঘোড়া তার গাড়ীতে আগে বাঁধা হয়ে গেছে, কাজেই এখন সেগুলো তার অধিকারে।

লোকটি বুক ফুলিয়ে এগিয়ে এল। মাইকেলের কাঁধে হাত রেখে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে রুক্ষস্বরে বলল: তাই নাকি। তা হ'লে কি বলতে চাও ঘোড়া আমায় দেবে না?

—না। মাইকেল দৃঢ়কণ্ঠে বলল।

—ভাল কথা। তা হ'লে দেখা যাক, ঘোড়া কে পায়। আমি তোমায় সহজে ছেড়ে দিতে পারি না।

এই বলেই লোকটি খাপ থেকে ঝনাৎ ক'রে তরবারি বের করল। নাদিয়া তাড়াতাড়ি এসে দাঁড়াল মাইকেলের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে হ্যারি ব্লাউন্ট ও অলসাইড জুলিভেট তাদের মাঝে এসে পড়ল।

মাইকেল বুকের ওপর বাহুবদ্ধ করে বলল: আমি লড়তে চাইনে।

রুক্ষকণ্ঠে লোকটি বলল: তুমি লড়বে না?

—না।

লোকটি গর্জে উঠল: তবু লড়বে না?—বলেই কাউকে বাধা দেবার সুযোগ না দিয়ে হাতের কশার প্রচণ্ড আঘাত লাগাল মাইকেলের ঘাড়ে।

অপমানে মাইকেলের মুখের রং মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল। রাগে হাতের শিরা-উপশিরাগুলো অবধি উঠল শিরশির করে। তার ইচ্ছে হ'ল এখুনিই পশুটার টুঁটি চেপে ধরে। কিন্তু অমিত শক্তির বলে সে নিজেকেই সংযত করে রাখল। একবার ভাবল: দ্বন্দ্বযুদ্ধ! না—তাতে কর্তব্যচ্যুতি

ঝগড়াটাই বেশি সম্ভাবনা। তার চেয়ে হ'চার কথা পিছিয়ে যাওয়াই বরং ভাল। কিন্তু এমন অপমান হজম করা কি সহজ!

লোকটি আবার পশুর মতো অঙ্গভঙ্গি করে বলল রুক্ষভাবে, ভীরু কাপুরুষ এবার লড়বে তো?

মাইকেল স্থির—অবিচল। লোকটির মুখের উপর তার স্থির দৃষ্টি। শেষে দৃঢ়ভাবে বলল : না।

—তা হ'লে ঘোড়া আমার —এই ব'লেই লোকটি সরে গেল সেখান থেকে। পোস্টমাস্টার এবার অবজ্ঞার ভঙ্গি দেখিয়ে লোকটির পিছনে পিছনে চলে গেল।

হ্যারি ব্রাউন্ট অলগাইড জুলিভেট পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাউয়ি করতে লাগল। এ কেমন হ'ল। মাইকেল পরিপূর্ণ যুবা। প্রচণ্ড শক্তি তার দেহে। প্রতিপক্ষের অসঙ্গত দাবী, তার উপর আবার কশাঘাতের অপমান কেমন ক'রে সে হজম করল? ব্যাপারটা তাদের কাছে কেমন বাধ বাধ ঠেকল। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতেও লজ্জা বোধ হ'ল তাদের। কাজেই আর দেরি না করে নীরবে নমস্কার জানিয়ে স'রে পড়ল সেখান থেকে।

একটু গিয়েই জুলিভেট বলল হ্যারি ব্রাউন্টকে : যে লোক দুর্দান্ত সাইবেরিয়া ভল্লুককে চকের নিমেষে কাবু করতে পারে, সে লোকের এ কি ব্যবহার। এ কিছুতেই আমি বিশ্বাস করতে পারি নে, যে লোকের এমন পরাক্রম, সে কি অল্প সময়ে এতটা ভীরু হতে পারে? এ আমার কাছে কেমন অবোধ্য।

খানিক পরেই বার্লিন গাড়ী বেরিয়ে গেল স্টেশন ছেড়ে। মাইকেল অপলকদৃষ্টিতে চেয়ে রইল—ঘোড়াগুলোর দিকে।

পাথরের মূর্তির মতো মাইকেল দৃঢ়—অবিচল। বুকের উপর দু' হাত দৃঢ় আবদ্ধ। মুখে নির্লিপ্তভাব। অপমান, লজ্জা, গ্লানি—কিছুই যেন তাকে মোটেই স্পর্শ করতে পারে নি।

নাদিয়া মাইকেলের পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বুঝতে পারল এমন কোন গুরুতর কারণ নিশ্চয় রয়েছে, নতুবা এমন লোক কখনো নির্বিবাদে এমন অযথা অপমান সহ্য করতে পারে না।

একদিন নিজনী-নভগরডের পুলিশ স্টেশনে নাদিয়াকে বিমর্ষ দেখে মাইকেল এগিয়ে গিয়ে হাত ধ'রে আশ্বাস দিয়েছিল। আজ নাদিয়া তেমনি করে এগিয়ে গেল মাইকেলের কাছে। ধীরে ধীরে সে মাইকেলের ডান হাতে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিল—মায়ের দরদ নিয়ে, ভগিনীর ভালবাসা দিয়ে। ঝর্ ঝর্ করে

কয়েক ফোঁটা জল ব'য়ে পড়ল মাইকেলের দু' চোখ বেয়ে। নাদিয়া তা মুছিয়ে দিল গভীর স্নেহে।

তেরো

বুদ্ধিমতী নাদিয়া। সে সাধারণ বুদ্ধিতে এইটুকু বুঝতে পারল যে মাইকেলের এ নীরব ব্যবহারের আড়ালে রয়েছে কোন গুরুতর কর্তব্যের প্রেরণা। কি সে কর্তব্য—সে তা জানে না। কিন্তু সেই কর্তব্যের মাঝেই যে মাইকেল তার মান সম্মান সব বিলিয়ে দিয়েছে, এও সে বুঝতে পারল। ইচ্ছামত কিছু করবার ক্ষমতা তার নেই। তার এত বড় আঘাত, এমন জঘন্য অপমান সে নীরবে মেনে নিয়েছে।

কিন্তু একটি কথাও জিজ্ঞেস করল না সে। এমন নীরবে স্নেহে আদরে সে সান্ত্বনা দিতে লাগল যে বোঝা গেল মাইকেলের মনের সকল কথাই যেন সে জানে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। মাইকেল নীরব—অবিচল। মুখে কোন কথা নেই। পোস্টমাস্টার পরদিন সকালের আগে খোলা দিতে পারবে, এমন ভরসাও দিতে পারল না। সে এই সময়টা নাদিয়ার বিশ্রামের জন্যে আলাদা একটি কামরা ব্যবস্থা করে দিল।

নাদিয়ার ইচ্ছা ছিল মাইকেলের কাছেই সে ব'সে থাকে। কিন্তু সে যখন বুঝতে পারল যে, মাইকেলের তা ইচ্ছা নয়,—কিছুক্ষণ একা থাকতে চায়, তখন সে উঠে দাঁড়াল। বলল: আবার!

মাইকেল ইঙ্গিতে জানাল—এখন কোন কথাই সে শুনতে পারে না।

নাদিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স'রে গেল।

সারারাত্রি এমনিভাবে কেটে গেল। একদণ্ডের জন্যও মাইকেলের চোখে ঘুম আসে নি। সেই পশুপ্রকৃতি লোকটার নির্মম আচরণে তার মন আহত স্থানটির চেয়েও বেশি জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল। শেষে তার মুখ থেকে মাত্র কয়টি কথা শুনা গেল:

দেশ আমার প্রাণ, মহামান্য জারের সম্মান আমার সব—মাইকেল, তুমি বিচলিত হয়ো না...

এত অপমানের পরও একটি কথা মাইকেলের মনে কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিল—কে এই লোক! কেন সে এমন পশুর মতো ব্যবহার করেছে? সে কোথা থেকে এসেছে, যাবেই বা কোথায়? এত ব্যস্ততাই বা কেন?

লোকটির চেহারা এবং অঙ্গভঙ্গি তার মনে এমন একটা ছাপ রেখে গেল যে, কিছুতেই সে তাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারল না।

পরদিন, ২৭শে জুলাই।

ভোর বেলা নূতন ঘোড়া পাওয়া গেল।

আবার সুরু হ'ল পথযাত্রা। সমুখে সীমাহীন প্রান্তর-পথ আর পেছনে প'ড়ে রইল ইসিম নগর। এই নগরের সঙ্গে তারা রেখে এল লজ্জা, সংকোচ আর অপমানের গ্লানি।

প্রত্যেক স্টেশনে মাইকেল খোঁজ নিয়ে জানল যে, আগের গাড়ীটি বরাবর ইরকুটস্কের পথ ধ'রে চলেছে। আরোহীটি কোথাও একমুহূর্ত অনাবশ্যক দেরি করেনি।

ইসিম থেকে এ পর্যন্ত মাইকেল কোন কথা বলেনি। তার মনে প্রচণ্ড ঝড় চলেছে। তা সত্বেও তার সতর্ক লক্ষ্য ছিল নাদিয়ার ওপর—যেন তার কোন কষ্ট না হয়। ইরকুটস্কে তাড়াতাড়ি পৌছোবার জন্তে নাদিয়াও খুব ব্যগ্র। আহ', ঘোড়াগুলোর পিঠে যদি সে পাখা জুড়ে দিতে পারত! সে বুঝতে পেরেছিল মাইকেলের ব্যস্ততা তার চেয়েও বেশি। কোথায় ইরকুটস্ক—আর কতদূরে—

নাদিয়া আবার ভাবল: মাইকেলের বুড়ো মা ওমস্কে রয়েছেন। সেখানে বিদ্রোহীরা হানা দিলে নিশ্চয় ভয়ানক বিপদ হবে। হয়ত এই ভেবেই মাইকেলের মন এতটা বিচলিত। তাই তাকে শান্ত করবার জন্তে বুড়ো মার কথা আরম্ভ করল:

—ব্রাদার!

—কি বোন?

—বিদ্রোহ আরম্ভ হবার পর মায়ের কোন সংবাদ পেলে?

মায়ের কথায় মাইকেলের মন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বলল: না বোন, পাইনি। কিছুদিন আগে মায়ের চিঠি পেয়েছিলাম, তাতে ভাল খবরই ছিল। তবে আমার মায়ের দুর্জয় সাহস। দুর্ধর্ষ সাইবেরিয়ান মেয়ে তিনি। বয়স হয়েছে ঢের, কিন্তু মনের জোর মোটেই কমেনি।

—তুমি মায়ের সঙ্গে কখন্ দেখা করবে?

—মায়ের সঙ্গে? হাঁ, ফেরবার সময়।

—কেন? আমরা তো ওমস্ক হয়েই যাব। অন্তত [illegible] [illegible] তাঁর কাছে যাবে না?

—না, এখন আমি যাবও না—দেখাও করব না।

—মায়ের সঙ্গে দেখা করবে না?

মাইকেলের বুক কেঁপে উঠল। ভাঙা গলায় বলল: না বোন—না…

—তুমি কেবল না-না করছ কেন? বুড়ো মা তোমার পথ চেয়ে আছেন. অথচ তুমি কেন দেখা করবে না, ব্রাদার!

—কি কারণে দেখা করতে চাইনে, তাই জিজ্ঞেস করছ তুমি!—বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল মাইকেল।

এ কথায় নাদিয়া লজ্জিত হল।

মাইকেল আবার জোর গলায় বলল: নাদিয়া, দেখা করব না এই কারণে—যে কারণে সেই পশুটার অসহ্য আঘাত-অপমানও আমাকে নীরবে সইতে হয়েছে…

নাদিয়ার মন বিচলিত হ'ল। তাড়াতাড়ি বলল: আর বলো না, ব্রাদার। —আমি আর কিছুই শুনতে চাইনে। আমি যতটুকু জানি—অথবা জানিনে, অন্ততঃ অনুভব করতে পেরেছি, কোন এক কর্তব্যের প্রেরণায় তুমি চলেছ। সে কর্তব্য তোমার কাছে অতি পবিত্র—মাতাপুত্রের মিলনের চেয়েও পবিত্র।

নাদিয়া আর কোন কথা বলল না। বুঝতে পারল—মাইকেল এক অদ্ভুত অবস্থার ভেতর দিয়ে চলেছে। কাজেই আর কোনও কথা না ব'লে সে মনে মনে মাইকেলকে শ্রদ্ধা জানাল

পরদিন, ২৫শে জুলাই। মাইকেল ও নাদিয়া ভোরবেলায় এসে পৌঁছোল। ইরতিশ নদীর তীরে। ওমস্ক শহর এখান থেকে মাত্র কুড়ি ভারস্ট দূরে।

ইরতিশ উত্তর-এশিয়ার একটি বড় নদী। উৎপত্তিস্থান আলটাই পর্বত। দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে উত্তর-পশ্চিম-মুখে সাত হাজার ভারস্ট ঘুরে ফিরে ওবী নদীতে গিয়ে পড়েছে।

বৎসরের এই সময়ে সাইবেরিয়ার বরফ-গলা জল নদনদীকে পুষ্ট করে। জলের বেগে নদী ফুলে ওঠে। ইরতিশ নদীও প্রবল স্রোতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। ভাল সাঁতারুর পক্ষেও এ সময়ে নদী পার হওয়া সম্ভব ছিল না। এমন কি, ফেরি নৌকোতে পার হওয়াও বিপজ্জনক।

কিন্তু মাইকেল ও নাদিয়া বিন্দুমাত্র বিচলিত হ'ল না। কি ভাবে

যা ঘটবে, এ দুর্ভাবনায় সময় নষ্ট না ক'রে তারা নির্ভয়ে নদী পার হবার জন্যে প্রস্তুত হ'ল।

নদীর এপার ও ওপারের দূরত্ব প্রায় পাঁচ-ছয় ভারস্ট। অবশ্য এত দূর পথ ফেরি নৌকোয় পার হওয়া সহজ না হ'লেও অসম্ভব নয়। তবে একটা গাড়ী, তিন তিনটি ঘোড়া এবং মাঝিমাল্লাদের নিয়ে এক সঙ্গে নির্বিঘ্নে পার হওয়া বিপজ্জনক। মাঝিরা প্রথমে রাজি হ'ল না। কিন্তু যখন দ্বিগুণ ভাড়ার লোভ দেখান হ'ল, তখন তারা আর কোন ওজর আপত্তি করল না। স্রোতের বিরুদ্ধে তাদের দক্ষতা ও উদ্যম সম্পূর্ণ অকেজো, তা জেনেও তারা স্রোতের বশে নৌকো ভাসাল ভবিতব্যের উপর নির্ভর ক'রে।

ফেরি নৌকো ঘণ্টায় দুই ভারস্ট ক'রে এগোতে লাগল। নদীর মাঝামাঝি যেতেই মাইকেল হঠাৎ দাঁড়িয়ে কি লক্ষ্য করতে লাগল নিবিষ্টভাবে। দেখা গেল, অনেক দূরে কয়েকটি ছিপ তাদের দিকে দ্রুতবেগে ছুটে আসছে স্রোতের টানে। প্রত্যেকটি ছিপেই অনেকগুলো দাঁড় একসঙ্গে ওঠা নামা করছে।

মাইকেলের চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া ফুটে উঠল।

নাদিয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করল: কি ব্যাপার?

মাইকেল জবাব দেবার আগেই একজন মাল্লা মহাভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। তাতার—তাতার

দেখা গেল, প্রত্যেকটি ছিপই বর্শাধারী তাতার সেনাসামন্তে বোঝাই, এবং তারা এত তাড়াতাড়ি ছুটে আসছে যে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাদের নৌকোর ওপর এসে পড়বে।

ভীত মাঝিরা হতাশ হয়ে অসহায়ের মতো চীৎকার করে উঠল। লগি ও দাঁড় প'ড়ে গেল হাত থেকে।

মাইকেল চেঁচিয়ে বলল: ভয় নেই—ভয় নেই। জোরসে চালাও—চালাও। সাহস হারিও না, পঞ্চাশ রুবল—আরও পঞ্চাশ রুবল তোমাদের দেব, শিগ্‌গির ওপারে চল।

মাঝিরা উৎসাহিত হয়ে আবার লগি দাঁড় আঁকড়ে ধরল। প্রাণপণে চালাল নৌকো। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। তাতারদের ছিপগুলো তখন প্রায় কাছে এসে পড়েছে।

—ভয় ক'রো না নাদিয়া—ভীত হয়ো না।—মাইকেল বলল। কি করতে হবে জানি না—তবে প্রস্তুত হয়ে থেকো। যদি জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়—পারবে তো!

—হাঁ পারব—যখনই তুমি বলবে।

—আমার ওপর বিশ্বাস রেখো—পারবে তো?

—হাঁ, সে বিশ্বাস আমার আছে, ব্রাদার!

এবার তাতারদের ছিপগুলো এসে পড়ল—আর মাত্র একশত ফিট। তারা তখন তড়িৎগতিতে ওদের আক্রমণ করতে চলেছে।

ফেরি নৌকো তখনও তীরের দিকে এগোতে লাগল। মাঝিরা চেষ্টা চালাল দ্বিগুণ শক্তিতে—দ্বিগুণ বেগে। মাইকেল নিজেও একটি লগি নিয়ে তাদের সাহায্য করতে লাগল। কোনরকমে তীরে যেতে পারলেই অনেকটা নিরাপদ।

কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হল। তাতারদের যে ছিপটি সামনে ছিল, তা থেকে সেনাদের চীৎকার উঠল: সাব্রিন না কিচো…

তাতারদের এই সামরিক বুলি মাইকেলের জানা ছিল। 'সাব্রিন না-কিচো'—মানে, লম্বালম্বি শুয়ে পড়—

কিন্তু মাইকেল বা ফেরিনৌকোর মাঝিরা কেউ এই চিৎকারে কান দিল না।

শোঁ শোঁ করে কয়টি গুলি তীরবেগে ছুটে এল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া-দুটি সাংঘাতিক আহত হয়ে প'ড়ে গেল জলে। ঠিক সেই মুহূর্তেই তাতারদের একটা ছিপ এসে ফেরিনৌকোর গায়ে ভয়ানক ধাক্কা দিল!

মাইকেল চেঁচিয়ে উঠল: নাদিয়া—নাদিয়া, এসো—ঝাঁপিয়ে পড়।

নাদিয়া জলে ঝাঁপ দেবার উপক্রম করল। ঠিক এই সময়ে বল্লমের আঘাত এসে লাগল মাইকেলের ওপর। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে সে জলে প'ড়ে গেল। প্রবল স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল দূরে। একবার তার হাত দুখানা মাত্র দেখা গেল। তারপরই উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে তলিয়ে গেল সে।

নাদিয়া অসহায়ের মতো চিৎকার করে উঠল: ব্রাদার—ব্রাদার। এবং যেমনি ঝাঁপিয়ে পড়বে—এমন সময় কয়েকটি তাতার সেনা তাকে সবলে একটি ছিপে তুলে নিল।

শত্রুর গুলিতে মাঝিরা নিহত হল। চালকহীন ফেরিনৌকো স্রোতের বেগে শুকনো কুটোর মতো ভেসে চলল হু হু ক'রে।

চৌদ্দ

ওমস্ক শহর।

পশ্চিম সাইবেরিয়ার সদর রাজধানী। এসিয়াটিক রাশিয়ার শাসনকার্য চালাবার জন্যে একজন গভর্ণর জেনারেল এখানে বাস করেন।

বিদ্রোহী তাতাররা হঠাৎ আক্রমণ ক'রে এ শহর আগেই দখল ক'রে নিয়েছিল। সরকারী সেনাদল মহাবিক্রমে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু দুর্ধর্ষ তাতাররা তাদের ওপর এসে পড়ে সমুদ্র তরঙ্গের মতো। এ-বেগ তারা সামলাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত তারা বাধ্য হয়ে অর্ধেক শহর শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে আরও উত্তরে শহরের প্রান্তদেশে এসে আশ্রয় নেয়।

গভর্ণর জেনারেল প্রথমেই সৈন্যসামন্ত নিয়ে এই আশ্রয় স্থানটিকে সুরক্ষিত ক'রে নিলেন। চার দিকে পরিখা কাটান হ'ল। পরিখার ধার ঘেঁসে উঠল উঁচু প্রাচীর। প্রত্যেকটি বাড়ীঘর দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো ক'রে বাঁধা হ'ল। আত্মরক্ষার সুন্দর ব্যবস্থা হ'ল বটে কিন্তু বাইরে থেকে সাহায্য পাবার কোন আশাই তারা করতে পারল না। এদিকে তাতারবাহিনী দিন দিন শক্তিশালী হয়ে উঠল। ইরতিশ নদীর পথে রোজ আসতে লাগল নূতন সেনাদল। দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক কর্ণেল আইভান ওগারেফ এই সেনাদলের নায়ক।

আইভান ওগারেফ সুশিক্ষিত সেনাধ্যক্ষ। বর্বর-প্রকৃতি তাতারদের চেয়েও তার প্রকৃতি আরও ভয়ানক। তার দেহে দুর্দম মোঙ্গলীয় রক্তের সংমিশ্রণ ছিল। ছল কৌশল তার বংশের ধারা। সে হিসেবে গোপন ষড়যন্ত্রে সে ছিল পাকা এবং যেখানে-সেখানে ষড়যন্ত্রের জাল ছড়াবার কৌশলও ছিল তার অদ্ভুত। তা ছাড়া সে ক্রুর স্বভাব। এক সময়ে সে ঘাতকের কাজও করেছিল।

যে আঘাত মাইকেলের ওপর এসে পড়েছিল তা নিদারুণ হ'লেও মারাত্মক হয়নি। শত্রুর চোখ এড়িয়ে সে ডুব সাঁতার দিয়ে দিয়ে প্রচণ্ড স্রোত আর ঢেউএর বাধা কাটিয়ে নদীর অপর পারে এক জঙ্গলের ধারে গিয়ে পৌঁছোয়। এবং সেখানে সে অতিরিক্ত ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়ে।

যখন জ্ঞান হয়, তখন দেখে—সে এক মাঝির ঘরে শুয়ে রয়েছে। এই সাহসী সাইবেরিয়ান লোকটিই তাকে নদীর ধার থেকে কুড়িয়ে এনে সেবা যত্ন করে বাঁচিয়ে তোলে। কতক্ষণ সে এভাবে প'ড়ে আছে? এ অনুমান সে করতে পারল না। চোখ মেলে চাইতেই সে দেখল, একটি লোক একাগ্রদৃষ্টিতে তার

মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। মাইকেল লোকটিকে কি বলতে গেল। কিন্তু লোকটি ইঙ্গিতে তাকে বাধা দিয়ে বলল: কথা বলো না বন্ধু, এখনও তুমি খুব দুর্বল। সবই জানতে পাবে—ব্যস্ত হয়ো না।

মাইকেল সে কথা শুনতে চাইল না। প্রথমে সে বুকে হাত দিয়ে অনুভব করল—সরকারী চিঠিখানা ঠিক আছে কি না এবং একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করল: আমার সঙ্গে যে মেয়েটি ছিল সে কোথায়?

লোকটি মাইকেলের উদ্বিগ্নতা লক্ষ্য করল। বলল: তাতাররা মেয়েটিকে হত্যা করেনি, নৌকোয় তুলে নিয়েছে দেখেছি। হয়ত অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে সেও এখন বন্দিনী।

মাইকেল কি ভাবল। পরে জিজ্ঞেস করল: আমি এখন কোথায়?

লোকটি বলল: ইরতিশ নদীর দক্ষিণ তীরে—ওমস্ক শহর থেকে পাঁচ ভার্স্ট দূরে।

—আমার গায়ে কি গুলি লেগেছে? আঘাত গুরুতর নাকি?

লোকটি বলল: না, তোমার মাথায় কেবল বল্লমের ঘা লেগেছে। তবে গুরুতর নয়। দুদিন বিশ্রাম নাও—ভাল হয়ে যাবে। তুমি জলে প'ড়ে গেলে তাতাররা আর তোমার খোঁজ পায় নি। তোমার টাকার তোড়াটা আমার কাছে রয়েছে।

মাইকেল বলল: ধন্যবাদ। আচ্ছা, আমায় একটি ঘোড়া দিতে পার বন্ধু। আমি কিনে নেবো।

লোকটি বলল: গাড়ী ঘোড়া কোথাও আর নেই বন্ধু! তাতাররা যেখানে যেখানে গেছে সেখানে কিছুই অবশিষ্ট রেখে যায়নি।

মাইকেল বিব্রত হয়ে পড়ল। আমি তাহ'লে এখনই ওমস্কে যাব। সেখানেও কি ঘোড়া পাব না?

—তোমার আরও বিশ্রাম প্রয়োজন। কি ক'রে এখন ওমস্কে যাবে?

—না বন্ধু, এক মুহূর্তও আমি বিলম্ব করতে পারি না।

লোকটি বুঝতে পারল, মাইকেলকে নিরস্ত করা যাবে না। হয়ত কোন জরুরী কাজে সে চলেছে। শেষে বলল: তাহ'লে চল, আমি তোমার সঙ্গে যাব। ওখানে ঘোড়া পাবে হয়ত।

মাইকেল কৃতজ্ঞতা জানাল: বন্ধু, তুমি আমার জন্যে যা করেছ ভগবান তার পুরস্কার দিবেন।

—পুরস্কার! সংসারে মূর্খলোকরাই পুরস্কারের লোভ করে।

মাইকেল ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দু'পা চলতেই তার মাথা এমনভাবে টলতে লাগল যে, লোকটি তাকে না ধরলে সে মাটিতেই পড়ে যেত। কিন্তু খোলা বাতাসে ব'সে সে খানিক পরেই সুস্থ বোধ করল। বলল: এবার চল বন্ধু!

লোকটি মাইকেলকে নিয়ে এল ওমস্ক শহরে। পোষ্টিং হাউসের দিকে যেতেই একটা সরুপথে মাইকেল হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল এবং তাড়াতাড়ি পিছিয়ে ভাঙা দেয়াল ডিঙিয়ে আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

—কি ব্যাপার!—লোকটি মাইকেলের চঞ্চলগতিতে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

মাইকেল তৎক্ষণাৎ মুখে আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করল—চুপ।

ঠিক এই মুহূর্তে ঘোড়ার খটাখট্ খটাখট্ শব্দ শুনা গেল। খানিক আগে তারা যে পথ পেরিয়ে এসেছে, সে পথেই দেখা গেল একদল সৈন্য।

কুড়ি জন অশ্বারোহী নিয়ে সে দল। সাধারণ পোশাক পরিহিত একজন সৈনিক তাদের নায়ক। লোকটি সতর্কদৃষ্টিতে এদিক ওদিক লক্ষ্য করছিল। কিন্তু আড়ালে থাকাতে সে তাদের দেখতে পেল না।

দলটি স'রে যেতেই মাইকেল জিজ্ঞেস করল: ঐ অফিসারটি কে?

লোকটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল: আইভান ওগারেফ।

—এই আইভান ওগারেফ!—উচ্চস্বর বেরিয়ে এল মাইকেলের কণ্ঠ চিরে।

মাইকেল এবার চিনতে পারল লোকটিকে। ইসিম স্টেশনে এই লোকটিই তাকে অপমান করেছিল। নিজনী নভগরডে এই লোকটিকেই বোহেমিয়ানের বেশে দেখেছিল। এই লোকটিই জিপসীর বেশে দলে মিশে নিজনী নভগরড থেকে পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে এসে বিদ্রোহী দলের সঙ্গে মিলেছে। 'ককেশাস' জাহাজে তাকেই সে দেখেছিল। সম্ভবত এই লোকটিই আলোচনা করেছিল যে, জারের বার্তা নিয়ে একটি লোক ইরকুটস্ক রওয়ানা হয়েছে, সঙ্গের স্ত্রীলোকটি তারই বেজনভোগী চর। লোকটি কাসান স্টেশনে নেমে অন্য পথে উরাল পর্বত পেরিয়ে ইসিম হয়ে ওমস্কে পৌঁছেছে।

তিনদিন হ'ল আইভান ওগারেফ এই শহরে হানা দিয়েছে। যদি ইসিমে কোন দুর্ঘটনা না ঘটত, এবং ইরতিশ নদী পার হবার সময় যে দুর্ঘটনায় তার তিনটি দিন বৃথা নষ্ট হ'ল, তা যদি না হ'ত, তাহলে মাইকেল আইভান ওগারেফকে অনেক পেছনে রেখে অনেক আগেই ইরকুটস্কে পৌঁছাতে পারত।

পোষ্টিং হাউসে এসে সঙ্গের লোকটি বিদায় নিল। শহর তখন তাতারদের

অধিকারে। কিন্তু ভাঙা দেওয়াল পেরিয়ে রাত্রিকালে শহর ছেড়ে যাওয়া বিশেষ কষ্টকর ছিল না। কিন্তু গাড়ী বা ঘোড়া পাওয়া দুর্ঘট হয়ে পড়ছিল। গাড়ীর আর কি প্রয়োজন? তখন তো সে একা। একটা ঘোড়া পেলেই হয়।

ভাগ্যক্রমে খুব চড়া দাম দিয়ে ঘোড়া পাওয়া গেল। অত্যন্ত তেজী ঘোড়া। মাইকেলও ভাল সওয়ার।

তখন বিকাল পাঁচটা।

মাইকেল রাত্রির অপেক্ষায় রইল। শহরের প্রকাশ্য রাস্তায় বেড়াবার ইচ্ছে তার ছিল না। তাই পোষ্টি হাউসেই সে রাত্রির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। আহারও সে এইখানেই সেরে নিল।

সাধারণের বসবার জন্যে পোষ্টি হাউসের সংলগ্ন একটি খোলা ঘর ছিল। সে ঘরে তখন ভয়ানক ভিড়। এই যুদ্ধ-সঙ্কটে নানারকম সংবাদ পাবার স্থান ছিল এই স্থানটি। উধিয়া অধিবাসীরাও আত্মীয়-পরিজনের খবরের আশায় এখানে এসে সমবেত হয়েছিল। যুদ্ধ ব্যাপারে নানারকম কথাও চলছিল তখন।

মাইকেল খুব মনোযোগ দিয়ে সে-সব কথা শুনে গেল, কিন্তু নিজে কোন কথায় যোগ দিল না। এমন সময়ে হঠাৎ এক আকুল কান্না শুনা গেল। সে কান্নায় কেঁপে উঠল মাইকেলের বুক।

—বাবা—বাবা আমার।

মাইকেল মাথা তুলেই দেখে, তার বৃদ্ধা মা তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। শরীর কাঁপছে থর্‌থর্ করে। মুখে মধুর হাসি আর দু-চোখে জল! ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরবার জন্য সে ব্যগ্রভাবে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

মাইকেল উঠে দাঁড়াল। এবং উপক্রম করল মায়ের বুকে ধরা দিতে।

সহসা কর্তব্যের প্রেরণা সাড়া দিল তার মনে। এই অসতর্ক মিলনে হয়ত ছেলে ও মায়ের জীবনে ঘনিয়ে আসবে বিপদের মহাঝড়। এই ভেবে মাইকেল দু'পা পিছিয়ে গেল। এবং সে এমনভাবে নিজেকে সংযত করল যে তার মুখের ভাবেরও একটু পরিবর্তন দেখা গেল না।

পোষ্টি হাউসে যারা ছিল, তাদের মাঝে দু-একজন বিপক্ষের গুপ্তচরও সম্ভবত ছিল। এবং এও হয়ত তাদের জানা ছিল যে বৃদ্ধা মার্ফার ছেলে রাশিয়ার জারের অধীনে দূতের কাজ করে।

বৃদ্ধা মার্ফা চমকে উঠল ছেলের এই ব্যবহারে। আকুল হয়ে ডাকল—বাবা—বাবা আমার…

মাইকেল একটুও বিচলিত হ'ল না। বলল: কে তুমি, মা? আমি তো তোমার ছেলে নই···

—মাইকেল···আরও আকুল হয়ে মা ডাকলেন।

মাইকেলের স্বাভাবিক স্বর একটু বদলে গেল। আমতা আমতা ক'রে বলল: তুমি কে, মা?

—কে আমি! তুমি কি বলছ বাবা? মাকে চিনতে পারনি বুঝি?

মাইকেল জবাব দিল শান্তভাবে: তুমি ভুল করেছ মা। আমার চেহারা হয়তো তোমার ছেলের চেহারার মতো। তাই···

বৃদ্ধা আরও কাছে এগিয়ে এল। ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে বলল: তুমি কি মার্থা স্ট্রগফের ছেলে নও, বাবা?

মাইকেল স্ট্রগফ আর একটু হ'লেই মায়ের কাছে ধরা প'ড়ে যেত! যদি সে একটুও বিচলিত হ'ত, তাহ'লেই তার সংযম, কর্তব্য—সবই ভেসে যেত স্নেহের প্রবল স্রোতে। সে চোখ দুটি বুজে রইল—পাছে মায়ের মুখের উৎকণ্ঠার ভাব দেখে চঞ্চল হ'য়ে পড়ে। হাত দুটো সে পিছন দিকে সরিয়ে নিল, পাছে মা তার হাত চেপে ধরেন। তারপর শক্ত হয়ে বলল:

—তুমি কাকে চাও, কিছুই বুঝতে পারছিনে, মা।

—মাইকেল!—বৃদ্ধা এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

—আমার নাম তো মাইকেল নয়, মা! আমার নাম নিকোলাস কোর্পানফ। আমি একজন সওদাগর।

বৃদ্ধা আর একবার ভাল ক'রে তাকাল তার মুখের দিকে। শেষে কাঁপতে কাঁপতে বলল: ওহো, তাইতো বাবা—আমার বড্ড ভুল হয়েছে। আমার মাইকেলও ঠিক তোমার মতোই দেখতে। চোখেও ভাল দেখিনে···

—তাই হবে মা।

এই বলেই মাইকেল সেখান ছেড়ে চ'লে গেল। তার কানে যেন বাজতে লাগল মায়ের সেই আকুল স্নেহভরা ডাক: বাবা—বাবা আমার···

দশ মিনিটও হ'ল না। একজন তাতার সর্দার পোস্টিং হাউসে এসে হাজির হ'ল।

মাইকেল স্ট্রগফ সেখানে নেই।

তাতার সর্দার তখন ডাকল: মার্থা স্ট্রগফ!

বৃদ্ধা উঠে দাঁড়াল: এই যে আমি। কে ডাকে আমায়?

ধীর শান্ত তাঁর জবাব। এমন মধুর সুখের ভাব। একটু আগেও যারা তার আকুল ক্রন্দন শুনেছে, তাদের কাছে এ যেন আর সে মানুষ নয়।

—এদিকে এসো তুমি বন্দী—অফিসারটি বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মার্থা স্ট্রপককে নিয়ে যাওয়া হ'ল বিদ্রোহীদের ঘাঁটিতে। মার্থা দেখল: সম্মুখে দাঁড়িয়ে বিদ্রোহী নেতা আইভান ওগারেফ।

আইভান ওগারেফ রুক্ষস্বরে জিজ্ঞেস করল তাকে: তোমার কি নাম?

—মার্থা স্ট্রপক।

—তোমার ছেলে আছে?

—হাঁ আছে।

—সে জারের অধীনে দূতের কাজ করে?

—হাঁ।

—সে এখন কোথায়?

—মস্কো শহরে।

—তার কোন খবর পেয়েছ?

—না, পাইনি।

—কতদিন পাওনি?

—প্রায় ছ'মাস।

—তা হ'লে ঐ ছেলেটি কে, যাকে তুমি খানিক আগে পোস্টিং হাউসে বাবা—বাবা—ব'লে ডেকেছিলে।

মার্থা স্ট্রপক একটু সংযতভাবে বলল: একটি সাইবেরিয়ান যুবক। তাকেই আমার ছেলে ব'লে ভুল করেছিলাম। এমন ভুল আরও কয়বার হয়েছে আমার। আমি যেন সবখানেই আমার ছেলেকে দেখতে পাই।

আইভান ওগারেফ ধমক দিয়ে বলল: চালাকি রাখ। জান, সত্যি কথা না বললে তোমার উপর আমি কি পীড়ন করতে পারি?

—আমি তো সত্যি কথাই বলেছি। তোমার পীড়ন কোন মতেই আমাকে মিথ্যে বলাতে পারবে না।—মার্থা দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল।

মুখের ওপর এই বৃদ্ধার অদ্ভুত সাহস ও স্পষ্টোক্তি শুনে আইভান ওগারেফ স্তম্ভিত হয়ে গেল। একবার সে বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টি ফেলে তাকাল তার দিকে। সে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারল—সেই সাইবেরিয়ান যুবকই তার ছেলে। এখন যদি সেই ছেলে প্রথমে মাকে চিনেও অস্বীকার করে এবং মাও যদি ছেলেকে

অস্বীকার করে, তাহ'লে এই তাড়ার যে এর ভেতর নিশ্চয়ই কোন গুরুতর কারণ রয়েছে।

আইভান ওগারেফের মনে সন্দেহ জাগল যে নিকোলাস কোর্পানফ জারের সংবাদবাহক মাইকেল স্ট্রগফ ছাড়া আর কেউ নয়। অন্ত নামে সে নিজেকে লুকিয়ে চলেছে। হয়ত এমন কোন সংবাদ নিয়ে চলেছে— যা তার পক্ষে জানা একান্ত প্রয়োজন। সে তক্ষুণি যুবকটিকে গ্রেপ্তার করবার আদেশ দিল।

তারপর মার্ফা স্ট্রগফের দিকে কঠোর দৃষ্টি ফেলে বলল: এই বুড়ীকে এখনই গারদে নিয়ে যাও।

একটি তাতার সেনা পশুর মতো খপ্ ক'রে তার হাত ধ'রে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল সেখান থেকে।

বৃদ্ধা রেগে চেঁচিয়ে উঠল: আইভান ওগারেফ!

আইভান ওগারেফ দাঁত খিঁচিয়ে বলল: কেমন ক'রে কথা বলাতে হয় আমি জানি। সময় আসুক, কথা বলিয়ে ছাড়ব,—হতচ্ছাড়া ডাইনী বুড়ী কোথাকার!

পনেরো

আইভান ওগারেফের আদেশ শহরের সব-যায়গায় প্রচারিত হল। বিভিন্ন কম্যাণ্ডান্টের নিকট পাঠানো হ'ল মাইকেল স্ট্রগফের চেহারার হুবহু বিবরণ। যাতে লোকটি কোনক্রমেই শহরের বাইরে যেতে না পারে—সেই রকম কড়াকড়িও সুরু হল। কিন্তু মাইকেল এতক্ষণে শহরের শেষ-সীমা ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে গেছে। তার ঘোড়া অবিরাম ছুটেছে প্রান্তর-পথ ধ'রে। পেছনে কাউকেই অনুসরণ করতে দেখা গেল না। মাইকেল ভাবল: তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন।

সেদিন ২৯শে জুলাই—রাত আটটা।

মস্কো ও ইরকুটস্ক নগরের ঠিক মাঝপথে এই ওমস্ক শহর। তাতারদের আগে ইরকুটস্কে যেতে হ'লে তাকে দশদিনের মধ্যে সেখানে পৌঁছুতে হবে। ঘোড়াটিকে বিশ্রাম দেবার জন্তে একটা রাস্তার মোড়ে এসে মাইকেল কিছুক্ষণের জন্তে থামল। তার সন্দেহ—বিদ্রোহী-পক্ষের কেউ তার পিছু নিতে পারে। তাই অনুসরণকারী কোন ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যায় কি না তাই

পরীক্ষা করবার জন্যে সে মাটিতে কান পেতে রইল কিছুকাল। কিন্তু সন্দেহ-জনক সাড়াশব্দ না পেয়ে নিশ্চিন্তমনে আবার ঘোড়া ছুটাল।

৩১শে জুলাই ভোর ন'টার সময় মাইকেল চৌরোমাক স্টেশন পেরিয়ে অলামর অঞ্চল 'বারাবা'র মধ্য দিয়ে ঘোড়া চালাতে লাগল।

বারাবা প্রদেশ দিয়ে ইরকুটস্ক শহরে যাবার সোজা পথ। সে-পথ চ'লে গেছে অনেক খাল-বিল, পুকুর এবং খানা-ডোবা প্রভৃতি জলাভূমির আনাচে-কানাচে ঘুরে ফিরে। সূর্যের কঠোর তাপে সে-সব জলা জায়গা থেকে বিষাক্ত গ্যাস উঠতে থাকে অবিরত, এবং রাস্তার বাতাসে মিশে পথিকের পথ চলায় দারুণ ক্লান্তির ভার আনে—অবসন্নতায় দেহ আবিষ্ট ক'রে তোলে। ফলে প্রায়ই কোন-না কোন বিপদ ঘটে এই পথে।

মাইকেল স্ট্রগফ ক্রমাগত চলতে লাগল খাল-বিল, পুকুর, খানা-ডোবা পেরিয়ে। কতবার ঘোড়ার পা আটকে গেল—কাদা-মাটিতে। কিন্তু সেদিকে সে বড় লক্ষ্য করল না। তার ওপর বিষাক্ত সেট্‌সি মাছির ভয়ানক উপদ্রব। ঘোড়াটি এক-এক সময় পাগলের মতো লাফাতে লাগল। কিন্তু মাইকেলের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। বোধ-শক্তি সে হারিয়ে ফেলেছে যেন। তার একমাত্র লক্ষ্য—গন্তব্যস্থল। যেমন ক'রেই হোক তাকে সময় মত পৌঁছুতেই হবে। ঝড়ের বেগে সে চলল, এবং চলার মুখে সে কেবল দেখতে পেল—সামনের গ্রাম, নগর, পল্লী কেমন দ্রুত পিছিয়ে পড়ছে।

এইভাবে সকল রকম ক্লান্তি অবসাদ ভুলে মাইকেল চৌরোমাক থেকে ত্রিশ ভার্স্ট পথ পেরিয়ে এলামস্ক নামক স্থানে পৌঁছাল।

সেদিন ৩১শে জুলাই—বিকাল ৬টা।

ঘোড়া যখন আর চলতে পারল না, তখন মাইকেলের জ্ঞান ফিরে এল। ভাবল: এতটা করতে গেলে তো হবে না। পথ-চলার একমাত্র বাহন এই ঘোড়া। তাকে যেমন ক'রেই হোক বাঁচিয়ে রাখতে হবে। প্রাণীটাকে অন্তত একরাত বিশ্রাম দেওয়া দরকার।

সে রাত্রিটা বিশ্রাম করে পরদিন ভোরবেলায় মাইকেল আবার পথে বেরিয়ে পড়ল। পথে এসে শুনতে পেল—তাতাররা এই প্রদেশ আক্রমণ করেছে। বিদ্রোহীরা এখন দশ মাইল পেছনে বারাবার পথে।

পরদিন, ১লা আগষ্ট।

মাইকেল অবিশ্রাম ঘোড়া চালিয়ে স্পেসকো শহর পেরিয়ে বেলা ২টায় এসে পকরোসকো নামক স্থানে পৌঁছুল।

ঘোড়াটি তখন অতিরিক্ত ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েছে। সে আর পা তুলতে পারে না। মাইকেল বাধ্য হ'ল বিশ্রাম করতে। বাকী দিন এবং সারাটা রাত সেখানে কাটিয়ে আবার রওনা হ'ল ভোরবেলায়। সেখান থেকে পঁচাত্তর ভার্সট পথ দূরে কামস্ক নামক স্থানে বেলা বারোটার সময়ে এসে পৌঁছুল।

কামস্ক ক্ষুদ্র শহর। দেখতে একটি ছোট্ট দ্বীপের মতো। এখানকার জলবায়ু চমৎকার। এত বড় অস্বাস্থ্যকর বারাবা প্রদেশের ঠিক মাঝামাঝি স্থানে এইটি স্বাস্থ্যনিবাস। তাতার সেনার আক্রমণ-ভীতি এখনও শহরটিকে জনশূন্য ক'রে দেয়নি। এখানকার অধিবাসীদের ধারণা যে তারা এখানে নিরাপদেই থাকতে পারবে। যদি একান্তই বারাবা প্রদেশ আক্রান্ত হয়, তা হ'লে পালাবারও যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।

মাইকেল সে রাতটা কাটাল শহরের প্রবেশ-পথে এক সরাইখানায়। লোকের গতিবিধি সে স্থানটায় অপেক্ষাকৃত কম ছিল, কাজেই কারও সন্দেহের চোখে পড়ার কোন আশঙ্কাই ছিল না।

মাইকেল নিজেও খুব ক্লান্ত হয়েছিল। ঘোড়াটিকে ঘাস-জল দিয়ে সে এলিয়ে পড়ল বিছানায়। কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই তার ঘুম ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কত কথা মনে পড়ল। কী গুরু কর্তব্যভার নিয়ে সে চলেছে পথে পথে। রাস্তায় কত কি সে লক্ষ্য করেছে! কত বিপদ-আপদ কাটাতে হয়েছে। তাতারদের এই বিদ্রোহ কি ভয়ঙ্কর! আইভান ওগারেফের বিশ্বাসঘাতকতা তাকে পথ-চলার কেমন দুর্গম করে তুলেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার হাত পড়ল রাজকীয় মোহরাঙ্কিত খামের উপর। সে ভাবল: এই চিঠিতেই হয়ত এই দুর্দৈব দমনের সন্ধান রয়েছে। হয়ত এই চিঠির ওপর নির্ভর করছে আক্রান্ত দেশগুলোর নিরাপত্তা। তার ইচ্ছা হল একমুহূর্তে বিশাল প্রান্তর পেরিয়ে পথের দূরত্ব কমিয়ে দেয়। ইরকুটস্ক আর কতদূর? ঐ কাকগুলো কেমন ক'রে এত দ্রুত চলে? ঈগল পাখীরা কেমন ক'রে বাধা-বিঘ্ন না মেনে উড়ে চলে? ঝড়ের মতো সে বয়ে যেতে চায় ক্ষিপ্রগতিতে। এই মুহূর্তে গিয়ে পৌঁছোয় ইরকুটস্কে—গ্র্যাণ্ড ডিউকের সম্মুখে। গিয়ে বলে: সদাশয় ডিউক রাশিয়ার রাজদূত হাজির। এই নিন মহামান্য জারের লিপি।

পরদিন ভোর ছ'টায় মাইকেল আবার যাত্রা করল। এখান থেকে আশি ভার্সট দূরে উবিনস্ক গ্রামে আজই পৌঁছাবে—এই ছিল তার অভিপ্রায়। কিন্তু বিশ ভার্সট পথ গিয়েই সামনে পড়ল জলাপথ। মাইকেল সাবধানে

ঘোড়া চালাল। হাঁটু-জল ভেঙে এগোতে লাগল ধীরে ধীরে। এই রকম বিশ্রী পথ পেরিয়ে মাইকেল শুকনো ভূমিতে এসে পড়ল পরদিন শেষ বেলায়।

মাইকেল ১৫ই জুলাই মস্কো থেকে রওনা হয়েছে। আজ ৫ই আগস্ট। ইরতিশ নদীর দুর্ঘটনায় সত্তর ঘণ্টা সময় বৃথা নষ্ট হয়েছে। আজ বিশ দিন পার হ'ল। ইরকুটস্ক নগর আরও পনের শত ভারস্ট দূরে।

ষোল

মাইকেল ছুটেছে—কেবলই ছুটেছে। দু'পাশে জমি। সে লক্ষ্য করল—কচি কচি শস্যের চারাগুলি নিষ্পিষ্ট হয়ে গেছে। মনে হ'ল, এসব জমির ওপর দিয়ে সেনাদল ঘোড়া চালিয়ে গেছে দ্রুতবেগে। ইতস্তত খুরের চিহ্ন। আগেও সে শুনেছিল অসভ্য তাতাররা যে দিক দিয়ে চলে—সেদিকের তৃণকুটো পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে যায়।

মাইকেল ভাবল—এবার তাকে খুব সতর্ক হয়ে চলতে হবে। দূরে দেখা গেল—আকাশের গায়ে রাশি রাশি কালো ধোঁয়া। গ্রামে গ্রামে যেন আগুন লেগেছে। তা হ'লে কি আমীরের সেনাদল এ পথ ধ'রে এগিয়ে গেছে। কেওফার খান কি তবে এ সব অঞ্চলে হানা দিয়েছে? মাইকেল মহা দুর্ভাবনায় পড়ে গেল। না জেনে-শুনে কোন্ সাহসে সে এ পথে চলবে? কিন্তু কোথাও কোন লোক নেই, কেই-বা তার কথার জবাব দেবে?

মাইকেল আরও দুই ভারস্ট পথ অগ্রসর হল। কিন্তু কোথাও কোন জনমানবের দেখা পাওয়া গেল না। রাস্তার দু'পাশে ছোট ছোট ঘর-বাড়ী—অধিবাসীরা সব ফেলে কোথায় পা'লিয়ে গেছে।

আরও কিছুদূরে গিয়ে মাইকেল দেখতে পেল—গাছপালায় ঘেরা অর্ধদগ্ধ একটি ছোট্ট বাড়ী। তখনও সেখান থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। আগুনের একধারে এক বুড়ো ছেলেপিলে নিয়ে হা-হুতাশ করছে। একধারে অল্পবয়সী একটি স্ত্রীলোক—সম্ভবত এই বুড়োরই মেয়ে দুগ্ধপোষ্য শিশু কোলে নিয়ে হতাশভাবে তাকিয়ে আছে। শ্মশানের মাঝে যেন সজীব করুণ মূর্তি।

মাইকেল ঘোড়া থেকে নেমে বুড়োর কাছে গেল। জিজ্ঞেস করল: দু-একটি কথা জানতে চাই। যদি দয়া ক'রে বলেন—

বুড়ো তার দিকে তাকাল। বলল: কি জানতে চাও, বল।

এ পথে কি তাতাররা হানা দিয়েছে?

লোকটি আঙুল দিয়ে দগ্ধ ঘরখানাকে দেখাল। বলল: আর ওদিকে দেখ, এখনো ঘর-বাড়ী জ্বলছে।

—দলটা বড়, না ছোট?

—দল নয়—বাহিনী। চেয়ে দেখ, আমার ফসলের জমি কেমন মাড়িয়ে পিষে ফেলেছে।

—এ বাহিনীর নেতা কে? আমার?

—হুঁ, আমীর কেওকার খান।

—কেওকার খান তা হলে টমস্ক শহরে প্রবেশ করেছে?

—তা করেছে।

—বলতে পারেন কলিভান শহর আক্রমণ করেছে কি না।

—না। কলিভানে এখনও আগুন দেখা যায় নি।

—শত ধন্যবাদ। আপনাদের জন্যে আমি কি করতে পারি?

—কি আর করবে বাপু? করবার মতো কিছুই তো দেখিনে।

মাইকেল পকেট থেকে পাঁচটি রুবল বের ক'রে মেয়েটির হাতে গুঁজে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। মাত্র বলল: বিদায়!

টমস্ক শহর আক্রান্ত হয়েছে। কলিভানে তাতার সেনাদল তখনও পৌঁছায় নি।

সে পথই এখন নিরাপদ। তা হ'লে প্রথমে ওবী নদী পার হ'তে হবে তাকে।

ওবী নদী আরও চল্লিশ ভার্স্ট দূরে।

পথে রাত হল। সারাদিনের অসহ্য গরমের পর রাত্রির বাতাস বেশ আরামদায়ক। ক্রমে বিশাল প্রান্তর ছেয়ে গেল গভীর আঁধারে। মাইকেল এই আঁধারেও ঘোড়া ছুটিয়ে চলল ওবী নদীর দিকে। সতর্ক তার লক্ষ্য—আর বিচক্ষণ তার ঘোড়া।

রাস্তা ঠিক করবার জন্যে মাইকেল একবার ঘোড়া থেকে নামতেই শুনতে পেল, পশ্চিম দিক থেকে একটা এলোমেলো খটাখট্ শব্দ। খরখরে মাটির উপর এ যেন ঘোড়ার খুরের আওয়াজ।

মাইকেল সচকিত হয়ে সেদিকে কান পেতে রইল। মনে হ'ল: ওমস্কের দিক থেকে একদল অশ্বারোহী যেন অতিবেগে ছুটে আসছে। ওরা কি তাতার, না রাশিয়ান? ওরা যে ভাবে আসছে, তাতে আমার এই শ্রান্ত ঘোড়া কিছুতেই আগে যেতে পারবে না। কি করা যায়?

মাইকেল একবার এদিক-ওদিক তাকাল। আঁধার ভেদ ক'রে তার তীক্ষ্ণ

৬৫

ঘুরি দিয়ে পড়ল খানিক দূরে। মনে হ'ল—বাঁ দিকে একটা জায়গায় আঁধার যেন তালগোল পাকিয়ে রয়েছে।

মাইকেল ভুল দেখেনি। সেখানে ছিল একটি ছোট্ট জঙ্গল। লম্বা মাথাওয়ালা কয়েকটি গাছ ছোটখাট ঝোপঝাড়ের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল। মাইকেল সেদিকে এগিয়ে গেল এবং একটা ঢালু জায়গা ধ'রে নেমে এল প্রায় পঞ্চাশ ফিট নিচে। দেখল—একটি ছোট্ট নদী ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে।

মাইকেল ভাবল, ওরা যদি ইরকুটস্কের দিকে যায়, তা হ'লে এই জঙ্গলের পাশ দিয়ে যে পথ, এই পথেই যেতে হবে। তারপর সে একটা নিরাপদ জায়গায় ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তার অদূরে ঘন ঝোপের আড়ালে বসে রইল।

খানিক পরেই কয়েকটি আলো জ্বলে উঠল। ঘোড়ার পায়ের খটাখট্ শব্দও স্পষ্ট শোনা গেল। সম্ভবত অশ্বারোহীরা মশাল জ্বেলে রাস্তার মোড় লক্ষ্য করে চলেছে।

মাইকেল একটু শঙ্কিত হ'য়ে পড়ল। সে ধীরে ধীরে আরও নিচে নেমে এল —একেবারে নদীর ধারে। দরকার হ'লে নদীতে ঝাঁপিয়ে আত্মরক্ষা করবে।

জঙ্গলের পাশে এসে সেনাদল ঘোড়া থামাল। সংখ্যায় পঞ্চাশ জন হবে। দশ-বারোজন লোক মশাল হাতে দাঁড়াল রাস্তার ওপর।

অশ্বারোহীরা বিদ্রোহী উজবেক সেনা। ওমস্ক থেকে বরাবর ছুটে এসেছে ওরা। এই সুযোগে নিজেরাও খানাপিনা সেরে নেবে— এই মতলব।

উজবেকরা দুর্ধর্ষ মোঙ্গলিয়ানদের বংশধর। তাতার দেশে ওদের সংখ্যাও কম নয়। সুগঠিত মাঝারি দেহ, রুক্ষ বন্য চেহারা, মাথায় ভেড়ার চামড়ার 'তালপাক' টুপি। পায়ে উঁচু হিলওয়ালা হলদে রং-এর বুটজুতো। জুতোর অগ্রভাগ সরু, উল্টানো—অনেকটা মধ্যযুগের নাগরা জুতোর মতো। পরনে ঢিলা মুখকাটা নরম তুলার কোর্তা—লাল রং-এর ফুল-কাটা বেল্ট্ দিয়ে শক্ত ক'রে জড়ানো। কোমরে লম্বা ছুরি ও বাঁকা তলোয়ার, বাঁ হাতে ঢাল। কাঁধে ঝুলানো রঙিন রুমাল।

পঞ্চাশজন লোক নিয়ে তাদের দল গঠিত হয়। দলপতির নাম 'পেন্‌জাডাচি'। তার অধীনে আর একজন অফিসার থাকে। তার নাম 'দে-ডাসচি'—দশজনের নায়ক। এই দুইজন অফিসারের মাথায় থাকে শিরস্ত্রাণ আর হাতে বর্শা। ঘোড়ার জিনের সঙ্গে ঝুলানো থাকে একটি শিঙা। তাদের পদ-মর্যাদার এই পরিচয়।

অতিরিক্ত শ্রমে সকলেরই বিশ্রামের প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছিল। বিশ্রাম করতে করতে পেন্‌ড্রাভাচি বলল: লোকটি আমাদের বেশি আগে রয়েছে ব'লে তো মনে হয় না। এ পথ ছাড়া অন্য পথে যে চলেছে এও বিশ্বাসযোগ্য নয়।

দে-ভাস্‌চি বলল: কে জানে আসলে লোকটি ওমস্ক ছেড়ে এল কিনা। খুব সম্ভব সেখানেই কোন বাড়ীতে সে লুকিয়ে আছে।

—তা হ'লে আর কথা কি! ও ইরকুটস্কে না যেতে পারলেই হ'ল। কর্নেল ওগারেফ তো তাই চান।

দে-ভাস্‌চি বলল: সত্যিই কি ওই বুড়ী ওর মা?

এই কথা শুনে মাইকেলের অন্তর দুরদুর ক'রে কেঁপে উঠল।

—নিশ্চয়ই।—পেন্‌ড্রাভাচি বলল: অথচ বুড়ী কিছুতেই স্বীকার করবে না যে ঐ ছদ্মবেশী যুবকটিই তার ছেলে। কিন্তু কর্নেল ওগারেফও যে-সে লোক নন। তিনি বলেছেন—কি ক'রে কথা বলাতে হয় তিনি জানেন।

এবার মাইকেলের বুকে সহস্র ছুরির ফলা একযোগে বিঁধল। তা হ'লে শত্রুপক্ষ জেনে গেছে যে, সে বাদশার রাজদূত—জারের সংবাদবাহক। অশ্বারোহী দল তারই পেছনে ছুটেছে! সব চেয়ে শোচনীয় ব্যাপার এই যে তার মা আইভান ওগারেফের হাতে বন্দিনী! বিশ্বাসঘাতক তাঁকে কথা বলাবার জন্যে পীড়ন করছে!

মাইকেল জানত, তার মাও সহজ মেয়ে নন। দুরন্ত তাঁর সাহস। জীবন দেবেন তবু একটি কথাও তিনি বলবেন না।

কিন্তু মাইকেল কি করতে পারে? তার জীবন, তার কর্তব্য, তার মায়ের মর্যাদা—সবই এখন বিপন্ন। কাজেই আর ইতস্তত করা চলে না। দুর্বিপাক ও বাধা-বিপদে তার সাহস আরও বেড়ে গেল।

আর দেরি নয়। এই অশ্বারোহীদের আগে তাকে ওবী নদী পার হ'তে হবে। রাতও প্রায় শেষ হয়ে এল! আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে এখুনি তাকে পালাতে হবে।

উজবেক সেনাদলের কয়েকজন বনের আশেপাশে অলসভাবে ঘোরাফেরা করছিল। আর অনেকেই শুয়ে পড়েছিল ঘাসের উপর।

মাইকেল এবার ঘোড়াটির কাছে গিয়ে মৃদু শিষ দিয়ে ও গলায় হাত চাপড়ে উৎসাহিত ক'রে তুলল।

মশালগুলি নিভে গিয়েছিল আগেই। চারদিক আগের মতোই নীরব অন্ধকার। মাইকেল ঘোড়ার লাগাম ধ'রে চুপিচুপি পথের দিকে এগোতে

লাগল। ঘোড়াটিও যেন বুঝতে পেরেছিল প্রভুর মতলব। সেও চলতে লাগল অতি সাবধানে।

কিন্তু মুশকিল বাধল হঠাৎ। অন্য ঘোড়ার সন্ধান পেয়ে উজবেক ঘোড়াগুলি চঞ্চলভাবে চিঁহি চিঁহি ক'রে উঠল।

সর্বনাশ! আর পিছিয়ে যাওয়া চলে না। মাইকেল ডান হাতে রিভলভার ঠিক ক'রে সাবধানে এগোতে লাগল। যদি কেউ তার দিকে আসে, তা হ'লে এক নিমেষে মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে।

ঘোড়াগুলোর চঞ্চলতায় উজবেক দলের একজন সচকিত ও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। সে দেখতে পেল—একটি গাঢ় ছায়া যেন জোরেই দূরে স'রে যাচ্ছে। চেঁচিয়ে উঠল সে। বিস্ময়ে সকলেই তখন লাফিয়ে উঠল। তারপর ছুটে গেল ঘোড়াগুলোর দিকে।

মাইকেল একলাফে ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে ছুটল তীরবেগে।

সেনাধ্যক্ষ দুইজন চেঁচিয়ে উঠল: পাকড়ো—পাকড়ো!

সোঁ সোঁ ক'রে একটি গুলিও ছুটে গেল মাইকেলের কোটের আস্তিন ঘেঁষে। কিন্তু সে ফিরে তাকাল না—শত্রুদের গুলির প্রত্যুত্তর দিল না। নানাভাবে ঘোড়াটিকে সে উত্তেজিত ক'রে তুলল। তার লক্ষ্য ডবী নদী।

উজবেক দলও লাগাম ঢিলা দিয়ে ঘোড়া ছুটাল তার পিছু পিছু।

রাতের আঁধার ক্রমে ফিকে হয়ে এল। ভোর হ'তে আর বিলম্ব নেই। আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে দূরের গাছপালা।

মাইকেল এবার সাবধানে ঘাড় ফিরাল। দেখল: একটি উজবেক অশ্বারোহী তীরবেগে ছুটে আসছে। এই লোকটিই দলের দে-ভাস্চি। অদ্ভুত কৌশলে ঘোড়া হাঁকিয়ে দলবল পেছনে ফেলে অনেক এগিয়ে পড়েছে সে।

মাইকেল চলার মুখেই ধীরে ধীরে রিভলভার ঘুরিয়ে ধরল লোকটির দিকে। মুহূর্ত মধ্যে উজবেক অকস্মাৎ ঘোড়া থেকে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

কিন্তু দে-ভাস্চির এই শোচনীয় পতনে অন্যান্য অশ্বারোহীরা ভ্রূক্ষেপ করল না—একটু দাঁড়ালও না। তারা ক্রমাগত ছুটে আসতে লাগল।

এবার বুঝি সব যায়। মাইকেলের ঘোড়াটিও ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। যে-কোন মুহূর্তে শুয়ে পড়তে পারে। তাই সে পুনঃ পুনঃ শিস দিয়ে দিয়ে তাকে চাঙ্গা ক'রে তুলতে লাগল।

ভোর হয়ে গেল। সম্মুখে গাছপালার ফাঁকে দেখা যায় খরস্রোতা ডবী নদী। দুই কূল প্লাবিত ক'রে জলরাশি প্রান্তরে এসে মিশেছে। পেছনে কিন্তু শত্রুদের মাঝে মাঝে গুলি ছুটেছে তাকে লক্ষ্য করে। সেও তার জবাব দেয় নিপুণ

লক্ষ্যে। প্রতিবারেই এক-একজন অশ্বারোহী গড়িয়ে পড়ে ভূমিতে। আহতের শেষ-চীৎকার মিলিয়ে যায় সঙ্গীদের মিলিত চীৎকারে।

কিন্তু মাইকেল এবার বিপদে পড়ল। ঘোড়া আর চলে না। ওবী নদী আর বেশি দূরে নয়। মাইকেল এবার শেষ চেষ্টা করল। মুখে নানারকম শব্দ ক'রে, কানে হাত বুলিয়ে ঘোড়াটিকে ক্ষেপিয়ে তুলল।

সেনাদল পুরোদমে ঘোড় হাঁকিয়ে ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগল।

ওবী নদীর তীর জনশূন্য। কোন দিকে কোন নৌকো দেখা গেল না।

মাইকেল চীৎকার ক'রে উঠল ঘোড়াটাকে লক্ষ্য ক'রে: সাবাস বন্ধু! এবার শেষ চেষ্টা। কোন ভয় নেই...

চক্ষের নিমেষে মাইকেল ঘোড়া নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীর প্রবল স্রোতে।

উজবেক দল নদীর পারে এসে থমকে দাঁড়াল। ইতস্তত করল কি করবে ভেবে। ঝাঁপিয়ে পড়তে সাহস হ'ল না তাদের। তারা কেবল নদীর বুকে অবিরাম গুলি চালাতে লাগল।

ঘোড়াটির আড়ালে থেকে মাইকেল সাঁতরে চলেছে। সেনাদল এবার গুলি চালাল মাইকেলকে লক্ষ্য ক'রে। সেই গুলিতে ঘোড়াটি সাংঘাতিক রকম আহত হয়ে ডুবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাইকেলও ডুবে গেল। শত্রুদল তাকে আর দেখতে পেল না।

সতেরো

নদীর অপর পারে ছিল বড় বড় ঘাসঝড়া বনের ঝোপ। মাইকেল এই ঝোপের ভেতর ঢুকে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে ভীষণ কাদা ভেঙে পারে উঠে পূবদিকে চলতে লাগল।

সেখান থেকে প্রায় দুই ভার্স্ট দূরে একটি ছোট্ট নগর—যেন পটে-আঁকা ছবি। এটি পাহাড় নগরের গা ঘেঁষে চলে গেছে অন্য দিকে। নীল আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে গীর্জার উঁচু গম্বুজ। গম্বুজের সোনার চুড়ো রোদ্দুরে ঝকমক করে।

এই কলিভান শহর। গরমের দিনে বারাবা প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু যখন একান্ত অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে সে সময়ে গভর্নর এবং অন্যান্য রাজকর্মচারীরা এখানে এসে বাস করেন। মাইকেল শুনেছিল—বিদ্রোহীরা তখনও কলিভানে পৌঁছোয়নি।

মাইকেলের উদ্দেশ্য—উজবেক অশ্বারোহীদল নদী পেরিয়ে এদিকে আসার

আগেই সে কলিভানে যাবে এবং যেমন ক'রেই হোক সেখান থেকে একটি ঘোড়া সংগ্রহ করে ইর্কুটস্কের পথ ধরবে।

তখন বেলা অনেক হয়েছে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে উজ্জ্বল সূর্যালোক। কিন্তু আশ্চর্য! জনপ্রাণীর সাড়া-শব্দ নেই কোন দিকে। হাঙ্গামার ভয়ে অধিবাসীরা সব পালিয়ে গেছে। দুর্ধর্ষ তাতারবাহিনী! কে তাদের বাধা দেবে? তাই শহর জনশূন্য—খাঁ-খাঁ করছে জনপ্রাণীর অভাবে।

মাইকেল দ্রুত পা চালিয়ে চলতে লাগল। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই সে থমকে দাঁড়াল। হঠাৎ অস্পষ্টভাবে শোনা গেল এলোপাথাড়ি গোলাগুলির আওয়াজ আর সমুদ্র-তরঙ্গের গর্জনের মতো জনতার হট্টগোল।

—তা হলে কি এবার অসংখ্য তাতার সেনার সঙ্গে নগণ্য রাশিয়ানদের সংঘর্ষ বাধল?

মাইকেল সত্যিই অনুমান করেছিল। শহরের দক্ষিণ দিকে আকাশ ঘন আঁধার হয়ে গেল সহসা। ও তো শহরের কালো ধোঁয়া নয়। বিদ্রোহীদের তোপবারুদের রাশি-রাশি ধোঁয়া মেঘের আকারে আকাশকে ঢেকে ফেলেছে।

তা হ'লে শহরেই কি সংঘর্ষ বেধেছে।

মাইকেল মাঠের ওপর দিয়ে দৌড়াতে লাগল—শহরের উত্তর দিকে মুখ ক'রে। কিছুদূর গিয়েই সে থামল। দেখল, বিদ্রোহীদল তখন শহরে ঢুকে পড়েছে। তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়।

একবার সে এদিক-ওদিক তাকাল। দেখা গেল—দূরে মাঠের একধারে ছোট-বড় গাছের সারি। তারই আড়ালে একটি ছোট্ট ঘর। এ সময়ে ওখানে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া হয়ত বিশেষ কঠিন হবে না।

আর ইতস্তত করা চলে না। নিদারুণ ক্লান্তি ও ক্ষুধার জ্বালা, তার ওপর সম্মুখে এ বিপদ—শরীর ক্রমেই অবসন্ন হয়ে পড়ছিল। ওখানে গিয়ে যদি আশ্রয় মেলে ভালো, না হ'লে…

মাইকেল তাড়াতাড়ি পা চালাল। গিয়ে দেখে ঘরটি এক টেলিগ্রাফ অফিস। সেখান থেকে পূর্বদিকে ও পশ্চিমদিকে দুটি তারের লাইন চলে গেছে।

ঘরে লোকজন কেউ আছে ব'লে মনে হ'ল না। মাইকেল ভাবল: না থাক্ কেউ। দিনটা লুকিয়ে থাকতে পারলেই হয়। তারপর রাতের অন্ধকারে প্রাচীর পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করা যাবে।

সামান্য ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। দেখা গেল, একটি লোক ভেতরে বেড়া দেওয়া একটি খোপের ভেতর নির্বিঘ্নে বসে রয়েছে। খোপের সামনের

দিকে একটি ক্ষুদ্র জানালা। লোকটির সামনে টেবিলের ওপর একটি ট্রান্সমিটার যন্ত্র। তার ওপর সে আঙুল দিয়ে কেবল টরে টক্কা টরে-টক্কা করছে।

লোকটি টেলিগ্রাফের কেরানী। ধীর শান্ত উদাসীন ঢিলে মেজাজ তার, কি ব্যাপার চলেছে—সেদিকে যেন তার খেয়াল নেই। কর্তব্যের ভার নিয়ে নির্বিকারভাবে বসে আছে।

মাইকেল এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল: নূতন খবর কি মশাই?

—কিছুই না।—লোকটি মৃদু হেসে জবাব দিল।

রাশিয়ান আর তাতারের সংঘর্ষ বেধেছে নাকি?

—তাই হবে।

—কারা জয়ী হল?

—তা তো জানি নে।

এমনি উদাসীন শান্ত জবাব। দুর্দৈবের তুমুল ঝড় বয়ে চলেছে চতুর্দিকে। এরই মাঝে এমনি নিশ্চিন্ত উদাসীন ভাব নিয়ে বসে থাকা—এ যেন নিতান্ত হেঁয়ালি বলে বোধ হল।

মাইকেল আবার জিজ্ঞেস করল: এখনো কি তার চলে?

—কলিভান ও ক্রেসনয়েয়ার্সিক শহরের লাইন বন্ধ হয়ে গেছে। রাশিয়া সীমান্তে এখনও চলে।

—সরকারী খবর পাঠান হয় কি?

—সুযোগ মতো। পয়সা দিয়ে সাধারণ লোকও খবর পাঠাতে পারে। প্রতি শব্দের জন্যে দশ কোপেক। ইচ্ছে করলে তুমিও পার...

মাইকেল এই অদ্ভুত লোকটিকে বলতে গেল—সে কোন খবর পাঠাবে না —তার চেয়ে একটুকরো রুটি পেলেই এখন বেঁচে যায়। কিন্তু বলার আগেই দড়াম্ করে ঘরের দরজা খুলে গেল।

হয়ত তাতাররা এসে পড়েছে—এই ভেবে মাইকেল জানালা ডিঙিয়ে পালাবার উপক্রম করল। সেই মুহূর্তেই দুটি লোক হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল। তারা তাতারও নয়—বিদ্রোহীদের কেউ বলেও মনে হ'ল না।

তাদের একজন অপর জনকে পেছনে ফেলে একটুকরো কাগজ হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল কোণের জানালার দিকে।

মাইকেল অবাক হয়ে গেল তাদের দেখে। এমনভাবে এমন স্থানে তাদের এই দুইটি লোকের সঙ্গে দেখা হতে পারে এ কল্পনাও সে করতে পারে নি।

এরা সাংবাদিক হ্যারি ব্লাউন্ট আর অলসাইড জুলিভেট। এ সময়ে উভয়ের আর বন্ধু নয়, প্রতিদ্বন্দ্বী—শত্রু। দুই পক্ষ যেন কোমর বেঁধে যুদ্ধক্ষেত্রে।

মাইকেল ইংলিস শহর ছেড়ে আসবার আধ ঘণ্টা পর তারাও সেখান থেকে রওনা হয়। তারাও খবর পেয়েই এসেছে। কিন্তু ইংলিশ নং ৫ দুর্ঘটনার জন্য মাইকেলের তিন দিন বিলম্ব হয়। তার পরে রওনা হয়েও তারা তাদের আগে কালিভানে পৌঁছোয়। এখানে এসেই তারা রাশিয়ান ও তাতার যুদ্ধের ব্যাপার প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করতে থাকে। তাতাররা শহরে ঢুকলেই কার আগে কে টেলিগ্রাফে খবর পাঠাবে—এই উদ্দেশ্যে ব্যস্ত হয়ে তারা ছুটে আসে এই টেলিগ্রাফ স্টেশনে।

হ্যারি ব্লাউন্ট সঙ্গী লোকটিকে পেছনে ফেলে বরাবর খোপের মত জানালাটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আর অলসাইড জুলিভেট পেছনে দাঁড়িয়ে রইল—পাথর-মূর্তির মতো। এতটা ধৈর্য তার স্বভাবগত নয়—তাই তার চোখে মুখে একটা অস্থির ভাব।

কাগজ হাতে নিয়েই কর্মচারীটি বলল: প্রতি শব্দে দশ কোপেক।

হ্যারি ব্লাউন্ট তখুনি টেবিলের ওপর এক মুঠো রুবল ফেলে দিল। জুলিভেট হতভম্ব হয়ে গেল—লোকটির কাণ্ড দেখে।

কর্মচারীটি কাগজের টুকরো হাতে নিয়ে শান্তভাবে ট্রান্সমিটার টিপে খবর পাঠাল:

"ডেলী টেলিগ্রাফ, লণ্ডন

কলিভান, গভর্নমেন্ট অব ওমস্ক, ৬ আগস্ট

"রাশিয়ান ও তাতার বাহিনীর তুমুল সংঘর্ষ"

ট্রান্সমিটারের টরে-টক্কার সঙ্গে সঙ্গে কেরানীটিও সম্পূর্ণ খবর স্পষ্ট ক'রে পড়ে যাচ্ছেন:

'রাশিয়ান বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ও নিদারুণ ক্ষতি'

এখানেই খবর শেষ হ'ল। অলসাইড এক পা সরে এসে অধীরভাবে চেঁচিয়ে বলল এবার আমার পালা।

হ্যারি ব্লাউন্ট তাতে রাজী নয়। তার ইচ্ছে, এই মুহূর্তে কি ঘটল সেই খবরও পাঠায়। কাজেই চুপচাপ সে খুপরির গবাক্ষ আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়েই রইল।

অলসাইড জুলিভেট আশ্চর্য হয়ে হ্যারি ব্লাউন্টকে বলল: তোমার তো হলো? আর কেন?

—উঁ-হু এখনো হয়নি।—আর এক টুকরো কাগজে কি লিখতে লিখতে শান্তভাবে জবাব দিল হ্যারি ব্লাউন্ট। তারপর কাগজখানা কেরানীর হাতে

দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। কেরানীটি নিশ্চিন্তমনে ট্রান্সমিটারে হাত রেখে সুর ক'রে আবৃত্তি করল:

John Gilpin was a citizen
Of credit and renown;
A train-band captain eke was he
Of famous London town.

লণ্ডন শহরে জন গিলপিন ছিল একজন নামকরা লোক। কাজে কর্মে তার সুনাম ছিল খুব। তাছাড়া সে ছিল বেসামরিক রক্ষীবাহিনীর ক্যাপ্টেন।

হ্যারি ব্রাউন্ট তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে দূরে রেখে টাটকা খবর পাঠাবার সময় ক'রে নেবার ফন্দি করল শৈশবে-পড়া বিখ্যাত জন গিলপিনের কবিতা দিয়ে। তাতে অবশ্য সংবাদপত্রের অজস্র টাকা খরচ হবে কিন্তু টাটকা খবর দিতে পারলে ঐ ক্ষতি বিশেষ কিছুই নয়।

ফরাসীটা ততক্ষণ ঐখানেই অপেক্ষা করুক।

এবার জুলিয়েটের ক্রোধের মাত্রা কল্পনার মাত্রাকেও ছাড়িয়ে গেল। অন্য সময় হ'লে এতক্ষণে হাতাহাতি সুরু হয়ে যেত। এমন কি জোর জার ক'রেও কর্মচারীটিকে দিয়ে আগে খবর পাঠাতে বাধ্য করত। অন্যায় জুলুম কিছুতেই সে আমল দিত না।

কেরানীটিও অবস্থাটা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল। মৃদু হেসে হ্যারি ব্রাউন্টকে দেখিয়ে বলল: এই ভদ্রলোকের কাজ এখনও শেষ হয় নি।

এই কথা বলেই সে ঠাণ্ডামেজাজে আবার কবি কুপারের জনপ্রসিদ্ধ কবিতা আবৃত্তি করে টেলিগ্রাফের কাছে পাঠাতে লাগল।

এই অবসরে হ্যারি ব্রাউন্ট ফিল্ড-গ্লাস চোখে দিয়ে দূরে শহরের দিকে তাকাল। তারপর খস্‌খস্‌ করে এক এক টুকরো কাগজে লিখে নিয়ে কর্মচারীটির হাতে গুঁজে দিতে লাগল।

"দুইটি শিবিরে আগুন ধরে গেছে। সে আগুন লকলক শিখা মেলে ছড়িয়ে পড়ছে দক্ষিণ দিকে।"

John Gilpin's spouse said to her dear,
"Though wedded we have been
These twice ten tedious years, yet we
No holiday have seen"

গৃহিণী দুঃখ ক'রে বললেন: বিয়ে হয়েছে আমাদের এই বিশ বছর। এর মধ্যে একটা দিনও একটু আমোদ করতে পেলাম না, খালি কাজ আর কাজ।

— হ্যালো।—হ্যারি ব্রাউন্ট বলল।

—হঁ ঠিক আছে।—জুলিভেট বিদ্রূপের ভঙ্গিতে জবাব দিল।

এতক্ষণে যুদ্ধের অবস্থা ভীতিজনক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। যুদ্ধরত সেনাদল ক্রমেই এগিয়ে এল এবং অবিশ্রান্ত গোলাগুলির গর্জনও স্পষ্ট শোনা গেল।

একবার স্টেশন ঘরটিও কেঁপে উঠল। একটি গোলা সোঁ ক'রে এসে দেয়াল ভেঙে দিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে ধুলোবালিতে অন্ধকার হ'য়ে গেল সব দিকে। এ সময়ে জুলিভেট আরও দুইটি লাইন মাত্র নিয়েছিল—

'Joufflu comme un pomme,

Qui, sans une sou comptant—"

আপেলের মত সুপুষ্ট যার চোয়াল কিন্তু একটি পয়সা নেই তার কাছে।

কিন্তু গোলাটিকে আসতে দেখে সে হাতের পেন্সিল ফেলে দিয়ে দু হাতে লুফে নিল। এবং গোলাটির পরিধি কত তা মেপে নিয়ে জানালা দিয়ে ফেলে দিল বাইরে।

পাঁচ সেকেণ্ড পরে গোলাটি ভীষণ শব্দে বিস্ফোরিত হ'ল।

অলসাইড জুলিভেট ধূলোর সম্মুখে দাঁড়িয়ে লিখল :

"একটি ৬ ইঞ্চি শেল এই মাত্র টেলিগ্রাফ অফিসের দেয়াল ভেঙে দিল।

এমন শেল আরও বিস্ফোরিত হবার সম্ভাবনা।"

মাইকেল স্ট্রগফ এবার নিঃসন্দেহে বুঝতে পারল যে রাশিয়ান সেনা কলিভান থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এখন একমাত্র পথ—দক্ষিণ প্রান্তর পেরিয়ে যাওয়া।

ঠিক এই মুহূর্তে তাতার সেনাদলের হুকার শুনা গেল। এক সঙ্গে কতকগুলো বন্দুকের গুলি টেলিগ্রাফ অফিসের জানালার কাচ চূর্ণ ক'রে দিল। হ্যারি ব্লাউন্টের কাঁধে লাগল সাংঘাতিক আঘাত।

জুলিভেট এমন সঙ্কটেও বিচলিত হ'ল না। ধীরভাবে টেলিগ্রাফের খবর লিখল :

ডেলী টেলীগ্রাফের সম্বাদদাতা হ্যারি ব্লাউন্ট এইমাত্র প'ড়ে গেল গুলির আঘাতে . .

কিন্তু ট্রান্সমিটারে শেষ কথাটি বাজাবার আগেই নির্বিকার কেরানী ধীর-কণ্ঠে জানাল : নাঃ আর হ'ল না,—লাইন কেটে গেছে!

ব'লেই লোকটি উঠে দাঁড়াল। আলনা থেকে টুপিটা পেড়ে জামার আস্তিন দিয়ে দু'বার ঝেড়ে নিয়ে জানালা ডিঙিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঠিক এই সময়ে বিদ্রোহীরা হুড়মুড় ক'রে ঢুকল ঘরে। মাইকেল স্ট্রগফ ও সাংবাদিক দু'জনের কেউ আর পালাবার সুযোগ পেল না।

আলসাইড জলিভেট তার অর্ধসমাপ্ত টেলিগ্রামের খসড়াটি টেনে নিয়েই হ্যারি ব্লাউন্টকে দু হাতে পাঁজা ক'রে তুলে নিল। যেমন ক'রেই হোক সহকর্মীকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু সে সুযোগ আর পাওয়া গেল না। তাতারদের হাতে তারা বন্দী হল।

মাইকেল স্ট্রগফ বাইরে লাফিয়ে পড়ল জানালা-পথে। কিন্তু শেষে দেখল যে বিদ্রোহীদের হাতের ওপরই সে পড়েছে।

আঠারো

কলিভান থেকে ডিয়াচিন্স্ক্ একদিনের পথ। সম্মুখে বিস্তৃত সমতল তৃণভূমি, মাঝে মাঝে পাইন ও দেবদারু বন।

গরমের দিনে এই বিশাল ভূমিতে অগণিত ভেড়ার পাল চ'রে বেড়ায়। সাইবেরিয়ার রাখাল বালকের আনন্দ-কলরোলে দিগন্ত মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু এবার এসে দেখ, আর একটি ভেড়াও সেখানে নেই, রাখাল বালকের মুখর কলরব নীরব হয়ে গেছে।

এবার এই বিশাল প্রান্তর জুড়ে পড়েছে বিদ্রোহী তাতার-বাহিনীর ছাউনি। বোখারার দুর্ধর্ষ আমীর ফেওফার খান দলবল নিয়ে স-সমারোহে এখানে অপেক্ষা করছেন।

সেদিন ১২ আগস্ট। কলিভানে রাশিয়ান সেনার পরাজয়ের পর যারা বন্দী হয়েছিল তাদেরও এখানে আনা হয়েছে। মাইকেল স্ট্রগফও ছিল এই দলে। বন্দী-দশা! বিপদ-বিপর্যয়ের ভারে সে কি ভেঙে পড়েছে? তার এত চেষ্টা কি তবে বিফল হল?

পৃথিবীতে এমন কতকগুলো লোক থাকে দেহে শেষ-রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত সচল থাকতে যারা নিরাশ হয়ে পড়ে না। মাইকেল স্ট্রগফ এই ধাতের মানুষ। তার শিরায় শিরায় রক্ত-প্রবাহ তখনও চলেছিল প্রবলবেগে। জারের মোহরাঙ্কিত খামখানা তখনও ছিল নিরাপদে। তার আসল পরিচয় তখনও বিদ্রোহীদের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অগণিত বন্দীদের মাঝে সেও একজন সাধারণ বন্দী। তাতার রক্ষীদল ভেড়ার পালের মতো এই বন্দীদের তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে টমস্কের দিকে।

আইভান ওগারেফ এখনও পিছনে—অনেক দূরে।

শত্রুর হাতে বন্দী হবার পর মাইকেল স্ট্রগফের প্রাণপণ একটা বিষয়ে সজাগ

সচেতন হয়ে উঠেছিল। কেমন ক'রে সে মুক্ত হবে? দুর্ধর্ষ আমীরের লোকদের চোখে কি ভাবে সে ধুলো দিয়ে পালাবে এই ছিল তার লক্ষ্য।

এই বিশাল প্রান্তরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বিদ্রোহীসেনা জড় হয়েছিল,—অশ্বারোহী যেমন ছিল পদাতিকও কম নয়। তবে তাজিকরাই ছিল প্রধান। তুর্কিস্থানের বিশিষ্ট জাতি এরা।

একদিকে আমীরের প্রকাণ্ড তাঁবু—সবার ওপর দিয়ে দেখা যায়: রেশমী বস্ত্রের ছাউনি, সোনালি রংএর দড়ি দিয়ে খাটানো। খুঁটিতে রংবেরং-এর পাখীর পালকের জোড়া। বাতাসে ঐ বিচিত্র পালক ফুরফুর ক'রে দুলছে। তাঁবুর সম্মুখ-ভাগে বহুমূল্যের পাথর-মোড়ানো টেবিল। টেবিলের ওপর পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরান।

বন্দীদলকে যখন এখানে নিয়ে আসা হয় সে সময় আমীর তাঁবুতে বিশ্রাম করছিলেন। বন্দীদের সৌভাগ্য যে তিনি বাইরে ছিলেন না। আমীর-বাদশার খেয়ালি মেজাজ, তাদের এক হাঁকডে বা মুখের কথায় শত শত বন্দীর গর্দানও চলে যায়। তাছাড়া সাধারণের সঙ্গ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা প্রাচ্য-রাজন্যদের একটা বিশিষ্ট ধারা। তাতে তাঁর সম্মানও যেমন বজায় থাকে, প্রজাসাধারণও তেমনি সমীহ ক'রে চলে।

খোঁয়াড়ের মতো একটা ঘেরা-দেওয়া জায়গায় বন্দীদলকে আবদ্ধ ক'রে রাখা হয়েছিল। তাদের ওপর নির্দয় ব্যবহার চলে অহরহ। বরাদ্দ অখাদ্য আহার। কি করবে হতভাগ্য বন্দীদল? তারা রোদবৃষ্টি মাথায় ক'রে আমীরের খেয়াল-মেজাজের ওপর নির্ভর ক'রে রইল।

মাইকেল স্ট্রগফ ধীর শান্তভাবে মাথা গুঁজে রইল। বিজেতাদের ইচ্ছামতো সে চলতে লাগল বিনাদ্বিধায় বিনাবাক্যে। কারণ, সে জানে টমস্কে যাবার আগে পালাবার কোন সুযোগ হবে না। তাছাড়া তার সংযম-শক্তিও অসাধারণ। সে নিজেকে সামলে রাখল এই ভেবে যে, সে যদি একবার টমস্কে পৌঁছতে পারে তাহ'লে সুযোগ বুঝে বন্দীশালা ডিঙিয়ে পালাবে। বারো ঘণ্টার মধ্যে পেরিয়ে যাবে আমীরের অঞ্চল। তাহ'লে আইভান ওগারেফকে চব্বিশ ঘণ্টার পথ পেছনে ফেলে সে অনেক আগেই ইরকুটস্কে পৌঁছতে পারবে।

মাইকেলের একমাত্র ভয় আইভান ওগারেফের উপস্থিতি,—তার চোখে পড়লে সব উদ্দেশ্য বিফল হবে। তাছাড়া একথাও সে বুঝতে পারল যে যদি আইভান ওগারেফের দল একবার আমীরের দলের সঙ্গে মিলিত হয়, তাহলে বিজিত সৈন্যদল একটা বিপুল বাহিনী হয়ে দাঁড়াবে—এবং এই বাহিনীর সম্মুখে এমন শক্তি নেই যে দাঁড়াতে পারে। কাজেই শত্রুদল বরাবর এগিয়ে

যাবে কিনা বাধায়। সাইবেরিয়ার রাজধানী ইরকুটস্ক অনায়াসে তাদের কবলিত হবে।

এই ধারণা তাকে অত্যন্ত সচকিত ও শঙ্কিত ক'রে তুলেছিল। প্রতি মুহূর্তে তার আশঙ্কা: আমীরের সহকারী আইভান ওগারেফ ঐ বুঝি এল। ঐ যে তূর্যভেরী বেজে উঠল, এ বুঝি তারই আগমনের ঘোষণা।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল, তার স্নেহময়ী মায়ের কথা—ভগিনী-স্বরূপা সঙ্গিনী নাদিয়ার কথা। তাতারদের হাতে নাদিয়া ধরা পড়েছে, সম্ভবত মায়ের মতো সেও বন্দিনী। তারা বিপদে সেও আজ বন্দী—অসহায়—তাদের জন্যে কিছুই করবার ক্ষমতা তার নেই।

মাইকেল নিরুপায় দৃষ্টিতে একবার বন্দীদের দিকে তাকাল। হঠাৎ চোখ পড়ল দুটি লোকের ওপর।—অদ্ভুত রকমে তারা পাশাপাশি বসে রয়েছে।

হ্যারি ব্লাউন্ট আহত হবার পর আলসাইড জুলিভেট কর্তব্য হিসাবে বন্ধুর ভার নিয়েছিল। কলিভান থেকে এপর্যন্ত আহত ব্লাউন্ট বন্ধুর কাঁধে ভর দিয়ে হেঁটে আসে বন্দীদের সঙ্গে। সে যে একজন ব্রিটিশ প্রজা, একথা জানাবার চেষ্টা কয়েকবারই সে করেছিল, কিন্তু কোন ফল হয়নি। অসভ্য তাতাররা তার জবাব দিয়েছে চাবুক আর সঙ্গীন দেখিয়ে। শেষ পর্যন্ত ডেলী টেলিগ্রাফের বিশিষ্ট রিপোর্টার অন্যান্য বন্দীদের ভাগ্যকেই বরণ করে নিতে বাধ্য হয়।

মাইকেলের কৌতূহল হ'ল তাদের খবর নিতে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের অবস্থার কথা মনে ক'রে তাদের দিকে না গিয়ে অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে রইল যেন তাকে দেখতে না পায়।

এমনি ভাবে কেটে গেল চার দিন। বন্দীদের কেউ পালিয়েছে বা পালাবার চেষ্টা করেছে এমন খবর শোনা যায়নি। দিন রাত কড়া পাহারা চলে। বন্দীরা দিনদিন আধমরা হয়ে পড়ে। দিনরাতে মাত্র দুবার আধা-সেঁকা তাতারদের নাকি-রুটি তাদের দেওয়া হয় খেতে এবং দেওয়া হয় অত্যন্ত তাচ্ছিল্য ক'রে। তাছাড়া আবহাওয়াও বিশ্রী রকমের। দমকা ঠাণ্ডা হাওয়া আর মাঝে মাঝে ঝটকা বৃষ্টি। তাদের দুর্দশার আর অবধি রইল না। কয়েকজন আহত স্ত্রীলোক ও তিন-চারটি বালক মারা গেল—কেউ-বা অতিরিক্ত পথশ্রমে, কেউ-বা না খেতে পেয়ে। বন্দীরাই তাদের সমাধির ব্যবস্থা করে যেমন-তেমন ভাবে। রক্ষীদল একাজে একটুও মাথা ঘামায় নি।

তারপর ঘটনার পরিবর্তন। সেদিন ১২ই আগস্ট ভোর বেলা। হঠাৎ তূর্যভেরী সমানে বেজে উঠল। ঘন ঘন তোপ পড়ল। পথের ধুলোয় আকাশ গেল ঢেকে।

বন্দীরা বলল: কর্নেল ওগারেফ এসে পড়েছেন।

ঊনিশ

আমীরের মূলশক্তি আইভান ওগারেফ। তারই ইংগিতে সহস্র সহস্র সেনা সারি বেঁধে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল শিবিরের বাইরে—খোলা প্রান্তরে। তাদের ওপর বিশ্রামের আদেশ ছিল না। কেননা অহেতুক বিলম্ব করা ওগারেফের ইচ্ছে নয়। যথাসত্বর টমস্ক শহরে যাওয়া এবং সেখান থেকে আবার নোতুন অভিযান চালানো—এই ছিল তার মতলব।

ওমস্ক শহরে এবং পথে পথে যে-সব হতভাগ্য ওগারেফের হাতে ধরা পড়েছিল, তারাও ছিল এই সঙ্গে। কিন্তু স্থানাভাবে তাদের ঠাঁই হ'ল না এখানকার বন্দীদলে। অনাহারে অনিদ্রায় অবসন্ন দেহ নিয়ে তারাও দাঁড়িয়ে রইল নজরবন্দী হয়ে। তাদের অদৃষ্টের উপর আমীর ফেওফার খানের কী কঠোর আদেশ ঝুলছে কে জানে? এতগুলো বন্দীকে পোষা—এও তো সহজ ব্যাপার নয়। তবে কি গর্দানের হুকুম হবে? এতগুলো লোকের রক্তাক্ত শির তা হ'লে ধুলোয় গড়াবে?

কিছুক্ষণ পরেই কয়েকজন সশস্ত্র সেনা বেরিয়ে এল ঘোড়ায় চড়ে। সঙ্গে উজবেক অশ্বারোহী রক্ষী। আইভান ওগারেফকে অভ্যর্থনা জানাল তারা।

আইভান ওগারেফ তখন ধীরে ধীরে চলল আমীরের শিবিরের দিকে। পথের পাশে হঠাৎ এসে দাঁড়াল—জিপসী সাংগারে।

আইভান জিজ্ঞেস করল: নোতুন খবর?

সাংগারে বলল: কিছু নেই।

—যাক, অধৈর্য হয়ো না।

—তোমার ডাইনী বুড়ীকে কথা বলাবার সময় কি এখনও হয়নি?

—এই হ'ল ব'লে।

—কবে?

—টমস্কে গিয়ে।

—কিন্তু সে কবে?

—ব্যস্ত হয়ো না সাংগারে, তিন দিনের মধ্যেই আমরা টমস্কে যাব।

সাংগারের কালো চক্ষুতে একটা অদ্ভুত জ্যোতি দেখা গেল। শান্তভাবে স'রে দাঁড়াল সে। ওগারেফ ঘোড়া হাঁকাল।

কেওতাই খান আইচান ওগারেকের অপেক্ষায় ছিল। তার দু'পাশে পোশাকধারী রক্ষী। একপাশে জনকয়েক পদস্থ কর্মচারী।

আমীর কেওতাই খান মধ্যবয়সী। সুদীর্ঘ শরীর। ঈষৎ বিবর্ণ রুক্ষ চেহারা। চোখের দৃষ্টি কঠোর। পরণে সোনারূপায় মোড়া বক-আঁটা জোব্বার বেশ। কোমরে বাঁধা মূল্যবান্ পাথর-খচিত পেটিকা। মাথায় মণিমুক্তা জড়ানো শিরস্ত্রাণ। এমনি জাঁকালো সাজ নিয়ে বসে ছিল যেন একচ্ছত্র সম্রাট—দোর্দণ্ড তার প্রতাপ। প্রজার রক্ত জল-করা অর্থসম্পদের ওপর চলে তার উচ্ছৃঙ্খল বিলাসব্যসন। রাজ্যের লোক তাকে বলে বোখারার আমীর।

আইচান ওগারেককে দেখেই সমস্ত শিবির যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। কেওতাই খান পালঙ্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াল পদস্থ কর্মচারী-দল।

কেওতাই খান এগিয়ে এসে আইচান ওগারেকের ললাটে চুম্বন দিল। সহকারী সেনাধ্যক্ষের সম্মান জানাবার এই রীতি। তারপর বলল: আইচান, তোমাকে নির্দেশ করবার মত কিছু নেই। তোমার কথা শুনবার জন্যেই এখানে সবাই আশা করে আছে।

ওগারেক বিনীতভাবে তাতার ভাষায় বলল: জনাব, আমার বক্তব্য কি শুনুন। সংক্ষেপে বলব—কারণ বেশি কথা বলবার সময় এখন নয়। আমার কর্তব্য কি, আমি এ পর্যন্ত কি করেছি, না করেছি জাঁহাপনার কিছুই অজানা নেই। হামদান থেকে টাইগ্রিস নদী পর্যন্ত আমাদের করায়ত্ত হয়েছে। এদিকে টমস্ক অবধি সাইবেরিয়ার বড় বড় রাজ্যগুলি আমাদের অধিকারে। জাঁহাপনা এখন ইচ্ছে করলে যখান থেকে সূর্য ওঠে, আর যেখানে গিয়ে সূর্য ডোবে—পূবে-পশ্চিমে যতদূর জাঁহাপনার মর্জি হয়, সেনাচালনা করতে পারেন।

আমীর খুশি হলেন। বললেন: যদি আমি ঠিক সূর্যের গতিপথ ধরে অভিযান চালাই তাহলে?

ওগারেক জবাব দিল: সূর্যের গতিপথ ধরে যাওয়ার অর্থ ইউরোপের দিকেই অভিযান চালানো। তাহলে সাইবেরিয়ার টবলস্ক শহর থেকে উরাল পর্বত পর্যন্ত জাঁহাপনার অধীন হবে অতি সহজে।

কিন্তু আমি যদি সূর্যোদয়ের দিক লক্ষ্য করে যাত্রা করি।

—তাহলে এই বিশাল সাইবেরিয়া তাতার-সাম্রাজ্যভুক্ত হবে। সুপ্রসিদ্ধ ইরকুটস্ক নগরীর পতন হবে। তাহলে জাঁহাপনা হবেন ধনজনপূর্ণ মধ্য-এশিয়ার একচ্ছত্র বাদশাহ্।

কেওতাই খান বললেন: কিন্তু জারের সেনাদল আমাদের বাধা দেবে। সে বাধাও সহজ হবে না, এ কথাটা ভেবে দেখো।

আইভান বলল : পূর্ব বা পশ্চিম কোন দিকেই জাহাঁপনার ভয়ের কারণ নেই। আমাদের আক্রমণ চলবে আকস্মিকভাবে—এবং তড়িৎগতিতে। রাশিয়ান সেনা আমাদের বাধা দেবার আগেই টবলস্ক বা টমস্ক জাহাঁপনার পদানত হবে। জারের সেনাবাহিনী কলিভানে যেমন ভাবে আমাদের হাতে বিধ্বস্ত হয়েছে, তেমনি সব যায়গায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।

আমীর ফেওফার খান মুহূর্তকাল কি ভাবলেন। পরে বললেন : তাহ'লে তাতারবাহিনীর ওপর তুমি কি আদেশ দিতে বল ?

আইভান তৎক্ষণাৎ বলল : আমার বিবেচনায় এখন পূর্বদিকে অগ্রসর হওয়া উচিত। পূর্ব-প্রান্তরের কচি ঘাস আমাদের ঘোড়াগুলোর ভোগে লাগুক। প্রাচ্যের রাজধানী ইরকুটস্ক নগরী—এই নগরী অধিকারের সঙ্গে সাইবেরিয়ায় রাশিয়ান আধিপত্যের পতন ঘটবে। রাশিয়ার অধিপতি জারের ভ্রাতা স্বয়ং গ্র্যাণ্ড ডিউক জাহাঁপনার পদানত হবে—প্রাণভিক্ষা চাইবে।

আইভান ওগারেফের বাক্যবাণ নিক্ষেপ ব্যর্থ হল না। আমীর বললেন : তবে তাই হোক, আইভান, তাই হোক।

আইভান জিজ্ঞেস করল : তা হ'লে তাঁবেদের হুকুম...

—এখনই শিবির উঠিয়ে দাও। আজই আমরা টমস্ক যাত্রা করব।

আইভান ওগারেফ দু'হাতে কুর্নিশ জানিয়ে আমীরের শিবির ত্যাগ করল।

আইভান ওগারেফ বেরিয়ে আসতেই হঠাৎ শোনা গেল এক তুমুল হট্টগোল। খানিক দূরে আমীরের বন্দীদের যেখানে আটক রাখা হয়েছিল, গোলমাল বেধেছিল সেদিকে। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজও শোনা গেল। সম্ভবত বন্দীদের কেউ পালাবার চেষ্টা করেছিল বা বিদ্রোহী হয়েছে। রক্ষীরা তাই বাধ্য হয়েছে গুলি চালাতে।

আইভান ওগারেফ তাড়াতাড়ি রক্ষীদের নিয়ে গেল সেদিকে। দুটি লোক তখুনি পাহারা ডিঙিয়ে ঠিক তার কাছে এসে দাঁড়াল।

আইভানের একজন রক্ষী কোন কথা না ব'লেই কি ইঙ্গিত করল। এই ইঙ্গিতের অর্থই গর্দানের আদেশ। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি তরবারি ঝনাৎ ক'রে শূন্যে উঠে গেল। কিন্তু আইভান ওগারেফ বাধা দিল হাত উঠিয়ে। এ বাধা না পেলে দেখা যেত এতক্ষণে দুটি ছিন্নশির মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

এই বন্দী দুজন আমাদের পরিচিত হ্যারি ব্লাউন্ট ও অ্যালসাইড জুলিভেট। এরা বিদেশী—বিশেষতঃ সাংবাদিক, এই হিসাবে মুক্তি পেতে পারে, এ দাবী জানাবার জন্যই তারা আইভান ওগারেফের কাছে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু

বন্দীরা তাতে বাধা দেয়। এই নিয়েই বাধে গোলমাল। কিন্তু আইভান ওগারেফ মাঝে এসে না পড়লে এতক্ষণে তাদের গর্দান চলে যেত।

ওগারেফ একবার বন্দী দুজনের দিকে তাকান। কিন্তু তাদের চিনতে পারল না। ইশিম স্টেশনে যখন মাইকেল স্ট্রগফ তার হাতে লাঞ্ছিত হয়, তখন ওরাও সঙ্গে ছিল। কিন্তু ওগারেফ তখন তার পশুপ্রকৃতি নিয়ে পথ পরিষ্কার করবার জন্যেই ব্যস্ত ছিল, সাধারণ পথের লোক ভেবে তাদের দিকে তেমন লক্ষ্য করেনি। কিন্তু হ্যারি ব্লাউন্ট ও অলসাইড জুলিভেট তাকে দেখেই চিনে ফেলল। জুলিভেট বন্ধুর কানে কানে বলল: হ্যালো, আইভান ওগারেফ আর ইশিমের সেই জানোয়ার, একই লোক দেখছি—না?

হ্যারি ব্লাউন্ট বলল: তাই তো। তবু ধন্য বল যে তারই জন্যে ঘাড়ে গর্দান এখনো ঠিক রয়েছে।

আইভান ওগারেফ জিজ্ঞেস করল: তোমরা কে?

হ্যারি ব্লাউন্ট সংক্ষেপে বলল: আমরা ইংরেজ এবং ফরাসী সাংবাদিক।

—পরিচয় সত্যি প্রমাণ করতে পার এমন কোন নথিপত্র আছে সঙ্গে?

রাশিয়ায় ইংরেজ এবং ফরাসী চ্যান্সেলারের অফিস থেকে নেওয়া পরিচয়পত্র সঙ্গে ছিল। হ্যারি ব্লাউন্ট ও অলসাইড জুলিভেট তাই বের করে দেখাল।

আইভান ওগারেফ কাগজ দুখানা উল্টে পাল্টে দেখল। পরে বলল: তোমরা কি চাও? খবর সংগ্রহের অনুমতি?

ব্লাউন্ট সবিনয়ে বলল: আমরা মুক্তি চাই—এই যথেষ্ট।

—বেশ তাই হবে। তবে ডেলী টেলিগ্রাফের পাতায় এই মুক্তি সম্পর্কে তোমার প্রবন্ধ পড়বার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম।

এবার হ্যারি ব্লাউন্ট বলল শান্তকণ্ঠে: স্যার, প্রতি সংখ্যার দাম ছয় পেনি—অবশ্য মাশুল সহ।

তারপর আইভান ওগারেফ অলসাইড জুলিভেটের দিকে ফিরে তাকাল। সেও মুক্তি পেল।

আইভান ওগারেফ আর দেরি না করে ঘোড়ায় চেপে দ্রুত চলে গেল সেনাদলের সম্মুখ দিকে। ধুলোবালির আবরণে আর তাকে দেখা গেল না।

হ্যারি ব্লাউন্ট বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল: হ্যালো মসিয়ে জুলিভেট, বলতো: কর্নেল ওগারেফ লোকটি কেমন?

—আমি ভাবছি কি—মাথায় হাত বুলিয়ে জুলিভেট হেসে বলল: কর্নেল ওগারেফের পার্শ্বচরটি কি সুন্দর ইঙ্গিতই না করেছিল। বেঁচে থাক্ গর্দান।

দুই বন্ধু একচোট হাসল।

হ্যারি ব্রাউন্ট বলল : যা হোক্ মুক্তি তো পেলাম। কিন্তু এই মুক্তির আনন্দ কি করে উপভোগ করবে শুনি ? এখন কি করবে ?

অলগাইড ফুলিডেট বলল : ওহো ! চল চল—এ সুযোগ নষ্ট করা যায় না। চুপচাপ চল এবার টমস্ক। সেখানে কি ঘটে গিয়ে দেখা যাক। দেখা যাক রাশিয়ার কোন সেনাদলে মিশতে পারি কি না।

হ্যারি ব্লাউন্ট বলল : বাস্তবিক। অসভ্য তাতারদের সঙ্গে থাকা পোষাবে না। সভ্য জাতির সঙ্গে মরাও ভাল। আমার বিশ্বাস কি জান, তাতার দল হেরে যাবে : তাদের বিদ্রোহ ব্যর্থ হবে। শেষ পর্যন্ত ওরা টিকতে পারবে না। অবশ্য সেটা সময়-সাপেক্ষ।

অন্য দিকে মাইকেল স্ট্রগফ। প্রতি মুহূর্তে তার বিপদের আশংকা। যদি কোন সময়ে আইভান ওগারেফ তাকে দেখতে পায়, তাহলে বিপদ ঘটবে। ইসিম স্টেশনে সে ভীষণ অপমান করেছিল—কিন্তু মাইকেল কিছুই বলেনি তাকে। এবার তাকে দেখলেই আইভান সন্দেহ করবে—কেন সে নির্বিবাদে অতটা সহ্য করেছে। সন্দেহ হবে—নিশ্চয়ই এমন কোন উদ্দেশ্য আছে যা বিফল হবার ভয়ে সে-সময়ে একটি কথাও সে বলেনি। বুঝবে—এ লোক নিশ্চয়ই গুপ্তচর।

কিন্তু তেমন কিছু ঘটবার আগেই ছাউনি উঠাবার হুকুম হল।

সেদিন ১২ আগস্ট, অপরাহ্ণ ২টা। অসহ্য গরম। মাথার ওপর ঝাঁ ঝাঁ রোদ। এমনি সময়ে বন্দীদলের যাত্রা সুরু হল।

আইভান ওগারেফের সেনাদলের প্রহরায় যে-সকল বন্দী ছিল, তাদের মধ্যে ছিল একটি অতিবৃদ্ধা রমণী। নীরবে মাথা গুঁজে সে চলেছে। মনে হয় অন্য কারও সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। একটা হা-হুতাশ শব্দও তার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে না। বিষাদের জীবন্ত প্রতিমা। তার ওপর রয়েছে বিশেষ রকমের পাহারা ; কিন্তু বৃদ্ধার লক্ষ্য নেই সেদিকে। জিপসী সাঙাদের সতর্ক দৃষ্টি বরাবরই তার ওপর, কিন্তু বৃদ্ধার মনে কোন সন্দেহই জাগেনি। অতি বৃদ্ধা রমণী—চলতে পা কাঁপে। তবু বাধ্য হয়ে চলেছে সবার পিছু পিছু অবসন্ন পা ফেলে।

কিন্তু বিধির বিচিত্র বিধান। বৃদ্ধার পাশে পাশে চলেছে একটি অল্পবয়সী মেয়ে। চেহারায় সাহসিকতার ছাপ, চোখে করুণা। সময় সময় সে বৃদ্ধাকে সাহায্য করছে। এমনি দুর্ভাগ্য নিয়ে সেও নীরবে শান্তভাবে পথ চলেছে বৃদ্ধার ওপর সতর্ক লক্ষ্য রেখে। বৃদ্ধার একটু অসুবিধে হোক কি—অমনি সে তাকে দু'হাতে ধরে কষ্ট লাঘব করবার চেষ্টা করে। কিন্তু এ পর্যন্ত কারও সঙ্গে কেউ

কথা বলেনি। একটি অপরিচিতা মেয়ের এমন অযাচিত সাহায্য-দান বৃদ্ধার মনে প্রথমে যে সন্দেহ জাগায়নি তা নয়, কিন্তু মেয়েটির কোমল করুণ দৃষ্টি এবং এমন দুঃসময়ে এমন নিগূঢ় সমবেদনা দেখে বৃদ্ধার মন গলে গেল।

এই বৃদ্ধা—মার্থা স্ট্রংক, আর মেয়েটি—নাদিয়া।

এমনিভাবে বৃদ্ধার সকল ভার নাদিয়া নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল নীরবে, মাইকেল স্ট্রংকও একসময়ে এমনিভাবে নিয়েছিল তার সকল ভার। কিন্তু এই বৃদ্ধাই যে মাইকেলের মা, তা সে জানত না। তবে বৃদ্ধার সেবার সুযোগ পাওয়ায় বন্দীদশার মাঝে অসভ্য তাতার সেনাদের রূঢ় আচরণ থেকে আত্মরক্ষার অবলম্বন সে খুঁজে পেয়েছিল। বৃদ্ধাটি যেন মেয়েটির ঠাকুরমা আর মেয়েটি তার পৌত্রী—দুঃখ-দুর্দশার তিক্ততার মাঝে যেন দুজন নির্বাক সমব্যথী। এই দুজনকে নিষ্ঠুর শত্রুর অন্তরেও করুণ প্রভাব তার জাগিয়ে তুলেছিল।

ইরতিশ নদীর দুর্ঘটনায় নাদিয়া তাতারদের হাতে বন্দিনী হয়ে ওমস্কে আসে। বন্দীশালায় অজস্র বন্দীদের মত সেও যখন দুর্ভাগ্য ভোগ করছিল, সে সময় একদিন বৃদ্ধা মার্থা স্ট্রংকের সঙ্গে তার দেখা।

নাদিয়ার সাহস ও মনের জোর ছিল অসাধারণ। পর পর এত দুঃখের আঘাতেও সে দমে যায় নি। তাতার সেনাদের নিষ্ঠুরতা দেখে সে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠল, জিদ বেড়ে গেল অসম্ভব রকম। তার চোখের ওপর কেবল ভাসে ইরতিশ নদীর দুর্ঘটনার ছবি: নৌকোর ওপর দণ্ডায়মান নির্ভীক মাইকেল আর শেষ দৃশ্য জলস্রোতে নিমজ্জন। একটা কথা মাত্র তার মনে হয় বারবার: এমন মানুষের মৃত্যু কি এই রকমের হয়? ভগবান যাকে এমন অদ্ভুত ক্ষমতা দিয়ে সংসারে পাঠান, এমন কর্তব্যবোধ নিয়ে যে-লোক পথ চলে, শত বাধা, শত বিপর্যয়ে যে অবিচল—অটল, ভগবান এমন লোকের মাথায় কি এমনভাবে মৃত্যুর আঘাত হানেন? এ সব কথা যখন সে ভাবে তখন শোক-দুঃখের ছবি ছাপিয়ে তার চোখে ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠে। ঠোঁট কামড়ে সে বলে ওঠে: এই অপমানের প্রতিশোধ সে-ই নিতে পারত! কিন্তু এখন কে এই প্রতিশোধ নেবে? তার অন্তর আর্তনাদ ক'রে উঠে। মন বলে: সে অপমানের শোধ নেব আমি। হায়, মাইকেল যদি তার গোপন-সঙ্কল্প তাকে জানাত? তাহলে সে যেমন করেই হোক, সে কর্তব্য-ভার নাদিয়া মাথায় তুলে নিত—ভ্রাতার অসম্পূর্ণ কাজ ভগিনী পূরণ করত।

ঘটনাক্রমে মার্থা স্ট্রংকের সঙ্গে নাদিয়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে সুন্দরভাবে। মাঝে মাঝে মার্থা বলে: এ বুড়ীর জন্যে তুমি যা করছ মা, ভগবান তার পুরস্কার দেবেন।

দিনের পর দিন কেটে যায়। এক-একটা দিন যেন এক একটা যুগ। শেষে এমন হয়ে দাঁড়াল যে, কথা বলার জন্তে দুজনেই উৎসুক হয়ে ওঠে। কিন্তু মার্কা স্টেপক খুবই সতর্ক—দু-একটি দরকারী কথা ছাড়া অতিরিক্ত কিছুই সে বলে না। ছেলের সঙ্গে যে তার দেখা হয়েছিল—আভাসে-ইঙ্গিতেও তা বুঝা গেল না।

কিন্তু নাদিয়ার মন একদিন উদ্বেল হয়ে উঠল। সে নিজের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস আর চেপে রাখতে পারল না। ভ্লাডিমির থেকে তার পথ-যাত্রা, পথের নানা বিপদ, ঘাত-প্রতিঘাত—এভাবে সে নিকোলাস কোর্পানফের জলে ঝাঁপিয়ে পড়া পর্যন্ত সবই ব'লে গেল একে একে। বৃদ্ধা মার্কা মেয়েটির কথা শুনল তন্ময় হয়ে। শুনে একান্ত অভিভূত হয়ে পড়ল।

নাদিয়া থামতেই মার্কা বলল: নিকোলাস কোর্পানফ! আহা! আবার বল মা তার কথা। এ জগতে আমি একটি মাত্র ছেলেকে জানি, যার মাঝে রয়েছে এমন অদ্ভুত ক্ষমতা, এমন মনের বল, এমন সাহস—ধৈর্য। নিকোলাস কোর্পানফ! মা, তুমি কি ঠিক জান যে তার নাম নিকোলাস?

নাদিয়ার মুখ কালো হয়ে গেল। বলল: কেন তুমি ওভাবে বলছ মা? আমার বিশ্বাস, সে আমাকে প্রতারণা করেনি—মিথ্যে পরিচয় দেয়নি।

এ কথায় মার্কা একটু দ'মে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, না মা, রাগ ক'রো না। তুমি বললে কিনা এমন সাহসী সে···

নাদিয়া বলল: হাঁ মা, অসম্ভব সাহস তার।

মার্কা মনে মনে বলল: আমার ছেলেও এমন দুরন্ত সাহসী। প্রকাশ্যে বলল: তুমি যে আরও বললে—বাধা-বিপত্তি তাকে দমাতে পারেনি,—কোন কিছুতেই সে অভিভূত হয়ে পড়ে না। অথচ তার মন ফুলের মত কোমল। তার মাঝে তুমি পেয়েছ ভাইয়ের স্নেহ মমতা, পেয়েছ ভগিনীর ভালবাসা—মায়ের মতো দরদ দিয়ে বিপদে সে তোমার রক্ষা করেছে···

—হাঁ মা, সত্যি! সে ছিল আমার ভাই, বোন, মা—আমার সব।

—তুমি না বলেছ—সিংহের মতো সে তোমাকে বিপদে রক্ষা করেছে?

হাঁ মা, সিংহের মতো! সে মহাবীর।

মার্কা চোখ বুঁজে মনে মনে উচ্চারণ করল—আমার ছেলে সে, আমার ছেলে। তারপর নাদিয়াকে বলল: কিন্তু তুমিই তো আবার বললে—ইশিম স্টেশনে সে দারুণ অপমান সহ্য করেছে···

নাদিয়া এবার একটু লজ্জিত হ'ল। মাথা হেঁট করে বলল: হাঁ মা···

এমন অপমান সে কী ক'রে হজম করল ? মার্থার গলার স্বর কেঁপে উঠল। শরীর কাঁপতে লাগল থরথর ক'রে।

নাদিয়া কেঁদে ফেলল : মা—মা, তাকে দোষ দিও না। ঘৃণা করো না তাকে। ভগবান জানেন কেন সে এতটা সহ্য করেছে।

—কিন্তু—মার্থা মাথা তুলে নাদিয়ার মুখের দিকে তাকাল এবং মনের ভাব বুঝবার জন্যে বলল : কিন্তু যে এমন অপমান হজম করল, তাকে তুমি ঘৃণা করো না ?

নাদিয়া দৃঢ়ভাবে বলল : ঘৃণা ! না মা, আমি তাকে শ্রদ্ধা করেছি।

মার্থা নির্বাক হয়ে গেল। পরে বলল : বেশ লম্বা শরীর তার—না ?

—হাঁ মা, বেশ লম্বা, বলিষ্ঠ।

—আর চেহারা খুব সুন্দর ? বল মা, তার খুব সুন্দর চেহারা ?

নাদিয়ার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল। বলল : হাঁ মা, বেশ সুন্দর দেখতে।

বৃদ্ধা আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না। গভীর আবেগে দু'হাতে সে নাদিয়াকে জড়িয়ে ধরল। বলল, বিশ্বাস করো মা, সে আমারই ছেলে। আমি বলছি—সে আমার ছেলে না হয়ে পারে না।

নাদিয়া চমকে উঠল। বলল : তোমার ছেলে ?

মার্থা চোখের জল মুছে বলল : হাঁ মা, তুমি আবার বলো—তোমার পথের সাথী, তোমার একান্ত সুহৃদ, তোমার বিপদের আশ্রয়—তার কথা পরিষ্কার ক'রে আমায় বল ! সে কি তার মায়ের কথা একটিবারও বলে নি ?

নাদিয়া বলল : হাঁ মা, ব'লত। আমি যখন আমার বাবার কথা বলতাম, তেমনি সেও তার মায়ের কথা ব'লত। প্রায়ই ব'লত মা এমনভাবে বলত যে তার চোখ জলে ভারি হয়ে উঠত।

—নাদিয়া, সত্যি ক'রে বল, যে মাকে সে এত ভালবাসে, তার সঙ্গে সে দেখা করবে বলেছে কি ?

—না মা, সে তো চায় নি।

মার্থা কেঁদে বলল বলল : তুমি কি সত্যিই জান যে সে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে চায় নি ?

—হাঁ মা, তাই। শোন মা, সব কথা এখনও তোমায় বলা হয়নি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম—কি একটা-ভার নিয়ে সে চলেছে। কিন্তু সে কর্তব্য যে কি, আমি আজও তা জানিনে। মনে হয়, সে কর্তব্য ছিল অতি গুরুতর,—মায়ের সঙ্গে দেখা করার চেয়েও তার গুরুত্ব ছিল ঢের বেশি। সে

অথচই সে গোপনে এই বিশাল প্রান্তর-পথে চলেছিল ইরকুটস্কের দিকে। তার সম্মুখে ছিল জীবন মৃত্যুর প্রশ্ন; কিন্তু তার ওপরে ছিল কর্তব্যের মর্যাদা।

কর্তব্য? কর্তব্যের মর্যাদা! যার কাছে মায়ের স্নেহ-ভালবাসা, স্নেহ-চুম্বনের আনন্দ—কিছুই নয়! মার্ফা কিছুক্ষণ নীরবে ভাবল। মনে পড়ল ওমস্কের সরাইখানায় ছেলের আচরণের কথা। কর্তব্যের দায়েই ছেলে মাকে এমনিভাবে অস্বীকার করতে পেরেছে। মনে মনে বলল: মাইকেল, বাবা আমার, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। আমি কখনও অবিশ্বাসিনী হবো না। শত নির্যাতন-পীড়ন আমাকে পারবে না টলাতে। জীবন গেলেও আমি স্বীকার করব না যে তুমি আমার ছেলে।

এ সময়ে একটি কথা বললেই বৃদ্ধা মার্ফা নাদিয়ার সকল ঋণ পরিশোধ করতে পারত। সে বলতে পারত যে নিকোলাস কোর্পানফ মাইকেল স্ট্রগফ ছাড়া আর কেউ নয়। নাদিয়ার ধারণা ইরতিশ নদীর দুর্ঘটনায় সে মারা গেছে। কিন্তু মার্ফা এখানে বলতে পারত, না সে বেঁচে আছে, ওমস্ক শহরে সে ছেলেকে দেখেছে।

কিন্তু মার্ফা আর কিছুই না বলে চুপ ক'রে রইল।

অনেকক্ষণ পরে মার্ফা বলল: মা নাদিয়া, ধৈর্য হারিও না—দুর্ভাগ্য কেটে যাবে দু'দিন পরে। তুমি তো তোমার বাবার কাছে যেতে পারবে। আমার কিন্তু মনে হয়, যে তোমাকে বোন বলে আশ্রয় দিয়েছিল—সে এখনও বেঁচে আছে। এমন ছেলেকে ভগবান এমন নিষ্ঠুরভাবে কেড়ে নিতে পারেন না কখনো। নিরাশ হয়ো না, মা, কথা শোন। আমার ছেলের জন্যে আর কোন দুঃখ নেই আমার।

কুড়ি

বন্দীরা চলেছে। হাজার হাজার বন্দী। তাদের মাঝে নানাজাতির লোক। অনেকেই সাইবেরিয়ান এবং রাশিয়ান সরকারী সেনা বা কর্মচারী। নিরীহ লোকের সংখ্যাও কম নয়। তারা চলেছে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে। কারও কারও হাতে বেড়ী, কোমরে শেকল। সাংঘাতিক দুর্দান্ত বলে তাদের প্রতি এই ব্যবস্থা। স্ত্রীলোক এবং শিশু-বন্দীও যে না ছিল তা নয়। অনেকের মত তাদের হাতেও ঘোড়ার মতো লাগাম বাঁধা। নিষ্ঠুর বন্দীদল। একদল বন্দীদের টানছে সম্মুখের দিকে, আর একদল পেছন থেকে এমনভাবে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে যেন হাঁকিয়ে চলেছে পশুপাল।

সকলের আগে যে দল চলেছে মাইকেল স্ট্রগফ ছিল সে-দলে; আর ওমরের বন্দীদের দলে ছিল বৃদ্ধা মার্ফা আর নাদিয়া। কাজেই কেউ কাউকে দেখতে পায়নি। চাবুকের ঘা, বল্লমের খোঁচা নির্বিচারে চলেছে।

এ দলের আগে আগে ছুটে চলেছে আমীরের সেনাদল—ফলে ধুলো-বালিতে পেছনের বন্দীদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে।

মরুময় পথ। মাথার ওপর কড়কড়ে রোদ। অবিশ্রাম পথ চলা। অকল্পনীয় পথশ্রম আর নিদারুণ পিপাসা। বন্দীদের সেদিকে লক্ষ্য নেই; ফলে শত শত বন্দী মারা যেতে থাকে ছাতি ফেটে। মৃতদেহ প'ড়ে থাকে পথে-প্রান্তরে।

একদিকে নাদিয়া এবং অপর দিকে মাইকেল স্ট্রগফ। নাদিয়া বৃদ্ধা মার্ফার অবলম্বন—তারই সাহায্যে সে কোনরকমে পথ চলেছে। আর একদিকে মাইকেল সুযোগ মতো তার সহযাত্রীদের সাহায্য করতে করতে এগোতে থাকে; মাঝে মাঝে সে তাদের উৎসাহ দেয়। কেউ হয়ত প'ড়ে যাচ্ছে, মাইকেল অমনি দুহাতে ধ'রে তাকে দাঁড় করিয়ে দেয়।

শেষ-বেলায় বন্দীদল টম নদীর মোহনায় যাবেডিয়ারো গ্রামে এসে পৌঁছোয়। টমস্ক শহর আরও ত্রিশ ভার্স্ট দূরে। এখান থেকে একটা বড় রাস্তা চ'লে গেছে শহরে।

জল দেখে বন্দীরা পাগল হয়ে উঠল। তারা যেন একযোগে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু রক্ষীদল তাদের দৃঢ়ভাবে আটকে রাখে।—বন্দীরা কিছুতেই সারি ভাঙতে পারবে না। নদীর স্রোত তীরের মতো বেগে ছুটেছে। পাছে কোন দুরন্ত দুঃসাহসী বন্দী নদীতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে পালাবার চেষ্টা করে, এই আশঙ্কায় আগে থেকেই সেনাগণ সতর্ক হয়েছিল। গ্রামে যত নৌকো ছিল, সব এনে তাতার সেনারা নদীর ধারে সারি সারি বেঁধে রেখে পালাবার পথ বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। গ্রামের শেষভাগে শিবির ফেলে সেখান থেকে কড়া পাহারাও বসান হয়েছিল।

নদীর জলস্রোতে চুপি চুপি ডুব দিয়ে পালাবার কল্পনা মাইকেলের মনেও যে না জেগেছিল তা নয়। কিন্তু অবস্থা দেখে সে নিজেকে দমিয়ে রাখল।

আমীরের হুকুম হয়েছে বন্দীদল ও সেনাদল যাবেডিয়ারোতে এখন অপেক্ষা করুক; তাতার সেনাদল খুব ঘটা ক'রে নগরে ঢুকবে—এই তার ইচ্ছে।

আইভান ওগারেফ আমীরকে টমস্ক শহরে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এল শিবিরে। এখান থেকে পরদিন সেনাদল নিয়ে ধুমধাম করে শহরে যাওয়া হবে।

আমীর তাদের অভ্যর্থনা করবেন এশিয়ার বাদ্‌শাহদের বংশানুক্রমিক কায়দায়।

কিছুক্ষণ হ'ল সূর্য ডুবেছে পশ্চিম আকাশে। পথশ্রমে বন্দীদল ক্লান্ত, পিপাসায় তাদের তালু ফেটে যাবার মতো। হঠাৎ খানিক বিশ্রাম ও জলপান করবার অনুমতি পেয়ে তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। নাদিয়াও ভিড় ঠেলে অতিকষ্টে জলের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় মার্ফাকে নিয়ে।

বৃদ্ধা জলের ওপর ঝুঁকে পড়ল। নাদিয়া দু'হাতে আঁজলা পুরে তাকে জলপান করাল। তারপর সে নিজেও ঠাণ্ডা হ'ল জল খেয়ে। মনে হল, এক মুহূর্ত তাদের দেহে নূতন জীবন ফিরে এসেছে।

সোজা হয়ে দাঁড়াতেই নাদিয়া কি দেখে চেঁচিয়ে উঠল। কয়েক পা দূরেই মাইকেল স্ট্রগফ দাঁড়িয়ে। গোধূলি আকাশের রাঙা আভা তখন তার শ্রান্ত দেহের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে।

নাদিয়ার এই আকস্মিক চীৎকারে চমকে উঠল মাইকেল। ফিরে দেখল— কিছুদূরে তার স্নেহময়ী মা আর নাদিয়া। অদ্ভুত আকস্মিক মিলন! মাইকেল বুঝতে পারল, এ অবস্থায় নিজেকে সামলে রাখা প্রায় অসম্ভব। তাই সে দু'হাতে চোখ-মুখ বন্ধ ক'রে দ্রুত পা চালিয়ে সেখান থেকে স'রে পড়ল।

নাদিয়ার অন্তর উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার ইচ্ছে হ'ল, এখনি ছুটে যায় মাইকেলের পেছনে। কিন্তু বাধা দিল বৃদ্ধা মার্ফা। কানে কানে বলল : থাম মা, পাগল হয়ো না।

—মা—মা!—উচ্ছ্বসিত আনন্দে নাদিয়া চেঁচিয়ে উঠল। : সে বেঁচে আছে মা—সে বেঁচে আছে।

—হাঁ মা, ঐ তো আমার ছেলে স্ট্রগফ। কিন্তু দেখ, মা হয়েও আমি এক পা এগোব না। তুমিও যেয়ো না মা।

মাইকেলের মনেও তখন উত্তেজনার তুমুল ঝড় চলেছে। তার মা আর নাদিয়া— তারাও এখানে! দুজনেই বন্দিনী। ভাগ্য-বিপর্যয়ে আজ সেও বন্দী। আশ্চর্য! দুজনেই অতি আপন। অথচ একই জায়গায় ভগবান তাদের মিলিয়ে দিয়েছেন। তা হ'লে নাদিয়া জেনেছে তার আসল পরিচয়? সে লক্ষ্য করেছে নাদিয়ার প্রতি তার মায়ের ইঙ্গিত। নতুবা সে নিশ্চয় ছুটে আসত।

মাও তাহ'লে সব বুঝতে পেরেছেন—তাই তার এত সতর্কতা! প্রতি মুহূর্তে

মাইকেলের ইচ্ছা হয়, মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে। কিন্তু বিবেক বাধা দেয় বারবার। ক্ষণেকের অসতর্কতা হয়ত বিরাট ক্ষতি ঘটাতে পারে।

এ ব্যাপারের প্রায় পনের মিনিট পর। জিপসী শাচারে আইভান ওয়ালেকের শিবিরে গিয়ে হাজির হ'ল।

আইভান জিজ্ঞেস করলে: কি খবর শাচারে?

শাচারে বলল: মার্কা স্ট্রংয়ের ছেলে এই বন্দীদলে লুকিয়ে আছে।

আইভান সচকিত হয়ে বলল: সে কি বন্দী?

হাঁ।

আইভান বলল: ওহো, আমি জানি...

শাচারে কথায় বাধা দিল। বলল: তুমি কিছুই জান না আইভান। তুমি তাকে দেখলেও চিনতে পারবে না।

—কিন্তু তুমি যখন তাকে চিনতে পারবে, তখন আর ভাবনা কি? তুমি তো দেখেছ শাচারে?

—না, আমিও দেখিনি তাকে। কিন্তু মার্কা স্ট্রংয়ের ভাব-ভঙ্গি দেখে আমি সবই জেনে ফেলেছি

আইভান সন্দেহের সুরে বলল: কোন ভুল হয়নি তো?

—না, আইভান, আমি ভুল করিনি।

—কিন্তু তুমি যে বললে তাকে দেখনি। তাহ'লে হাজার হাজার বন্দীর ভেতর থেকে কি ক'রে তাকে খুঁজে বের করবে?

শাচারে আইভান ওয়ালেকের দিকে চোখ তুলে তাকাল। তার দৃষ্টিতে ফুটে উঠল ক্রুর আনন্দের আভা। বলল: সত্যি আইভান, আমি চিনিনে সে ছেলেটিকে। কিন্তু তার মা তো তাকে চেনে? ঐ বুড়ীকে দিয়েই কাজ উদ্ধার করতে হবে। দেখ পারি কি না!

আইভান ওয়ালেকের মুখেও ক্রুর হাসি ফুটে উঠল।

পরদিন, ১৬ই আগস্ট।

আইভান ওয়ালেক একদল সেনা নিয়ে অগ্রসর হ'ল বন্দীশালার দিকে। তার চেহারা অস্বাভাবিক মলিন—বিমর্ষ, চাহনি কুঞ্চিত—একটা নির্দয় রোষ যেন চাপা প'ড়ে আছে।

মাইকেল স্ট্রগফ বন্দীদলের ভেতর থেকে সতর্কভাবে সবই লক্ষ্য করছিল। সে এবার বুঝতে পারল—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এল, এখুনি ঝড় উঠবে।

আরও একটু এগিয়ে আইভান ওগারেফ ঘোড়া থেকে নামল। আর পার্শ্বরক্ষীদল অনেকদূর জায়গা নিয়ে দাঁড়াল তাকে ঘেরাও ক'রে।

এই সময়ে জিপসী সাঙারে দেখা দিল সেখানে। আইভান আগ্রহভরে তার মুখের দিকে তাকাল।

সাঙারে বলল: নোতুন খবর কিছু নেই।

ওগারেফের মুখ সহসা আরও বিমর্ষ দেখাল। প্রত্যুত্তরে সে ইঙ্গিত করল একজন অফিসারকে।

গোলমাল প'ড়ে গেল বন্দীদলের মাঝে। এরই মধ্যে সেনাদল তাদের ওপর নির্মমভাবে চড়াও হয়েছে—হিংস্র পশুপাল যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভেড়ার বাথানে। নিদারুণ চাবুক আর বর্শার খোঁচায় জর্জরিত ক'রে তারা অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের দাঁড় করিয়ে দিল শ্রেণীবদ্ধভাবে। সামনে পেছনে দাঁড়াল অশ্বারোহী ও পদাতিক রক্ষীদল। কোনদিকে এক পাও আর নড়বার যো রইল না বন্দীদের।

গোলমাল থেমে গেল ক্রমে। আইভান ওগারেফের ইঙ্গিত পেয়ে জিপসী সাঙারে এগিয়ে গেল—যেখানে মার্ফা স্ট্রগফ রয়েছে সেদিকে।

বৃদ্ধা মার্ফা একবার নাদিয়ার দিকে তাকাল। সে বুঝতে পারল—সময় ঘনিয়ে এসেছে। মার্ফার চোখে মুখে একটা অবজ্ঞার হাসি। ঘাড় ঘুরিয়ে সে নাদিয়াকে বলল: মা, মনে করো যে, তুমি আমাকে চেনো না—কোনদিনও আমাদের মাঝে কোন পরিচয় ছিল না। এখুনি হয়ত দারুণ অবিচারের ঝড় উঠবে। সে ঝড় যত প্রচণ্ডই হোক টুঁ শব্দটি যেন তোমার মুখ দিয়ে না বেরোয়। মনে রেখো, এ আমার জন্যে নয়, এর ওপর নির্ভর করে আমার ছেলের জীবন।—তোমার আশ্রয়দাতার জীবন।

সাঙারে এগিয়ে এসে মার্ফার ঘাড়ের ওপর হাত রাখল। বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করল: কে মা? আমাকে কিছু বলছ?

জিপসী সাঙারে কটাক্ষ ক'রে বলল: হাঁ, এদিকে এসো—ব'লেই সে বৃদ্ধা মার্ফাকে টেনে নিয়ে গেল আইভান ওগারেফের কাছে। আইভান ওগারেফ মার্ফাকে দেখেই রাগে ঠোঁট কামড়াতে লাগল। জিজ্ঞেস করল: তোমারই নাম মার্ফা স্ট্রগফ?

—হুঁ।—বৃদ্ধা শান্তভাবে জবাব দিল।

—মনে পড়ে তিন দিন আগের কথা? ওমস্ক শহরে তুমি যা বলেছিলে, এবার তা প্রত্যাহার করবে তা হ'লে?

—না।—মার্ফা'র কণ্ঠস্বর এবার আরও দৃঢ় হয়ে উঠল।

—তোমার ছেলে মাইকেল স্ট্রগফ রাশিয়ার রাজদূত। এ খবর তুমি জান?

—না, জানি না।

—তুমি কি বলতে চাও, ওমস্ক শহরে যাকে তুমি আপন ছেলে ব'লে মনে করেছিলে, সে তোমার ছেলে নয়?

—না। সে আমার ছেলে নয়।

—যদি তাকে আবার দেখিয়ে দেওয়া যায় তাহ'লে চিনবে কি?

—না।

কর্ণেলের মুখের ওপর এমন দৃঢ় জবাব শুনে সেখানে যারা ছিল সবার মুখে মুখে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন উঠল। সবাই বুঝতে পারল—বৃদ্ধা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কোন কথাই সে বলতে রাজী নয়।

মুহূর্তে একটা দারুণ রোষ প্রকাশ পেল আইভান ওগারেফের অঙ্গভঙ্গিতে। বৃদ্ধার ওপর একটা কুটিল দৃষ্টি হেনে বলল:

—শোন বুড়ী, তোমার ছেলে এই বন্দীদলে লুকিয়ে আছে। এক্ষুণি দেখিয়ে দিতে হবে তাকে।

—না, অসম্ভব।

এখনো ভেবে দেখ। বন্দীরা সব সার বেঁধে দাঁড়াবে তোমার সামনে। তুমি দেখিয়ে দেবে মাইকেল স্ট্রগফকে। যদি না দেখাতে পার, তা হ'লে প্রস্তুত হও, কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে তোমাকে। এক-একজন বন্দীকে তোমার সম্মুখ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে—আর সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে চাবুক মেরে অপমান করা হবে।

বৃদ্ধা নীরব—অবিচল। তার মুখে ভয়ের কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

আইভান ওগারেফ বুঝতে পারল—লাঞ্ছনা পীড়ন যতই কঠোর হোক, এই সাইবেরিয়ান রমণীর সাহস অদমনীয়, কোন কথাই সে বলবে না। এখন এমন একটা ব্যবহার করতে হবে, যাতে মাইকেল স্ট্রগফ নিজেই এসে ধরা দেয়। মায়ের চোখের সামনে দিয়ে যদি ছেলেকে নিয়ে যাওয়া যায়, তা হ'লে মা ও ছেলের হাবভাবে স্বভাবতই একটা মনের আবেগ প্রকাশ পাবে—এ তার চোখ

এড়াতে পারবে না নিশ্চয়। অবশ্য মহামান্য জারের যে প্রয়োজনীয় চিঠি সে নিয়ে চলেছে, তা পাবার জন্তেই আইভান ওগারেকের এত চেষ্টা। এ ক্ষেত্রে সে প্রত্যেকটি বন্দীর দেহতল্লাসী করার হুকুমই দিতে পারত। কিন্তু সে ভাবল, মাইকেল তার মতলব বুঝতে পেরে আগেই যদি চিঠিখানা নষ্ট করে ফেলে? তা হ'লে চিঠিও পাওয়া যাবে না, আর সেই চিঠির বাহক কে তাও জানা যাবে না। ফলে আইভান ওগারেকের এত আয়োজন এত চেষ্টা সবই বিফল হয়ে যাবে। সেই চিঠি এবং চিঠির বাহক দুই-ই তার প্রয়োজন।

আইভান ওগারেক বন্দীদের এক-একজন ক'রে মার্ফার সামনে দিয়ে নিয়ে যাবার আদেশ দিল। মার্ফা স্ট্রগফ অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে রইল—যেন নিশ্চল পাথরের মূর্তি। চোখে উদাসীন দৃষ্টি। চেহারায় সামান্ত পরিবর্তনও দেখা গেল না।

তারপর এল ছেলের পালা। মাইকেল এগিয়ে এল। নাদিয়া দু'চোখ বুঁজে নিজেকে অতি-কষ্টে সামলে রাখল।

মাইকেল স্থির-চিত্ত। চেহারায় নির্বিকার ভাব। পদক্ষেপে দৃঢ়তা। হাতদুটি দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ। ধীরভাবে সে এগিয়ে গেল।

মা ও ছেলের এই অদ্ভুত দৃঢ়তা জয়ী হ'ল। আইভান ওগারেকের উদ্দেশ্য গেল ব্যর্থ হয়ে।

আর যে-সব বন্দী ছিল—সবাই চ'লে গেল এমনি ভাবে। কিন্তু জিপসী সাঙারের আর সহ্য হ'ল না। তীব্রকণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল: চাবুক···

—হাঁ-হাঁ, ঠিক বলেছ: অধীর উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল আইভান ওগারেক। এই অসভ্য ডাইনীটাকে মার চাবুক। এমন ভাবে মার যেন পৃথিবীর আলো সে আর দেখতে না পায়।

ভয়ঙ্কর চাবুক। চামড়ার সরু সরু ফালি একত্রে জড়িয়ে তৈরী। প্রত্যেকটি ফালির মাথায় শক্ত ক'রে যোড়ানো ইস্পাতের সূক্ষ্ম তার। এককালে রাশিয়ায় গুরুতর অপরাধীর চরমদণ্ড দেওয়া হ'ত এই রকম চাবুকের আঘাতে। একশত চব্বিশটা আঘাতই ছিল মৃত্যুদণ্ডের সামিল।

বৃদ্ধা মার্ফার তা ভালরকমই জানা ছিল। কিন্তু তার চেয়েও সে বেশি জানে—যে কোন রকম পীড়নই হোক, কিছুই তাকে টলাতে পারবে না—ম'রে গেলেও না।

দু'জন রক্ষীসেনা মার্ফার দু'হাত খপ করে চেপে ধরল, এবং জোর ক'রে তাকে বসিয়ে দিল হাঁটুর ওপর। গায়ের জামা টেনে ছিঁড়ে পিঠ অনাবৃত ক'রে দিল। তার বুকের সামনে সামান্ত ব্যবধানে রাখা হ'ল একটা ধারাল

তরবারির ফলা। চাবুকের আঘাতে একটু নুয়ে পড়লেই বুকে আমূল বিঁধে যাবে।

একটি তাতার-ঘাতক চাবুক হাতে নিয়ে কেবল হুকুমের অপেক্ষা করছিল; আইভান রূঢ়কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল: লাগাও।

ঘাতক সজোরে চাবুক উঠাল। বাঁশির শিসের মতো হিস্ করে শব্দ হ'ল বাতাসে।

কিন্তু চাবুক নেমে আসবার আগেই ঘাতকের হাত যেন অবশ হয়ে গেল। আর একটা সবল হাত তৎক্ষণে তার হাত চেপে ধরেছে।

মাইকেল স্ট্রগফ সেখানে ছিল। সে ঝাঁপিয়ে পড়ল এই ভয়ঙ্কর অবস্থায়। একদিন ইশিম স্টেশনে বিশ্বাসঘাতক আইভান ওগারেফের নিদারুণ আঘাত সে নীরবে সহ্য করেছিল, কিন্তু আজ চোখের সামনে স্নেহময়ী জননীর অবমাননা আর অপমানের আঘাত উদ্যত দেখে সে কিছুতেই নিজেকে সামলে রাখতে পারল না।

এবার আইভান ওগারেফের উদ্দেশ্য সফল হ'ল। চীৎকার ক'রে বলল: তুমিই মাইকেল স্ট্রগফ!—তারপর দু' পা এগিয়ে এসে বলল: ও, তুমি সেই ইশিমের লোক—না?

—হাঁ, সে-ই আমি।

বলার সঙ্গে সঙ্গে মাইকেল হাত ঘুরিয়ে নিল। হিস্-স্ করে বিদ্যুদ্বেগে চাবুকের প্রচণ্ড ঘা এসে পড়ল আইভান ওগারেফের মুখের ওপর।

—আঘাতের বদলে আঘাত!—মাইকেল মুখ তুলে বলল।

সঙ্গে সঙ্গে পেছনে কে ব'লে উঠল: চমৎকার প্রতিশোধ।

এই আকস্মিক ব্যাপারে একটা দারুণ হৈ চৈ প'ড়ে গিয়েছিল। কাজেই বোঝা গেল না, কে এই কথা বললে। নতুবা কি হ'ত, তা না বললেও চলে।

সৈন্যদল ঝাঁপিয়ে পড়ল মাইকেলের ওপর। কয়েকখানি তরবারি তার মাথার ওপর সহসা ঝুলে পড়ল।

চাবুকের মার খেয়ে দারুণ যন্ত্রণায়, অপমানে আর ক্রোধে ওগারেফ চেঁচিয়ে বলল: থাম—থাম। এর বিচার আমীর নিজে করবেন। লোকটির দেহ খুঁজে দেখ কি আছে সঙ্গে।

মাইকেল নিরুপায়। মহামান্য জারের চিঠি বেরিয়ে পড়ল জামার আস্তিন থেকে। কিছুতেই সে তা ছিঁড়ে ফেলার সুযোগ পেল না।

রাজকীয় চিঠি আইভান ওগারেফের হাতে পড়ল।

ওদিকে অলসাইড জুলিভেট ও হ্যারি ব্রাউন্ট টমস্ক শহরে ঢুকতে পারেনি। কাজেই তারা বাবেডিয়ারো ক্যাম্পেই চুপি চুপি অপেক্ষা করছিল।—চমৎকার প্রতিশোধ—এ কথা বলেছিল অলসাইড জুলিভেট।

কিছুক্ষণ পরে অলসাইড জুলিভেট বন্ধুকে চুপি চুপি বলল: লোকগুলো কি জানোয়ার দেখেছ? যা হোক আমাদের পথের সঙ্গীটিকে বাহবা না দিয়ে পারি না। কোর্পানফ বা মাইকেল স্ট্রগফ যাই বল, উপযুক্ত লোক বটে সে। ইসিমের ব্যাপার আর কতটুকু? কিন্তু কড়ায় গণ্ডায় সে প্রতিশোধ নিয়েছে।

—বাস্তবিক। আমাদের কাগজের পক্ষে এ একটা চমৎকার খবর।

অলসাইড বলল: কর্ণেলের মুখের দিকে চেয়ে দেখ না একবার—গালটা কেটে কেমন ফুটিফাটা হয়ে গেছে? আবার কেমন গুমরাচ্ছে দেখ।

আইভান ওগারেফের সারা গাল বেয়ে তখনও টপ্ টপ্ করে রক্ত ঝরছিল। বাঁ হাতে একবার মুছে নিয়ে চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগল খুব মনোযোগ দিয়ে। মনে হ'ল, এ চিঠির ভাষার ভেতর থেকে কি এক গুরুতর সংবাদ যেন সে খুঁজে বের করতে চায়।

তারপর টমস্ক যাত্রার আদেশ।

সজোরে শিঙা বেজে উঠল। মাইকেলের আগে ও পেছনে সশস্ত্র পাহারা। তার হাতে-পায়ে শিকল-বন্ধন। এ অবস্থায় সেও চলতে লাগল টমস্ক অভিমুখে।

একুশ

১৬০৪ খৃস্টাব্দে টমস্ক শহরের পত্তন হয়। বিরাট সাইবেরিয়া দেশের ঠিক মাঝপথে এই শহর। একদিকে টবলস্ক অপরদিকে ইরকুটস্ক—এই দুইটি বিখ্যাত নগরের প্রভাবেই এই শহরটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

টমস্ক এশিয়াটিক রাশিয়ার একটি সমৃদ্ধ শহর হ'লেও কোন রাজধানী-শহর নয়। তবু নানা কারণে এ স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চারদিকে বিশাল আলতাই পর্বতশ্রেণী। তারই এক শাখা চীন-সীমান্ত পেরিয়ে খালকাস রাজ্যে গিয়ে মিশেছে। পর্বতের শিখর থেকে নেমে এসেছে টম নদী। নিম্ন-দেশে টম নদীর তীর থেকে বহুদূরবিস্তৃত সমতলভূমি। সোনা, রূপা, প্ল্যাটিনাম প্রভৃতি বহুমূল্য খনিজ সম্পদ্ এখানে প্রচুর। ভূমির ঐশ্বর্যে নগরের ঐশ্বর্য। কাজেই ঐশ্বর্যের দিক দিয়ে ইউরোপের যে-কোন বড় রাজধানীর সঙ্গে এ শহরের তুলনা চলতে পারে। লক্ষপতি কোটিপতি লোকের বাস এখানে।

অবশ্য খনির দৌলতেই তারা লক্ষপতি কোটিপতি হয়েছে। এই রাজ্যের খনিজ সম্পদের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক যিনি তিনিও এখানে বাস করেন।

এই টমস্ক শহরে আমীর কেওকার খান নিজে বিজয়ী সেনাদের অভ্যর্থনা জানাবেন। শহরের বাইরে টম নদীর তীরে বিস্তৃত পাহাড়ে বালভূমি। প্রাচ্যদেশের রুচি অনুযায়ী সমারোহের আয়োজন হয়েছে। সেখানে চলেছে অবিরাম নাচগান। পান-ভোজনের ঘটাও চলেছে অবাধে। অদূরে টমস্ক শহর। সুদৃশ্য প্রাসাদ ও গীর্জার সব যে চূড়ো আকাশ ছুঁড়ে উঠেছে। নদীস্রোত আঁকাবাঁকা হয়ে মিলিয়ে গেছে বহুদূরে। ভোরের কুয়াশায় নগরের দৃশ্য পটে-আঁকা পাইন ও দেবদারু বনের মতো দেখাচ্ছে।

বালভূমির ওপর এক উঁচু জায়গায় সাময়িকভাবে উঠেছে এক সুন্দর প্রাসাদ। এই প্রাসাদে আমীরের দরবার বসবে। আমীরের সঙ্গে থাকবে পারিষদবর্গ, সম্ভ্রান্ত অতিথি আর দেহরক্ষীদল। দ্বারে দ্বাররক্ষী। তাদের কোমরে বাঁকা তলোয়ার ও ছুরিকা ঝকমক করছে। হাতে সুদীর্ঘ বর্শা।

এই বিশাল সমারোহে দেখা গেল বহু রকমের লোক। উজবেক সেনাদল সেখানে ছিল। মাথায় কালো চামড়ার লম্বাটে টুপি। গালভরা পিঙ্গলা দাড়ি। ধূসর চোখ। সেখানে ছিল অসংখ্য তাকোমান। পরণে রং-বেরং-এর বাহারে পোশাক। মাথায় লাল টুপি। কোমরে রশি দিয়ে বাঁধা ছুরিকা। তা ছাড়া সেখানে ছিল মোঙ্গলীয়, পারশিয়ান, তুর্কি, চীনা—আরও বহু জাতি। তারা সবাই আমীরের আহ্বানে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে।

ভোরবেলায় দামামা বেজে উঠল। সেনাদলে শোনা গেল জয়ধ্বনি। সুসজ্জিত ঘোড়ায় চ'ড়ে আমীর কেওকার খান চলেছেন প্রাসাদের দিকে। দু'পাশে সশস্ত্র রক্ষীদল। সম্ভ্রান্ত কর্মচারীরা এগিয়ে এসে দু'হাতে কুর্নিশ জানিয়ে নিয়ে গেল ভেতরে।

আমীরের রত্ন-আসন। তারই সম্মুখে একটি সাজানো টেবিলের ওপর রাখা হয়েছে পবিত্র কোরান গ্রন্থ। আমীর আসনে বসবার আগে চোখ বুঁজে দু'বার কোরানে মাথা ঠেকালেন।

অল্পক্ষণ পরেই আইভান ওগারেফ সেখানে এসে পৌঁছুল। তার আগমন ঘোষিত হল তূরিভেরীর উচ্চ রবে। এবার তার পরণে নূতন পোষাক। তাতার সেনাধ্যক্ষের বেশ। মাথায় তাতার দেশীয় টুপি। চাবুকের প্রহারে তার কপাল থেকে গাল অবধি নিদারুণভাবে কেটে গিয়েছিল। ভোরের আলোয় সেই ক্ষতচিহ্ন দেখাচ্ছিল আরও ভীষণ।

আমীর শান্তভাবে তাকে অভ্যর্থনা করলেন।

এ সময়ে দুই বন্ধু হ্যারি ব্লাউন্ট ও অলসাইভ জুলিভেট সংবাদ-সংগ্রহের ফিকিরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সেখানে। যাবেডিয়ারো থেকে সেনাদল রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গে তারাও রওনা হয়ে আগে-ভাগেই সেখানে এসে পৌঁছেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল,—যেমন ক'রেই হোক চেষ্টা ক'রে দেখবে—তাতার দল ছেড়ে রাশিয়ার সেনাদলে মিশতে পারে কি না। এবং সম্ভব হ'লে ইরকুটস্ক পর্যন্তও তারা যেতে রাজি। এ পর্যন্ত বিদ্রোহী দলের নৃশংস কাণ্ডকারখানা সবই তারা দেখেছে। দেখেছে তারা ভীষণ অগ্নিদাহ, দেখেছে অবাধ লুণ্ঠন আর দেখেছে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড। দেখে দেখে হাঁপিয়ে উঠেছে তাদের মন। কাজেই এই একঘেয়ে অমানুষিকতা এড়িয়ে মিত্রপক্ষের দলে মিশবার জন্যে তারা ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিল।

অলসাইভ জুলিভেট বন্ধুকে বলল: যাই বলো—আইভান ওগারেফের অভ্যর্থনার ঘটা না দেখে যাওয়া যায় না।

বন্ধুর কথায় হ্যারি ব্লাউন্টেরও আপত্তি ছিল না। স্থির হ'ল, কয়েক ঘণ্টা এখানে অপেক্ষা ক'রে শেষবেলায় আবার রওনা হবে আমীরের সেনাদলকে পেছনে রেখে ইরকুটস্কের দিকে।

দু'বন্ধুই আমীর ফেওফার খানের অদ্ভুত জাঁকজমকে চমৎকৃত হ'ল। সৈনাসামন্ত ও রক্ষীদলের তৎপরতা এবং এই প্রাচ্যদেশের সমারোহ-উৎসবের সুন্দর রুচির প্রশংসা করল মনে মনে। কিন্তু আইভান ওগারেফ যখন এসে পৌঁছুল, তখনই তারা বিরক্ত হয়ে আড়ালে স'রে গিয়ে উৎসব আরম্ভের অপেক্ষা করতে লাগল অধীরভাবে।

অলসাইভ জুলিভেট বলল: গোবেচারা দর্শকের মতো আগে-ভাগেই এসে পড়েছি—না বন্ধু! এখন দেখছি, আরও পরে ঠিক পর্দা উঠবার সঙ্গে সঙ্গে এলেই ভাল হ'ত। তা হ'লে অভিনয়টাও বেশ উপভোগ করা যেত। কি বল?

—অভিনয়?—আশ্চর্য হয়ে বলল হ্যারি ব্লাউন্ট।

—হাঁ, অভিনয় বৈকি—নিশ্চয় অভিনয়! চুপ—চুপ এখনই পর্দা উঠবে।

অলসাইভ জুলিভেট এমনভাবে কথাগুলো ব'লে গেল—যেন সে রঙ্গমঞ্চে এসেছে অভিনয় দেখতে। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে চশমা বের ক'রে চোখে প'রে নিল এবং এমন ভাব দেখাল যে, সে একজন উৎসুক দর্শক—প্রথম অঙ্কের আরম্ভ দেখবার জন্যে অতিশয় উদ্‌গ্রীব।

প্রথম দৃশ্য অতি করুণ এবং বিষাদের। পরাজিতের ওপর বিজয়ী সেনার প্রকাশ্য অপমান—এই যেন জয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা। হাজার হাজার বন্দীর ওপর তখনও চলেছে চাবুক আর বর্শার খোঁচা। তারা হয়ত অন্ধ গারদখানার

প'চে মরবে, হয়ত কারও গর্দান যাবে, তবু তাদের প্রকাশ্যভাবে অধীনতা মানতে হবে, আমীরের সম্মুখে মাথা নুইয়ে বলতে হবে,—দীন দুনিয়ার মালিক, অধীনের গোস্তাকী মাপ করুন।

প্রথম সারিতে ছিল মাইকেল স্ট্রগফ। আইভান ওগারেফের আদেশ মতো একদল সৈনিক তাকে ঘিরে রেখেছিল। বৃদ্ধা মার্ফা'ও ছিল সেখানে। কিন্তু নিজের বিপদ আসন্ন বুঝেও সে এ পর্যন্ত বিচলিত হয়নি। কিন্তু এ সময়ে তার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল আশঙ্কায়—কি জানি কি শোচনীয় ব্যাপার ঘটবে তার চোখের ওপর। ছেলের জন্যে মায়ের প্রাণ দুরুদুরু কেঁপে উঠল। আইভান ওগারেফ এমন লোক নয় যে ক্ষমা চাইলেও সে ক্ষমা করবে। মাইকেল প্রকাশ্যভাবে তার মুখের ওপর এমন চাবুক মেরেছে, এর প্রতিশোধ সে নেবেই নেবে। এবং নেবে অতি নিষ্ঠুরভাবে। মধ্য-এশিয়ার অসভ্যদের মাঝে অমানুষিক শাস্তির যে-রকম বিধান আছে তাই এখন বর্ষিত হবে মাইকেলের মাথায়। এই জন্যেই আইভান ওগারেফ তার রক্ষীসেনাদের হাত থেকে মাইকেলকে বাঁচিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে।

অমস্কিতে যে শোচনীয় ঘটনা ঘটে গেছে তারপর এপর্যন্ত মা ও ছেলে কেউ একটি কথাও বলতে পারেনি। নির্মমভাবে তাদের সরিয়ে রাখা হয়েছিল দূরে দূরে। এ জন্যে তাদের দুঃখ যেন আরও বেড়ে গিয়েছিল। বন্দী-দশায় উভয়ের মাঝে চোখের দেখা হ'লেও হয়ত তারা কিছুটা সান্ত্বনা পেত।

মার্ফা'র মন ভারি হয়ে উঠে অনুতাপে—অনুশোচনায়। ছেলের ওপর মস্ত অবিচার ক'রে ফেলেছে এই মনে ক'রে নিজেকে সে ধিক্কার দিতে লাগল। মায়ের দরদ, স্নেহের আবেগ সে ছেলের ভালোর জন্যেও চেপে রাখতে পারল না—এ কি কম দুর্ভাগ্য! ওমস্কের সরাইখানায় সে যদি এতটা অধীর না হ'য়ে প'ড়ে নিজেকে সামলে রাখত তা' হ'লে তো মাইকেল ধরা পড়ত না। আজকের এই নিদারুণ দুর্ভাগ্যকে সে অনায়াসে এড়াতে পারত।

মাইকেলের মনেও দুশ্চিন্তার ঘনঘটা। আইভানের উদ্দেশ্য হয়ত অতি নির্মম। হয়ত তার ওপর অমানুষিক পীড়ন চলবে, আর তার মাকে রাখা হবে সেখানে। চোখের ওপর সন্তানের মৃত্যু-যন্ত্রণা মাকে দেখানো হবে। অথবা ছেলের চোখের সম্মুখে মায়ের উপর চলবে অসহ্য পীড়ন অথবা অমানুষিক মৃত্যুদণ্ড।

অন্যদিকে নাদিয়ার মনেও তুমুল দুর্ভাবনা তোলপাড় করছিল। কিন্তু কী সে করতে পারে? তবে এইটুকু সে বুঝেছিল—সিংহ শিকারীর জালে ধরা

পড়েছে। এখন জাল কেটে সিংহকে মুক্তি দিতে হবে এবং সে কাজ করতে হবে তাকেই। নিজের জীবন দিয়েও কি সে এটুকু করতে পারবে না?

সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল নাদিয়া।

আমীরকে সম্মান দেখাতে হবে। বন্দীদল হুকুম মত এগিয়ে এল একে একে। আমীরের সম্মুখে এসেই ধুলোয় মাথা ঠুকে অধীনতা স্বীকার করতে হ'ল। স্বাধীনতার গৌরব খর্ব হল গোলামির হীনতায়। কারও কারও মনে হয়ত দ্বিধা জেগেছিল—মাথা নোয়াতে বাধ-বাধ ঠেকল, কিন্তু রক্ষীরা কঠোর হাতে ঘাড়ে ধ'রে সজোরে তাদের মাথা ঠুকে দিতে লাগল মাটিতে।

এই বিসদৃশ ব্যাপার দেখে হ্যারি ব্লাউণ্ট ও অলসাইড জুলিভেট রাগে, রোষে ঠোঁট কামড়াতে লাগল। অলসাইড বলল; দেখছ কি অসভ্য ব্যবহার? অসহ! উঠে এসো—আর এখানে নয়।

—উহুঁ। হ্যারি ব্লাউণ্ট বলল: অভিনয়ের শেষ না দেখেই—

—কি আর দেখবে?

—উহো—হো—অলসাইড সহসা দু'হাতে বন্ধুর বাহু জড়িয়ে ধরল।

—আহা কি হোল তোমার বলতো?—বিরক্তিভাবে বলল হ্যারি ব্লাউণ্ট।

—ঐ দেখ সেই মেয়েটি?—অলসাইড চোখ ঘুরিয়ে ইঙ্গিত করল।

ব্লাউণ্ট তাকাল। বলল: কে ও?

—চিনতে পারোনি? সহযাত্রী কোর্পানফের বোন! এখানে সেও বন্দিনী!

দুই বন্ধু অসহিষ্ণু মনে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

এবার নাদিয়ার পালা। সে এগিয়ে এল। কোন দিকে তার লক্ষ্য নেই। দীর্ঘ রুক্ষ চুল তার মুখের উপর এসে পড়েছিল। কাজেই তার ওপর কারও সন্দেহ-দৃষ্টিও পড়ল না।

তারপর এল বৃদ্ধা মার্ফা স্ট্রগফ। আমীরের সম্মুখে এসেও সে মাথা নোয়াল না। কিন্তু অসহিষ্ণু রক্ষীদল তার ঘাড় ধ'রে ভীষণ ঝাঁকুনি দিল।

বৃদ্ধা নিজেকে সামলাতে পারল না—প'ড়ে গেল।

মাইকেল স্ট্রগফ ভীষণ জোর-জার সুরু ক'রে দিল। রক্ষীরা অতিকষ্টে ধ'রে রাখল তাকে।

মার্ফা তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। প্রহরীরা তাকে টেনে নিয়ে যেতে উদ্যত হ'ল।

কিন্তু ইঙ্গিতে বারণ করল আইভান ওগারেফ। প্রহরীরা দাঁড়াল।

এবার মাইকেল স্ট্রগফ। তাকে টেনে আনা হ'ল আমীরের সম্মুখে। কিন্তু সে দাঁড়িয়ে রইল উন্নত মস্তকে। তার চোখের দৃষ্টি পর্যন্ত নত হ'ল না।

—মাথা নোয়াও।—মহারোষে গর্জে উঠল আইভান ওগারেফ।

মাইকেল দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল : না।

দু'জন রক্ষীসেনা তার দিকে এগিয়ে এল। মাইকেল শেকল-বাঁধা হাত দুটি তুলে এমনভাবে তাদের মাথায় আঘাত করল যে সঙ্গে সঙ্গে তারা বসে পড়ল।

আইভান মহারোষে গর্জে উঠল : মৃত্যু—চরম দণ্ড···

কঠোর গর্জনে উত্তর দিল মাইকেল : আমি মরতে পারি—মৃত্যুতে ভয় নেই আমার। কিন্তু আইভান, বিশ্বাসঘাতকতার জন্ত ঐ যে কলঙ্কচিহ্ন তোমার মুখের ওপর এঁকে দিয়েছি, তার বিন্দুমাত্রও মুছবে না আমার মৃত্যুতে।

অপমানে আইভান ওগারেফের চোখমুখ নীল হয়ে উঠল।

আমীর এবার ঘাড় তুলে তাকালেন। তারপর গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন : কে এই বন্দী ?

গম্ভীর কণ্ঠস্বর কঠোর শুনাল।

—রাশিয়ার গুপ্তচর।—আইভান বলল। ওগারেফ জানত গুপ্তচরের প্রতি আমীরের বিচার কি কঠোর !

সেনাদলের বাধা এড়িয়ে মাইকেল দু-পা এগিয়ে এল ওগারেফের দিকে।

ঠিক এই সময়ে আমীর হাত উঠালেন। অমনি যেন এক অলৌকিক শক্তি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে—চকের নিমেষে। সৈন্য-সামন্ত সকলেই মাথা হেঁট ক'রে রইল—যে যে-ভাবে ছিল ঠিক সে ভাবে। সকলেই নির্বাক—কোন দিকে কোন সাড়া নেই। আমীরের হাত ধীরে ধীরে নেমে এল মহাপবিত্র কোরানের ওপর। আমীর কোরানের পাতা উল্টে যেতে লাগলেন। তারপর—আমীরের আঙুল একটি পাতার ওপর এসে স্থির হয়ে গেল।

সেকালে প্রাচ্যদেশের এ-সকল জাতির বিশ্বাস ছিল—মানুষ যে-কোন অপরাধই করুক স্বয়ং বিধাতাপুরুষের ইঙ্গিতে তার ভাগ্যলিপিও নির্দিষ্ট হয়ে আছে মহাপবিত্র কোরানের পাতায়। বিচারকের অনির্দিষ্ট আঙুল যেখানে যে শ্লোকের ওপর গিয়ে থামে, সেই শ্লোক যে শাস্তির ভার বহন করে,—সেই শাস্তি লঘুই হোক বা কঠোরই হোক, অপরাধীর ওপর তাই বিহিত হবে।

মাইকেল স্ট্রগফের ভাগ্যও এমনিভাবে নির্দিষ্ট হ'ল।

প্রধান উলেমা এগিয়ে এলেন কোরানের কাছে। আমীরের আঙুল যেখানে গিয়ে ঠেকেছিল, উলেমা সেই শ্লোকটি গুরুগম্ভীর সুরে পড়লেন :

দুনিয়ার পবিত্র আলো তার চোখে অন্ধকার হয়ে যাবে।—জগতের কোন কিছু দেখবার অধিকার তার নেই।

আমীর মহাক্রোধে গর্জে উঠলেন। তার কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে ভীষণ শোনাল: গুপ্তচর।—রাশিয়ার গুপ্তচর তুমি! তাতার শিবিরে কি মন্ত্রণা চলেছে, তাই দেখতে এসেছিলে তুমি!—না? এই বেলা প্রাণ ভ'রে দেখে নাও··

বাইশ

আমীর কেওকার হাত উঠিয়ে তর্জন ক'রে বলল: যা দেখবার এই বেলা দেখে নাও।

আইভান ওগারেফ তাতারদের রীতিনীতি সবই জানত। আমীরের এই তর্জনের সম্পূর্ণ অর্থ বুঝতে পারল সে। চেহারায় ফুটে উঠল ক্রুর হাসি।

এমনি সময় শিঙা বেজে উঠল।

অলসাইড জুলিভেট বন্ধুর কানে কানে বলল: দেখ—দেখ, এবার আসল অভিনয় আরম্ভ হ'ল।

প্রাসাদের সম্মুখে খোলা যায়গায় এসে দাঁড়াল একদল নর্তকী। নানারকম বাদ্যভাণ্ড নিয়ে বাজিয়েরা ব'সে গেল চারদিকে। ঐক্যতান বাজনা সুরু হ'ল। দু-তারার ওপর বাজিয়েদের আঙুল চলল তালে তালে। ঢোলকে সুরু হ'ল দু-হাতের কসরৎ। বেহালার ছড় চলল ধীর-গম্ভীরে। এই মিলিত সুরে নর্তকীদের মধুরকণ্ঠ মিলে অপূর্ব সুরতরঙ্গ জেগে উঠল।

নাচ আরম্ভ হ'ল।

অপূর্ব সুন্দরী এই নর্তকী-দল। সাজ-পোশাক অপূর্ব—মণি-মাণিক্যে খচিত। কানে সোনার দুল। গলায় আর পায়ে রূপার সরু বেড়। চুলে জড়ানো মুক্তোর ঝালর। কোমরে ঝকমকে বেষ্টনী।

নাচের অপরূপ ভঙ্গিমা। কোন নর্তকী একা নাচে নানা ছাঁদে। আবার কখনো দল বেঁধে নাচের নূতনত্বে আসর জাঁকিয়ে তোলে। মুখ অনাবৃত—উজ্জ্বল চঞ্চল চাহনি। এক-একবার অতিসূক্ষ্ম জরির আবরণ মাথার ওপর টেনে দেয়—নাচের তালে তালে কখনো সে আবরণ খ'সে পড়ে। মনে হয়, রাতের নির্মল আকাশে হাজার হাজার উজ্জ্বল তারার উপর যেন হালকা মেঘের খেলা চলেছে। মর্ত্যে যেন নেমে এল বেহেস্তের হুরীর খেলা।

হঠাৎ নাচ থামল। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল কঠোর বিদ্রূপ: দেখে নাও—দেখে নাও।

মাইকেল দেখল—একটি লম্বা চেহারা তাতার ঘাতক তলোয়ার ঘাড়ে ফেলে আমীরের পেছনে দাঁড়িয়ে তাকে শাসাচ্ছে।

তারপর আসে আর একদল নর্তকী।

হ্যারি ব্লাউন্ট দেখেই ব'লে উঠল: নিজনী-নভগরডের সেই জিপসীদল—না?

অলসাইভ জবাব দিল: তাই তো! হাঁ, আমার মনে হয়—ওদের পায়ের ভঙ্গিমার চেয়ে চোখের ভঙ্গিমারই বেশি দাম।

—বাস্তবিক তোমার অনুমান মিথ্যে নয়। আমীরের গোয়েন্দাগিরিতে ওরা ওস্তাদ। এপথে রোজগারও বেশ।

নর্তকীদলের মাঝে দেখা গেল জমকালো সাজ প'রে দাঁড়িয়েছে জিপসী সাঙারে। অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে—তার দেহ থেকে যেন সহস্র আলোর কণা ঝ'রে পড়ছে।

সাঙারে দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো। জিপসীদলের নাচ আরম্ভ হয় তাকে ঘিরে। নাচের ধরন অপূর্ব। পৃথিবীর নানাদেশে তারা ঘুরে বেড়ায়—কাজেই তাদের নাচের ভঙ্গিমায় ছিল নানাদেশের নানারকম নাচের সংমিশ্রণ। তুর্কি, বোহেমিয়া, মিশর, ইতালি আর স্পেন দেশের নাচের ছন্দ তাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে। নাচের মুখে নর্তকীদল একবার পিছিয়ে হঠাৎ এগিয়ে পড়ে মাটিতে। এ সময়ে এগিয়ে আসে একটি অল্পবয়সী ছেলে। হাতে চমৎকার এক দু-তারা। তার আঙুলে যেন যাদুবল। গুনগুন সুরে সে সুর মিলায় বাজনার সঙ্গে। দু-তারার টুং টাং সুরে আসর মোহিত। এমনি সময় হাল্কা পা ফেলে তারই পাশে এসে দাঁড়াল এক জিপসী মেয়ে:—যেন হাওয়ায় ভর ক'রে উড়ে এল সে। সুরের মোহে সেও যেন মোহিত—স্তব্ধ। কিন্তু জিপসী ছেলের সুরের রেশ হঠাৎ বদলে যায়। বাজনার ধমকে চঞ্চল হয়ে ওঠে মেয়েটি। মুহূর্তে নাচ সুরু হয়।

মুগ্ধ আমীর, মুগ্ধ তার দলবল। সোনারূপা ঝ'রে পড়তে থাকে জিপসীদলের ওপর বৃষ্টিধারার মতো। বাজনার তাল উদ্দাম হয়ে ওঠে। শায়িত জিপসী নর্তকী দল এবার চোখের পলকে উঠে দাঁড়ায়। পোশাকের জাঁকের সঙ্গে দেখায় নাচের বাহার। তারপর দু-তারা আর খঞ্জনীর শেষ ধমকে অকস্মাৎ নীরব হয়ে পড়ে সমস্ত আসর।

অলসাইড জুলিভেট হ্যারি ব্রাউন্টের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল : ডাতারয়া কি উড়নচণ্ডী দেখ তো ! ওঃ, লুটের মাল কিনা !

এই মুহূর্তে আবার শোনা গেল কঠোর কণ্ঠ : দেখে নাও এই বেলা।

অলসাইড জুলিভেট দেখতে পেল—ঘাতক তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

বেলা শেষ হল। সূর্য ডুবে গেল পশ্চিম আকাশে। আধ আধ অন্ধকারে ছেয়ে গেল প্রান্তরভূমি। পাইন ও দেবদারু বন ধীরে ধীরে মসীময় হয়ে উঠল। ঘন ছায়ায় মিলিয়ে গেল টম নদীর স্রোত।

ঠিক এ সময়ে শত শত মশাল জ্বলে উঠল। সাঙারে তার নর্তক-নর্তকীর দল নিয়ে এল আরও এগিয়ে—আমীরের সিংহাসনের সামনে। আবার শুরু হ'ল নাচ-গানের বাহার।

কিছুক্ষণ পর আমীর হাত তুলে কি ইঙ্গিত করলেন। সহসা আলোর রোশনাই গেল নিভে। নৃত্য-কলরব থেমে গেল। মুহূর্ত আগেও যেখানে বিচিত্র আলোয় আলোময় ছিল, এখন সেখানে কয়েকটি আধ নিবন্ত মশালের ক্ষীণ আলো ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না।

মাইকেল এবার বীরের মত দাঁড়াল স্থির হয়ে। আমীরের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সামনে তাকাল তীব্রভাবে। কিন্তু আইভান ওগারেফকে দেখেই তার চোখে-মুখে উঠল নিদারুণ ঘৃণার ভাব মৃত্যু সম্মুখে—তবু মাইকেলের মনে এতটুকু দুর্বলতা দেখা গেল না।

আমীরের শরীর রাগে কাঁপতে লাগল। দাঁত খিঁচিয়ে গর্জে উঠল : গুপ্তচর। আমাদের শিবিরে গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছিলে তুমি !—দেখতে এসেছিলে আমরা কি মন্ত্রণা করছি ? বেশ, এবার শেষ-দেখা দেখে নাও। মুহূর্ত পরেই তোমার চোখের আলো নিভে যাবে।

কী নিদারুণ ভাগ্যলিপি। কারাদণ্ড নয়, মৃত্যুদণ্ডও নয়—দৃষ্টি কেড়ে নেওয়া হবে। মৃত্যুর চেয়েও এ যে ভয়ঙ্কর। সে অন্ধ, এ জগতে তার মতো হতভাগ্য আর কে আছে ?

মাইকেল স্থির—অটল। আমীরের রক্তচক্ষু আর কঠোর তর্জন তাকে বিন্দুমাত্রও টলাতে পারেনি। প্রসারিত উজ্জ্বল তার দৃষ্টি, যেন সে এক নিমেষে পৃথিবীর সকল আলো প্রাণ ভ'রে দেখে নিতে চায়! দুর্ধর্ষ বন্য তাতার জাতি—তাদের সম্মুখে করুণা-ভিক্ষা নিরর্থক,—তা ছাড়া একজন বীরের পক্ষে নিতান্ত অশোভন। কাজেই এ সব কথা তার মনে জাগেনি। জগতে একমাত্র

মতন তার মা, আর মেয়ের পাত্রী নাদিয়া। তাদের কথাই তার মনে পড়ে। কিন্তু তার চেহারায় কোন রকম আবেগের ছায়া দেখা গেল না।

হঠাৎ উৎকট প্রতিহিংসার ভাব জেগে উঠল মাইকেলের মনে। ঘৃণার ভীষণ বিকৃত দেখাল তার চেহারা। গর্জে বলল : আইভান, বিশ্বাসঘাতক আইভান মনে রেখো, আমার শেষ লক্ষ্য—প্রতিহিংসা।

আইভান ওগারেফের সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল।

কিন্তু মাইকেলের এই তর্জন নিরর্থক। মুহূর্ত পরেই যার চোখের দৃষ্টি কেড়ে নেওয়া হবে—অন্ধ জীবনে সে আইভান ওগারেফের কি করতে পারে?

এই সময়ে মার্ফা স্ট্রগফ ছেলের কাছে এসে দাঁড়াল।

মাইকেল নিজেকে আর সামলে রাখতে পারল না। আবেগের সুরে চেঁচিয়ে উঠল : মা—মা—। এই ব'লেই সে থেমে গেল। ভাষা হারিয়ে গেল তার। তারপর ঢোক গিলে আবার চেঁচিয়ে উঠল : মা—মা আমার! একবার আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়াও। প্রাণ ভ'রে তোমায় দেখে নিই। ও শয়তানের দিকে চেয়ে আমার এ দৃষ্টি কলঙ্কিত করতে চাইনে।

মাইকেল মায়ের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল। মায়ের স্নেহ মাখামাখি, মমতা-ভরা মূর্তি চিরদিনের জন্যে সে যেন এক দৃষ্টিতে দেখে নিতে চায়।

বৃদ্ধা মার্ফার মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হল না। সোজা হয়ে সে ছেলের সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

আইভান ওগারেফের আর সহ্য হ'ল না। গর্জে উঠল : দূর ক'রে দাও এই ডাইনী বুড়ীটাকে।

দু'জন লোক এগিয়ে এল। কিন্তু মার্ফা তার আগেই কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে দূর থেকে মাইকেলের দিকে তাকিয়ে রইল সজল চোখে।

মাইকেলের দৃষ্টি প্রথমে ধকধক্ ক'রে জ্ব'লে উঠল। পরক্ষণেই জলে ভারি হয়ে এল চোখের পাতা।

অদূরে একপাশে একটি চুল্লীতে তখন দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্ব'লে উঠেছে। ঘাতক তার ভৈরব হাতের তলোয়ার দিল ফেলে। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ই তলোয়ারের ফলা লাল ডগডগে হয়ে উঠল।

তাতারদের বিধানে অপরাধীকে অন্ধ ক'রে শাস্তি দেবার যে রীতি, সে রীতি ঘাতককেও মেনে চলতে হয়। মাইকেলকে অন্ধ ক'রে দেওয়া হবে—বিধান মতো জলন্ত তলোয়ারের ফলক টেনে নেওয়া হবে চোখের উপর দিয়ে।

মাইকেল একটুও বিচলিত হ'ল না। তখনও তার অপলক উজ্জ্বল দৃষ্টি মায়ের মুখের ওপর। প্রাণ ভ'রে সে মাকে শেষ-দেখা দেখে নিতে চায়।

মাও একদৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে। শেষ পর্যন্ত অসহায়ভাবে তিনি দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন ছেলের দিকে। চেঁচিয়ে উঠলেন: স্ট্রগফ, বাবা আমার!

ঘাতক হেঁ। মেরে তলোয়ার টেনে নিল চুল্লী থেকে। জলন্ত ফলা লকলক ক'রে উঠল। ঘাতক আর মুহূর্ত বিলম্ব না ক'রে সেই ফলা নৃশংসভাবে বুলিয়ে দিল মাইকেলের চোখের ওপর দিয়ে।

একটা বুকফাটা আর্তনাদ মাত্র শোনা গেল। বৃদ্ধা মার্ফা অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গেল মাটিতে।

মাইকেল স্ট্রগফ এখন চক্ষুহীন—অন্ধ।

দরবার ভাঙল। আমীর পারিষদবর্গ নিয়ে উঠে গেলেন।

আইভান ওগারেফ এবার ধীরে ধীরে এগিয়ে এল। তারপর পকেট থেকে মহামান্য জারের চিঠিখানা খুলে ধরল মাইকেলের চোখের সামনে। বিদ্রূপ ক'রে বলল: এই দেখ মাইকেল স্ট্রগফ, তোমার চোখের সম্মুখে জারের সেই গোপন চিঠি। এবার যতবার পার দেখে নাও—প'ড়ে নাও। ইরকুটস্কে গিয়ে গ্র্যাণ্ড-ডিউকের কাছে তোমার বাহাদুরি ফলাতে হবে তো! বাহাদুর মাইকেল, মনে রেখো, এখন থেকে জারের বার্তাবহ তুমি নও—আসল বার্তাবহ এই আইভান ওগারেফ।

এই ব'লেই আইভান ওগারেফ গটগট্ করে চ'লে গেল সেখান থেকে। পেছনে পেছনে মশালধারীরাও স'রে গেল।

মাইকেল একা দাঁড়িয়ে। কিছুদূরে মৃতপ্রায় পড়ে রয়েছে তার স্নেহময়ী মা। হয়ত এতক্ষণে তার প্রাণবায়ু শূন্যে মিশে গেছে।

তাতার সেনাদলের উল্লাস-চীৎকার শোনা গেল দূরে। শহরের দিকে হল্লা ক'রে চলেছে তারা।

সমস্ত মাঠ নীরব—নিঝুম।

মাইকেল স্ট্রগফ হামাগুড়ি দিয়ে অনুমানে এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল মায়ের মুখের উপর। আপন মনে বলল: মা, এখনও কি বেঁচে আছ? আর কি শুনতে পাবে এই হতভাগ্য ছেলের কথা?

কিন্তু কোন সাড়া পেল না সে।

মাইকেল ধীরে ধীরে মায়ের কপালে চুমু খেয়ে কি যেন ব'লে গেল। বাঁধা

হাতদুটি সস্নেহে বুলাল তাঁর মাথায়। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল।

ঠিক এই সময়ে নাদিয়া সেখানে এল। মাইকেলের হাতের বাঁধন কেটে দিয়ে আস্তে আস্তে ডাকল : ব্রাদার।

মাইকেল চমকে উঠল : কে—নাদিয়া ?

নাদিয়া জবাব দিল : হাঁ, ব্রাদার। তুমি কিছু ভেবো না। আমার চোখ তোমায় পথ দেখাবে। আমার হাত ধর—আমি তোমায় ইরকুটস্কে নিয়ে যাব।

তেইশ

মাইকেল ও নাদিয়া পথে নেমে পড়ল। টম নদীর ধার দিয়ে ধীরে ধীরে চলল দুটি হতভাগ্য প্রাণী।

টমস্ক শহর থেকে ইরকুটস্ক—সোজা এক পথ চলে গেছে পুবদিকে। এ পথ এখনও নিরাপদ। বিদ্রোহীদল শহরে পানভোজনে মত্ত—নেশায় বিভোর। ভোর বেলাতেই হয়ত তারা আবার পথে পথে ছড়িয়ে পড়বে। কাজেই এই সুযোগ। সেখান থেকে পাঁচশ ভার্সট দূরে ক্রেস্‌নোয়ার্স্ক শহর। সেখানে পৌঁছুতে পারলে হয়ত কিছুটা নিরাপদ হওয়া যায়। কিন্তু নাদিয়ার এত পথশ্রম সইবে কী করে ? কোন্ শক্তি-বলে সে এত দূর-পথ এগোবে ? কিন্তু কি আশ্চর্য, পরদিন ভোরে নাদিয়া ও মাইকেলকে দেখা গেল পঞ্চাশ ভার্সট দূরে সেমিলোস্কো-নামক একটি ছোট্ট শহরে।

সেমিলোস্কো শহর প্রায় জনশূন্য। তাতারদের আক্রমণের ভয়ে অধিকাংশ অধিবাসীই শহর খালি ক'রে চলে গেছে। মাইকেল ও নাদিয়া উভয়েই ক্ষুধাতৃষ্ণায় একান্ত কাতর হ'য়ে পড়েছিল। তাই তারা শহরের একধারে একটি খালি বাড়ীতে এসে দাঁড়াল।

শূন্য বাড়ী। দরজা খোলা প'ড়ে আছে। ভেতরে একটি বেঞ্চি পাতা। দু'জনেই সেখানে নিঃশব্দে ব'সে পড়ল। নাদিয়া এবার করুণ চোখে তাকাল মাইকেলের মুখের দিকে। এমনিভাবে সে আর কোন দিন তার দিকে তাকায়নি। নাদিয়া দেখল, মাইকেলের চোখের পাতা চোখের ওপর স্বাভাবিক ভাবে ঝুলে পড়েছে। তারা দুটি ভীষণ ফুলে অদ্ভুত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

মাইকেল শূন্যে হাত বাড়িয়ে দিল। বলল : নাদিয়া তুমি কোথায় ?

—এই যে মাইকেল! তোমার পাশেই রয়েছি।—নাদিয়া এই প্রথম মাইকেলের নাম ধ'রে সম্বোধন করল।

মাইকেল চমকে উঠল। বুঝতে পারল—নাদিয়া তার সম্পর্কে সবই জেনে ফেলেছে। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল: নাদিয়া, এবার তো আমাদের ছাড়াছাড়ি হতে হবে।

—ছাড়াছাড়ি হব? কি বলছ তুমি, আবার?

—কিছু মনে ক'রো না, বোন। ইরকুটস্কে তোমার বাবা তোমার পথ চেয়ে ব'সে আছেন। তোমার সেখানে আগে যাওয়া দরকার।

নাদিয়া বলল: কিন্তু আমি যদি তোমায় পথে ফেলে যাই, তা হ'লে বাবা আমায় ক্ষমা করবেন না। আমার জন্তে তুমি যা করেছ

নাদিয়ার গলার স্বর ভারি হয়ে এল।

মাইকেল বাধা দিয়ে বলল: নাদিয়া—নাদিয়া, একবার ভেবে দেখ তোমার বাবার কথা··

নাদিয়া জবাব দিল: মাইকেল, তোমাকেই এখন আমার বেশি প্রয়োজন। বাবার চেয়েও। তুমি কি ইরকুটস্কে যাবার আশা ছেড়ে দিয়েছ তা হ'লে?

—কক্ষণো নয়।·· সজোরে বলল মাইকেল। এমন জোর দিয়ে বলল যে, নাদিয়ার মনে হল—মাইকেলের উৎসাহ উদ্যম একটুও কমেনি।

নাদিয়া বলল: কিন্তু তোমার কাছে তো জারের সেই চিঠিখানা নেই?

—না থাক। সে ব্যবস্থা কোন রকমে ক'রে নেব। আমি পথে যা দেখেছি শুনেছি, তাই সেখানে গিয়ে প্রকাশ করব। কিন্তু তোমায় আমি এ কথা শপথ করে বলতে পারি বোন, সেই বিশ্বাসঘাতক শয়তান আইভানের সঙ্গে আবার আমার মুখোমুখী দেখা হবে। কাজেই তার আগে আমাকে পৌছুতে হবে ইরকুটস্কে।

—তা হ'লে তুমি কি ক'রে বল যে আমাদের ছাড়াছাড়ি হ'তে হবে?

মাইকেল একটু দ'মে গেল। পরে বলল: কিন্তু নাদিয়া, সেই শয়তান আমার যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে।

নাদিয়া বলল: কিন্তু আমার হাতে এখনও কয়টি রুবল রয়েছে। আর রয়েছে দুটি চোখ। তুমি ভেবো না।

—কিন্তু কিভাবে আমরা সেখানে যাব?

—কেন? পায়ে হেঁটে।

—কিন্তু কি খেয়ে দিন চলবে?

—কেন? ভিক্ষাই এখন আমাদের সম্বল।

বেশ তাই হবে। তা হ'লে চল বোন।

নাদিয়া মাইকেলের হাত ধ'রে বলল: চলো।

আবার কঠোর পথ-যাত্রা। নাদিয়ার যেন ক্লান্তি নেই—অবসাদ নেই। এমন ভাবে সে হাঁটতে লাগল যে মাইকেল যদি দেখতে পেত তা হ'লে সেও অবাক হয়ে যেত। নাদিয়ার মুখ থেকে একটা দীর্ঘশ্বাসও মাইকেল শুনতে পেল না।

মাইকেলের মনে কত রকমের ভাবনা। অন্যমনস্কভাবে সেও চলতে থাকে নাদিয়ার হাত ধ'রে। মনের ভাবনা সে মুখে প্রকাশ করার প্রয়োজন মনে করল না। এক-একবার নাদিয়ার দম বন্ধ হয়ে আসে, শরীর কেঁপে ওঠে, পা টলে থেমে যায়। মাইকেলও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়ায়, মুখ তুলে নাদিয়ার মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। যার চোখের ওপর আঁধার জমাট বেঁধে গেছে সে কি ক'রে দেখবে?

একবার মাইকেল জিজ্ঞেস করল: নাদিয়া, পথে কি কেউ নেই?

—না ভ্রাতার, একটি প্রাণীরও সাড়া পাচ্ছিনে।

—কিন্তু পেছন দিক থেকে কেমন ক্যাচ্ ক্যাচ্ আওয়াজ শুনা যাচ্ছে —না? শত্রু নয় তো? তা হ'লে এসো, আমরা কোথাও লুকিয়ে পড়ি। সময়ে সাবধান হওয়া ভাল।

নাদিয়া একবার দাঁড়িয়ে শুনবার চেষ্টা করল। তারপর বলল: তুমি এখানে একটু দাঁড়াও—আমি দেখছি।

নাদিয়া এগিয়ে গেল রাস্তার মোড়ে। তারপর মাইকেলের দিকে ফিরে ব্যস্তভাবে বলল: ভ্রাতার, একটি লোক গাড়ী হাঁকিয়ে এদিকেই আসছে।

—গাড়ীতে আর কেউ আছে কি?

মাইকেল মনে মনে বলল: একা লোক, তা হ'লে নিশ্চয়ই কোন গ্রামবাসী। গাড়ীতে একটু ঠাঁই ক'রে নেবার চেষ্টা দেখব কি—নাদিয়া যাতে বসতে পারে? নিজের জন্যে ভাবনা নেই—এখনও পায়ে বেশ জোর আছে।

মাইকেল বলল: তা হ'লে ভয় নেই, নাদিয়া। হয়ত কোন গ্রামবাসী শত্রুর ভয়ে বাড়ী ঘর ছেড়ে পালাচ্ছে। একটু দাঁড়াও—দেখা যাক।

খানিক পরেই রাস্তার মোড়ে গাড়ীটা এসে পৌঁছুল। ভাঙা গাড়ী—ভয়ানক লড়বড় করছে।

এই গাড়ীর নাম কিবিতকা।

আরোহীটি একজন রাশিয়ান যুবক। বেশ গোলগাল ঢিলে ঢালা চেহারা। প্রসন্ন চোখ। এমন লোককে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা যায়। তেমন কোন ব্যস্ততা নেই। ধীরে ধীরে সে গাড়ী হাঁকিয়ে চলেছে—ডাকাতরা যে এ পথে হানা দিতে পারে, এমন ভয় ভাবনা যেন তার নেই। গাড়ীর ওপর একপাশে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে একটি কুকুর।

নাদিয়া মাইকেলের হাত ধ'রে রাস্তার একপাশে স'রে দাঁড়াল।

গাড়ীটা কাছে এসেই থেমে গেল। আরোহী লোকটি হাসিমুখে তাদের দিকে তাকাল। এ হাসিতে দারুণ বিস্ময়। জিজ্ঞেস করল: এভাবে তোমরা কোথায় চলেছ?

মাইকেল চমকে উঠল। পরক্ষণেই তার মনে হ'ল—যেন পরিচিত কণ্ঠস্বর। কোথায় যেন লোকটিকে সে দেখেছে। দুর্ভাবনা কাটল।

লোকটি জিজ্ঞেস করল: কোথায় যাবে তোমরা?

মাইকেল জবাব দিল: ইরকুটস্কে।

লোকটি ঘাড় নেড়ে বলল: ইরকুটস্কে! জান—ইরকুটস এখান থেকে কতদূরে? যে-সে পথ নয় হে।

মাইকেল বলল: জানি।

—তাহ'লে হেঁটে চলেছ কোন্ সাহসে?

মাইকেল বলল: প্রয়োজনের তাগিদে।

—তুমি হয়ত পারতে পার। কিন্তু সঙ্গের এ মেয়েটি?

—ও আমারই বোন।

—মানলাম ও তোমার বোন! কিন্তু ও তো পুরুষ নয়—মেয়ে। যদি আমার কথা শোন তো বলি—তোমার বোন কখনো এভাবে হেঁটে ইরকুটস্কে যেতে পারবে না।

মাইকেল এবার দু' পা এগিয়ে এল। বলল: বন্ধু কি বলব—ডাকাতরা আমার যা ছিল সবই কেড়ে নিয়েছে। একটি কপর্দকও আর সঙ্গে নেই যে একটা ব্যবস্থা করি। দয়া ক'রে তুমি যদি বোনটিকে তোমার গাড়ীতে একটু ঠাঁই দাও, তা হ'লে বেঁচে যাই। আমার জন্যে কোন ভাবনা নেই। আমি তোমার গাড়ীটাকে ধ'রে ধ'রেই যেতে পারব।

লোকটি একমনে শুনে গেল।

মাইকেলের কথা শুনে নাদিয়া অপ্রস্তুত হয়ে গেল। অস্থিরভাবে বলল: না—না, তা হয় না। আমার ভাই যে অন্ধ।

লোকটি অবাক হ'ল। বলল: অন্ধ!

নাদিয়া দু'হাত মুঠো ক'রে করুণকণ্ঠে বলল: হাঁ, ডাকাতরা তার চোখদুটি পুড়িয়ে দিয়েছে।

—পুড়িয়ে দিয়েছে! আহা-হা বেচারী! আচ্ছা বন্ধু, আমি তো এখন কেসনদেমার্সিকে যাচ্ছি। আমি বলি কি—তোমরা ভাই-বোন দুজনেই আমার গাড়ীতে উঠে বসো। একটু ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে বসতে হবে বৈ তো নয়। অবশ্য আমার সাথী এই কুকুরটি হেঁটে যেতে মোটেই আপত্তি করবে না।

মাইকেল কৃতজ্ঞতা জানাল। পরে বলল: আচ্ছা, তোমার নামটি কি জানতে পারি, বন্ধু।

—আমার নাম? আমার নাম নিকোলাস পিগাসফ।

—এ নামটি জীবনে ভুলব না।—মাইকেল বলল ধীরে ধীরে।

—আচ্ছা, আচ্ছা—সে দেখা যাবে পরে। এখন চট্‌পট্‌ গাড়ীতে চেপে ব'সো। বোনটি তোমার পাশে ওদিকটাতে বসুক। আর আমি তোমার সামনে ব'সে গাড়ী হাঁকাব। দেখ, গাড়ীতে কেমন খড়কুটো বিছানো রয়েছে ঠিক যেন পাখীর বাসা।

এই ব'লেই পিগাসফ একটু হাসল। তারপর কুকুরটাকে লক্ষ্য করে বলল আদেশের ভঙ্গিতে: এই সার্কো, জায়গা ছাড়—হেঁটে চল এবার।

কুকুরটির নাম সার্কো। সার্কো প্রথমে একটা মস্ত হাই তুলে অস্পষ্ট শব্দ করল। তারপর লাফিয়ে নেমে পড়ল নিচে।

দুজনে তখন গাড়ীতে উঠে বসল। নাদিয়া এতটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে গাড়ীর সামান্য ঝাঁকুনিতেই ঘুমিয়ে পড়ল। মাইকেল সবই বুঝতে পারল। হাহাকার ক'রে উঠল তার মন। পোড়া চোখ—নতুবা এতক্ষণে তার চোখের জল ঝরঝর্ ক'রে ঝ'রে পড়ত।

পিগাসফ বলল: বেশ মেয়েটি!

—হাঁ বন্ধু, খুব ভাল।—মাইকেল বলল।

—মেয়েরাও বেশ সাহসী হয়—তারাও শক্ত হ'তে চায়। তবে কিনা শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠে না। প্রকৃতির নিয়মেই ওরা দুর্বল কিনা। আচ্ছা বন্ধু, তোমরা কতদূর থেকে এসেছ?

—অনেক দূর থেকে।—মাইকেল বলল। কিন্তু নিজের বিষয়ে বেশি কথা না হয় তাই সে-আলোচনা চাপা দেবার চেষ্টায় সে ফিরে জিজ্ঞেস করল: আচ্ছা বন্ধু, আমাকে কোথাও দেখেছ ব'লে তোমার মনে পড়ে?

পিগাসফ একবার মাইকেলের মুখের দিকে তাকাল। বলল: তোমাকে? কৈ মনে পড়ে না তো।

—কিন্তু তোমার গলার স্বর আমার বেশ চেনা ব'লেই তো মনে হচ্ছে।

—হ'তেও পারে।—পিগাসফ হেসে জবাব দিল। হয়ত অন্য লোক আমার স্বরেই আওয়াজ করতে পারে। ওহো বুঝেছি, তুমি জানতে চাও, আমি কোত্থেকে এসেছি—না? আপত্তি কি বলতে? আমি এসেছি কলিভান থেকে।

—কলিভান থেকে? তাই বল। তা হ'লে সেখানেই তোমাকে দেখেছি। তুমিই বুঝি টেলিগ্রাফ অফিসে ছিলে?

—তা হ'তে পারে। আমিই সেখানকার টেলিগ্রাফের কেরানী ছিলাম।

—দু'জন সাংবাদিক তোমার খুপরির কাছে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি ক'রে খবর পাঠাচ্ছিল—না?

—হ'তে পারে! কত লোক আসে খবর পাঠাতে, অত কি আর মনে থাকে? এই উত্তরে মাইকেল পিগাসফের বেভোলা মনের পরিচয় পেল।

গাড়ী তখনও সেই চিমে তালেই চলেছে। মাইকেলের ইচ্ছে আরও তাড়াতাড়ি চলে। কিন্তু পিগাসফ এবং তার ঘোড়াটি স্বাভাবিক চলার গতি বদলাতে যেন নারাজ। দু'ঘণ্টা চলা আর এক ঘণ্টা বিশ্রাম—কি রাত কি দিন—সব সময়েই এক নিয়ম।

দু'ঘণ্টা পর পিগাসফ গাড়ী থামাল। ঘোড়াটাকে একটা ঘাস-বনে ছেড়ে দিয়ে এ অবসরে তারাও কিছু জলযোগ ক'রে নিল। কিবিংকায় কুড়িজনের মতো খাবার মজুদ ছিল। পিগাসফ এই থেকেই অতিথিদের সেবা করল।

একদিনের বিশ্রামে নাদিয়া অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছিল। যাতে তার কোন কষ্ট না হয় সে দিক লক্ষ্য রেখেছিল পিগাসফ। গাড়ী যদিও বেশ রয়ে-সয়ে চলেছে—কিন্তু তাতে কোন বাধা-বিপদের সম্ভাবনা ছিল না।

পথে পড়ল ইচোলা নদী। এই নদী পূর্ব ও পশ্চিম সাইবেরিয়ার সীমারেখা। এখান থেকে যতদূর দেখা যায়—কেবল জলাভূমি। পথ চ'লে গেছে এ জলাভূমির ধার ঘেঁসে। দুদিকে ঘন সরলগাছের বন। দেখলে মনে হয়—এ বনের বুঝি শেষ নেই। চারিদিক নীরব। জনশূন্য গ্রাম' পল্লী, মাঠ ঘাট—সর্বত্র। সকলেই পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছে সদূরে য়েনিসী নদীর অপর পারে। তাদের ধারণা, নদীর বিশালতা দেখে তাতার দল এদিকে আসতে সাহস পাবে না।

মাইকেল অন্ধ। কিন্তু নাদিয়া পথঘাটের সকল কথাই তাকে বলত।

কোথায় তারা এল, কোথায় বন, কোথায় জলাভূমি, আশেপাশে কি সব গাছপালা, কোথায় গ্রাম, কুঁড়েঘর, মাঠ, নদী—সবই পর পর ব'লে যায় সে। পিগাসকও চুপ ক'রে ছিল না। কথা বলতেই সে ভালবাসে, এবং মাঝে মাঝে অদ্ভুতরকম রহস্য ক'রে আমোদ জমিয়ে তুলছিল।

একদিন মাইকেল জিজ্ঞেস করে—আকাশের অবস্থা এখন কেমন?

পিগাসক জবাব দেয়: চমৎকার! ভারি সুন্দর! আমরা গ্রীষ্মের শেষ দিনের নাগাল পেয়েছি কিনা! শরতের আবহাওয়া এই সাইবেরিয়ায় ক্ষণিকের জন্যে। প্রথম শীতের হাওয়া—হিমেল পরশ এই কয়েক সপ্তাহ পরেই পেয়ে যাব। সম্ভবত তাতাররা এই দুরন্ত শীতে এদিকে আর এগোবে না।

মাইকেল মাথা নাড়ে। পিগাসকের কথা সে মানতে রাজি নয়।

পিগাসকের চোখ এড়াল না। বলে: তোমার সন্দেহ হয় বুঝি? তুমি কি মনে করো এ সময়েই তাতার দল ইরকুটস্কের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে?

—আমার কিন্তু তাই মনে হয়।

—হাঁ, হ'তে পারে। তুমি ঠিকই বলেছ। ঐ দলে একটা বদলোক রয়েছে। ভয়ানক পাষণ্ড সে। সে লোকটাই হয়ত অনন্ত তাতারদের লেলিয়ে নিয়ে আসবে এদিকে। আইভান ওগারেফের নাম তুমি শুনেছ?

—শুনেছি বৈকি।

—তুমি জান নিজের দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ঠিক নয়!

—সত্যি ঠিক নয়।—নির্বিকারভাবে জবাব দেয় মাইকেল। পিগাসক একবার কি ভাবে। তারপর বলে: কিন্তু আইভান ওগারেফের কথায় তুমি যেন কেমন-কেমন ভাব দেখাচ্ছ, বন্ধু। কিন্তু এই নাম শুনে তোমার মতো একজন রাশিয়াবাসীর মনে আগুন জ্বলা উচিত।

মাইকেল বলল: আমাকে ভুল বুঝো না, বন্ধু। আমায় বিশ্বাস করো—আমি তাকে ঘৃণা করি এবং এত ঘৃণা করি যে তুমিও হয়ত ততটা কর না।

—উহুঁ।—পিগাসক বলে: তা হয় না, এ সম্ভব নয় কোনমতেই। আইভান ওগারেফের কথা যখন আমার মনে হয়—যখন ভাবি যে সে আমাদের পবিত্র পিতৃভূমি কলঙ্কিত করেছে, তখন রাগে আমার সমস্ত শরীর রি-রি ক'রে ওঠে—মনে হয় যদি একবার হাতের কাছে তাকে পেতাম, তা হ'লে…

মাইকেল বলে: হাঁ, যদি হাতের কাছে পেতে তা হ'লে…

—তা হ'লে দেখতে, তাকে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলতাম।

—ঠিক বলেছ। আমিও তাই করতাম।—মাইকেল মুখ চেপে বলে।

চব্বিশ

আটদিন পরে ক্রেস্‌নয়েয়ার্স্ক শহর দেখা গেল দূরে। অতটা দূর-পথ তারা পেরিয়ে এল নির্বিঘ্নে। অবশ্য তার কারণ ছিল।

ইয়েনিসেইস্ক শহরে রাশিয়ান গভর্নমেন্ট তাড়াহুড়ো করে একদল সৈন্য সংগ্রহ করেছিল। টমস্ক শহর পুনরায় অধিকার করার জন্যে এই দল অকস্মাৎ তাতার সেনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু আমীরের সৈন্যবাহিনীর তুলনায় তারা ছিল নগণ্য। শেষ পর্যন্ত যদিও তারা হটে গেল তথাপি কয়েকদিন পর্যন্ত ইরকুটস্কের পথ বন্ধ ক'রে রেখেছিল।

শহর সেখান থেকে আরও আধ ভারস্ট দূরে। ডাইনে বাঁয়ে রাস্তায় দু'পাশে পোঁতা রয়েছে ছোট-বড় অসংখ্য ক্রস। সন্ধ্যার আবছা আলোয় শহরের বাড়ীঘর ও গীর্জার উঁচু চূড়া অস্পষ্ট দেখা যায়।

কিছুদূর এগিয়েই গাড়ী হঠাৎ থেমে গেল। মাইকেল নাদিয়াকে জিজ্ঞেস করল: আমরা এখন কোথায় বোন?

নাদিয়া বলল: শহরের কাছাকাছি রাস্তার ওপর।

—তাই নাকি!—মাইকেল আশ্চর্য হল। : কোন সাড়া শব্দ নেই যে! শহরটা কি তা হ'লে ঝিমিয়ে পড়েছে?

নাদিয়াও আশ্চর্য হল শহরের নীরবতা দেখে। তাইতো! একটা আলোও দেখা যায় না কোথাও। শহরে ধোঁয়াও আকাশে নেই।

—এ কেমন এক আজব শহর! শহর, অথচ, শহরের চঞ্চল কোলাহল নেই। এই তো সন্ধ্যা হ'ল ব'লে। এরই মধ্যে অধিবাসীরা ঘুমিয়ে পড়েছে?

একটা আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় মাইকেলের মন কেমন ভারি হয়ে উঠল। নাদিয়া মাইকেলের মনের ভাব বুঝতে পেরেও কোন কথা বলল না।

গাড়ী এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিল। মাইকেল, বলল: আচ্ছা বন্ধু, গাড়ীটাকে আবার থামিয়ে রাখলে কেন?

—ও, আমার ভয় হয়, গাড়ীর কাঁচ্-কাঁচ্ শব্দে পাছে এই ঘুমন্ত পুরীর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে!—এই ব'লেই নিগাসক হেসে ঘোড়ার লাগামটা একটু নেড়ে দিল। গাড়ী আবার চলতে থাকে ঢিমে-তালে। কুকুরটা মাঝে মাঝে

ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। অল্পক্ষণ পরেই তারা এসে পড়ল শহরের এক বড় রাস্তায়।

নিস্তব্ধ শহর। ঝড়ের পূর্বমুহূর্তে যেন প্রকৃতির শান্ত ভাব। রাস্তায় পাহারাওয়ালা নেই, সৈন্যসামন্ত আর টহল দিয়ে বেড়ায় না। ফুটপাতে লোক নেই। রাস্তার দুপাশে বড় বড় বাড়ী, ওরাই যেন শহরের নীরব অধিবাসী—মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সগবে। পার্কগুলি জনশূন্য। গীর্জার ঘন্টা আর বাজে না। রাশিয়ার শহরে এ যেন নিতান্ত অস্বাভাবিক।

কয়দিন আগে সরকারী আদেশে অধিবাসীরা শহর খালি ক'রে দিয়ে চ'লে গেছে নিরাপদ অঞ্চলে। অফিস, দপ্তর—এমন কি সৈন্যদল পর্যন্ত সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এমনভাবে শহরটিকে খালি করা হয়েছে যে বিদ্রোহীরা এখানে এসে যেন সামান্য খড়কুটোও না পায়।

জনশূন্য শহরের ভেতর দিয়ে গাড়ী এগিয়ে চলল। মাইকেল, নাদিয়া বা পিগাসফ—কারও মুখে কথা নেই। সবাই যেন এক সময়ে বোবা হয়ে গেছে। গাড়ীর কাচ্-কাচ্ আওয়াজ—ঘোড়ার খুরের খুট্‌খাট শব্দ মৃতপ্রায় শহরের বুকে চেতনার সাড়া জাগাল। মাইকেলের মন জ্ব'লে ওঠে রাগে। দুর্ভাগ্য তার পেছনে পেছনে ধাওয়া করেছে, তাকে এড়িয়ে সে কিছুতেই যেতে পারছে না। কিন্তু মুখে সে কিছুই প্রকাশ করল না।

পিগাসফ এ শহরে এসেছিল একটা চাকরির আশায়। তার বিশ্বাস ছিল, কর্তব্যকাজে সে কোনদিন অবহেলা করেনি। এমন কি, বিপদের মুখেও কালভান স্টেশনে বিশ্বস্তভাবে সরকারী কাজ করেছে। কাজেই এখানে এসে টেলিগ্রাফ অফিসে নিশ্চয়ই একটা সরকারী চাকরি মিলবে।

কিন্তু পিগাসফ এবার হতাশ হ'ল। শহরের অবস্থা দেখে চেঁচিয়ে বলল: হা কপাল! এ মরুভূমিতে কে আমায় চাকরি দেবে?

নাদিয়া পরামর্শ দিল: এখানে তো আর কিছুই হবার নয়। কাজেই আমাদের সঙ্গে ইরকুটস্কে চল। সেখানে নিশ্চয়ই একটা সুবিধে হবে।

পিগাসফ ভরসা পেল। বলল: বেশ তো! চলো তা হ'লে! ইরকুটস্ক এবং ঐভিনস্ক—এ দু'শহরের মধ্যে এখনো হয়ত তারের যোগাযোগ রয়েছে. কাজেই সেখানে...তা হ'লে এখনই রওনা হওয়া যাক।

মাইকেল আপত্তি জানাল: না বন্ধু, রাত্তিরটা এখানেই কাটুক। ভোর বেলায় রওনা হওয়াই ভাল।

নাদিয়া করুণভাবে তাকাল মাইকেলের মুখের দিকে। সে বুঝতে পারল—

মাইকেল কি বলতে চায়। পথে জেনিসী নদী। যেমন বড় তেমনি ভয়ঙ্কর। রাতের বেলায় এ নদী পার হ'তে যাওয়া শুধু বিপজ্জনক নয়—অসম্ভব। এ কারণেই মাইকেল ভোরের আলোয় রওনা হতে চায়।

পিপাসক আর কোন কথা না ব'লে একটা খালি বাড়ীর উঠানে এসে দাঁড়াল।

পরদিন ২৬শে আগস্ট।

শেষ রাত্রিরে তারা রওনা হ'ল—ভোরবেলায় এসে পৌঁছোল জেনিসী নদীর তীরে। নাদিয়া চিন্তিত হল নদীর ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে।

মাইকেল একবার মুখ তুলে এদিক ওদিক তাকাতে চেষ্টা করল। যেন সব কিছুই সে দেখতে চায়। পরে নাদিয়াকে জিজ্ঞেস করল: নদীর ঘাটে কোন নৌকা দেখতে পাও কি?

নাদিয়া বলে: এখনো তো আঁধার কাটেনি, দাদার। গাঢ় কুয়াশা—কিছুই দেখা যায় না।

নদীর গর্জন শুনা যায়—যেন মত্ত ঝড়ের মাতামাতি।

কিছুক্ষণ পর সূর্য উঠল। কুয়াশার আবরণ স'রে যেতে লাগল ধীরে ধীরে।

মাইকেল আবার জিজ্ঞেস করল: এখন রোদ উঠেছে বোধ হয়। কিছু দেখতে পাও কি?

—এখনো তেমন কিছু দেখা যায় না। একটু পরেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

পিপাসক এবার কথা বলল: ব্যস্ত হয়ো না বন্ধু! এখনি চারদিক ফরসা হবে দেখ, কেমন বাতাস বইছে। কুয়াশা কাটল ব'লে। ওপারের গাছ-পালা অল্প অল্প দেখা যায় এখন। ডালপালা বাতাসে দুলছে—না? আহা, সূর্যের আলো কেমন ঝিকমিক করে! দেখ—দেখ, কুয়াশা এখন ধোঁয়ার মতো পালাচ্ছে। চমৎকার!—মধুর দৃশ্য! আহা বেচারী। তুমি কিছুই দেখতে পাও না।

—নৌকো-টৌকো দেখতে পাও কি? আগ্রহভরে মাইকেল জিজ্ঞেস করল।

পিপাসক বলল: কৈ—না তো!

—ভাল ক'রে দেখ বন্ধু। এপারে ওপারে—সবদিকেই দেখ, যতদূর তোমার চোখ যায়। নৌকো, ভেলা বা গাছের শালতি—কোথাও কিছু আছে কি না।

পিপাসক ও নাদিয়া খুব মনোযোগ দিয়ে চারদিকে তাকায়। তাদের লক্ষ্য

পড়ে অনেক দূর অবধি। জেনিসী নদীর বিশালতা দেড় ভারসুটের কম নয়। দুই দিকে দুইটি শাখা অসমান বাহুর মতো চলে গেছে। মাঝখানে নোঙর-করা জাহাজের মতো ঝোপজঙ্গলে ভরা কয়েকটি ছোট চড়া। চড়ায় বাধা পেয়ে নদী আরও ক্ষেপে উঠেছে। অপর তীরে পাহাড়ে জঙ্গল। পাহাড়ের ওপর গাছপালার মাথায় মাথায় সোনালি রোদের আভা—চমৎকার শোভা।

কিন্তু এপারে বা ওপারে চড়ায় বা নদীর বুকে ফেরি বা কোন রকমের নৌকোর চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। মাইকেল বুঝতে পারল—সরকারী আদেশে খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়ে গেছে। ফেরি, নৌকা, শালতি বা ভেলা—যেখানে যা ছিল সরিয়ে ফেলা হয়েছে আগেই। অথবা ভেঙে-চুরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতারবাহিনী যাতে নদী পার হয়ে ইরকুটস্কের দিকে যাবার সুবিধা না পায় অথবা কিছুদিনের জন্ত বাধা পায়, সেজন্তেই এই ব্যবস্থা।

অল্প দূরে ছিল একটি গ্রাম। মাইকেল বলল: তা হ'লে চল ঐ গ্রামে সেখানে গিয়ে দেখা যাক কোন উপায় হয় কি না।

তারপর তারা এল গ্রামে। খেয়াঘাটও পাওয়া গেল। কিন্তু নৌকো বা ভেলা কিছুই সেখানে ছিল না।

নাদিয়া ও নিকোলাস হতাশ হয়ে পড়ল।

মাইকেল বলল: নিরাশ হ'লে তো চলবে না। ওপারে আমাদের যেতেই হবে। খুঁজে দেখ, শুকনো কাঠ বা গাছপালা কিছু যদি পাওয়া যায়।

কিন্তু বৃথা চেষ্টা। অনেক খোঁজাখুঁজির পর এক জায়গায় মাত্র পাওয়া গেল কয়েকটি 'কৌমিসে'র পিপে। 'কৌমিস' রাশিয়াদেশের একরকম পুষ্টিকর মদ। সাইবেরিয়া অঞ্চলে এর খুব প্রচলন। ছোট-বড় সবাই খায়। জলের মশকের মতো চামড়ার তৈরী সরু-মুখওয়ালা বড় বড় পিপের 'কৌমিস' ভ'রে রাখা হয়।

মাইকেল নিশ্চিন্ত হ'ল যেন। বলল: এক কাজ করা যাক। একটা পিপে আমাদের অসময়ের জন্তে রেখে বাকী কয়টা এখুনি খালি ক'রে ফেলো।

নাদিয়া ও নিকোলাস আশ্চর্য হল মাইকেলের কথায়। শেষে নিকোলাস বলল: তুমি কি বলছ বন্ধু, এমন দামী মদ ফেলে দেবে?

মাইকেল বলল: কি হবে রেখে? আগে নদীটা পার হওয়া দরকার।

নিকোলাস এখনও বুঝতে পারল না—মাইকেল কি বলতে চায়। জিজ্ঞেস করল: তুমি কি তাহ'লে এ পিপেগুলো চ'ড়ে নদী পার হবে নাকি?

মাইকেল হেসে জবাব দিল: হাঁ ভাই। পিপেগুলো খালি ক'রে হাওয়ায়

ভ'রে মুখ বেঁধে নেব। আমাদের গাড়ী ভেলার কাজ করবে। গাড়ীর চারপাশে বেঁধে দেব হাওয়া-ভরা পিপেগুলো। তা হ'লে দেখবে, জলের ওপর দিয়ে গাড়ীখানা আমাদের সবাইকে কি ভাবে ওপারে নিয়ে চলে।

—বাহারে বুদ্ধি তোমার।—পিগাসফ আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। : আর আমাদের ভাবনা কি? এসো আর দেরি নয়।

পিগাসফ তাড়াতাড়ি পিপেগুলো খালি ক'রে দিল, মাত্র একটি পিপে রাখল নিজেদের জন্তে। তারপর তিনজনেই মুখে ফু দিয়ে দিয়ে বেশ ক'রে সেগুলো হাওয়ায় ভ'রে নিল।

মাইকেলের কথামতো পিগাসফ একটি পিপে বেঁধে দিল ঘোড়ার গলায়, আর একটি বাঁধল তার পেছন দিকে। বাকী কয়টিকে শক্ত ক'রে জুড়ে দেওয়া হ'ল গাড়ীর চারদিকে—জলের ওপর যাতে সমানভাবে ভাসতে পারে।

তারপর গাড়ীটাকে নামানো হ'ল জলে। পার থেকে জলের ধার অবধি পথ বেশ ঢালু ছিল। কাজেই হড় হড় ক'রে নেমে পড়ল গাড়ী।

সাবোও বেশ সাহসী। সে-ও গাড়ীর সঙ্গে জলে নেমে পড়ল।

এবার গাড়ীতে চেপে বসে সবাই। মাইকেল ঘোড়ার লাগাম ধরল। পথ দেখাতে লাগল পিগাসফ। নাদিয়া বসল মাইকেলের পাশ ঘেঁসে। ঘোড়াটাকে আড়াআড়িভাবে খুব সতর্কভাবে রাখা হ'ল, যাতে স্রোতের বিপরীত অবস্থায় প'ড়ে নাকাল না হ'য়ে পড়ে। স্রোতের টানে গাড়ী চলল বেশ সহজ ভাবে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা ঘাট থেকে অনেক দূরে এসে পড়ল।

কিন্তু স্রোতের গতি একধারায় ছিল না। নদীর কোন কোন যায়গায় বড় বড় ঘূর্ণি ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে গাড়ীটা এমনি একটা পাকে পড়ে গেল এবং ঘুরে ঘুরে এগিয়ে যেতে লাগল অশান্ত ঘূর্ণির মুখে। মাইকেল শত চেষ্টা ক'রেও সামলে রাখতে পারল না।

মহাবিপদ। ঝড়ের মুখে ক্ষীণ খড়কুটোর মতো আরোহীদের নিয়ে গাড়ীটা আরও বেগে ঘুরপাক খেয়ে ঘূর্ণির মুখে এগিয়ে আসতে লাগল—এ যেন সার্কাসের তাঁবুর ভেতর সীমাবদ্ধ চক্রে ঘোড়সওয়ারের অবিরাম পাক খেয়ে চলা। ঘোড়াটা নাকানি চুবানি খেয়ে খেয়ে আধমরা হ'য়ে উঠল। সাবোও আর সাঁতরাতে না পেরে কোন রকমে গাড়ীতে আশ্রয় নিল।

মাইকেলের মনে হ'ল—গাড়ীটাকে সামলিয়ে রাখা আর কিছুতেই সম্ভব নয়। যে-কোন মুহূর্তে তারা ঘূর্ণির মুখে প'ড়ে তলিয়ে যেতে পারে।

নাদিয়ার মুখে কোন কথা নেই। গাড়ীটা পাকের টানে যতই ঝাঁকুনি খায় ততই সে দু'হাতে মাইকেলকে আঁকড়ে ধরে—যাতে প'ড়ে না যায়।

আর পিগাসফ? সে নির্বিকার। এই মহাবিপদের গুরুত্ব সে যেন বুঝতেই পারে না। এ কি সাহসের পরিচয়, না তার ঔদাসীন্য? জীবনের ওপর কি মোটেই দরদ নেই তার? দু'দিনের জীবন—যেন গৃহস্থবাড়ীতে অতিথির এক তিথির জন্যে আসা। দুদিন আগে-পরে তো তাকে এ সংসার ছেড়ে যেতেই হবে—এই কি তার মনোভাব? যা হোক, তার মুখের প্রসন্ন হাসি এক নিমেষের জন্যেও মলিন হ'ল না।

বিপদের মুখে মাইকেল আর মুহূর্ত দেরি করল না। ঝপ্ করে লাফিয়ে পড়ল জলে। দুহাতে ঘোড়ার লাগাম সজোরে টেনে ঘোড়াটাকে এমন টান দিল যে শেষ টানে গাড়ীটা ঘূর্ণিপাকের কবল থেকে স'রে এল কিছু দূরে।

মাইকেলের এই দুঃসাহসের জয় হ'ল। বিপদ কাটল।

পিগাসফ মহোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল: হুররে

দু'ঘণ্টার মধ্যেই গাড়ী নদীর প্রশস্ত মুখ পেরিয়ে একটা চড়ায় গিয়ে ঠেকল।

তারপর এক ঘণ্টা বিশ্রাম।

জায়গাটা চমৎকার। বড় বড় গাছপালা নানাদিকে ঝুঁকে পড়েছে। বিশ্রামের পর তারা বাকি পথ পাড়ি দেবার জন্যে আবার নদীর ধারে এল।

এদিকটা অনেক নিরাপদ ছিল। কোন ঘূর্ণিপাক ছিল না—কিন্তু স্রোতের বেগ ছিল খুব বেশি। তাতে বরং সুবিধেই হ'ল। স্রোতের টানে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তারা পারে গিয়ে পৌঁছল নিরাপদে

সাইবেরিয়ার সব নদীই এই রকম ভীষণ—পার হওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। তা ছাড়া মাইকেল স্ট্রগফের ওপর যেন ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাস চলেছিল।

পারে পা দিয়েই পিগাসফ একটা মস্ত বড় নিশ্বাস ফেলে বলল: বাবা! মস্ত সাগর পাড়ি দিয়ে আমরা অপরাজেয়ের কূল পেলাম এতক্ষণে। রহস্যময় যাত্রাপথ: অনন্ত তা'র বিপজ্জনক—

মাইকেল গম্ভীরভাবে বলল: কিন্তু আমাদের পক্ষে যা বিপজ্জনক, তাতার সেনাদের কাছে তা অসম্ভব ব'লেই মনে হবে।

পঁচিশ

ইরকুটস্কের পথ এবার নিরাপদ। তাতারবাহিনী এখন অনেক দূরে। যখন তারা ক্রেস্নয়েরার্স্কে পৌঁছোবে তখন কেবল দেখতে পাবে জনশূন্য শহর—বিজন পথঘাট। তার ওপর মস্ত বড় বাধা এই য়েনিসী নদী।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার পথযাত্রা। এখান থেকে পথঘাটও বেশ ভাল। দুপাশে বড় বড় গাছ। মাঝে মাঝে অনেক দূর অবধি পাইন আর দেবদারু বন।

গাছের ছায়ায় ছায়ায় গাড়ী চলল। কোথাও জন-মানবের সাড়া নেই। গ্রামের পাশ দিয়ে, পল্লীর ভেতর দিয়ে তারা চলল। বাড়ীঘর পরিত্যক্ত—নির্জন। সরকারী হুকুমে অধিবাসীরা আগেই স'রে গেছে।

২৮শে ও ২৯শে আগস্ট এই দুইদিনে তারা ১২০ ভারস্ট পথ পেরিয়ে রিবিনস্ক নামক স্থানে পৌঁছুল। সেখান থেকে আরও পঁয়ত্রিশ ভারস্ট দূরে কামস্ক শহর। আর সেখানে পৌঁছুল তার পরের দিন।

এ শহরেও লোকজন নেই। শূন্য গীর্জাঘর, সরাইখানা খালি। শহরে পথ খাঁ খাঁ করছে। শহর পেছনে ফেলে তারা আরও এগিয়ে গেল। মাইকেল জানাল, এবার পরে নিজনী-ওডিনস্ক শহর। ইরকুটস্কে পৌঁছুবার আগে এ ছাড়া আর কোন শহর নেই।

পিগাসক বলল: তা জানি। সেখানেও টেলিগ্রাফ অফিস আছে। কিন্তু সে শহরও যদি কামস্ক শহরটির মতো মরুভূমি হয়ে থাকে তা হ'লে কেমন হবে? শেষ পর্যন্ত ইরকুটস্কেই যেতে হবে দেখছি। কি আর করি বল? একটা চাকরি বাকরি না হ'লে চলবে কেন?

মাইকেলের মনে ভরসা জাগে। ভাবে—আর কোথাও দেরি করা চলবে না। আট দিনের মধ্যে না হোক—দশ দিনের ভেতর ইরকুটস্কে পৌঁছে মহামান্য গ্রাণ্ড ডিউকের সঙ্গে দেখা করতে পারব।

এমনি সময় পিগাসক 'আহা' 'আহা' ক'রে চেঁচিয়ে উঠল।

রাস্তার পাশের ঝোপ থেকে হঠাৎ একটি খরগোশ গাড়ীর সামনে দিয়ে রাস্তা ডিঙিয়ে ছুটে পালাল।

মাইকেল সচকিত হয়ে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করল : কি—কি হোল···

—তুমি দেখতে পাওনি ? পিগাসক চেঁচিয়ে বলল। কিন্তু মাইকেলের চোখের ওপর নজর পড়তেই তার মুখ কালো হ'য়ে উঠল। বলল : না—না—না, তুমি—তুমি কি ক'রে দেখবে বল ? সৌভাগ্য যে দেখতে পাও নি।

—কৈ, আমিও তো কিছু দেখিনি !—নাদিয়া বলল।

—ভালোই হ'ল তা হ'লে।—পিগাসক বলল : ভালোই হ'ল যে দেখতে পাওনি। কিন্তু আমি—হাঁ, আমি দেখেছি।

—এমন কি দেখেছ ?—মাইকেল জিজ্ঞেসা করল।

—একটা খরগোশ রাস্তা ডিঙিয়ে গেছে।—ব'লেই পিগাসক ভয়ানক আক্ষেপ করতে লাগল।

রাশিয়ার সাধারণ লোকের বিশ্বাস, খরগোশ যদি পথ ডিঙিয়ে যায় তা হ'লে পথিকের অমঙ্গল ঘটে। পিগাসকও এই সাধারণের একজন। আশঙ্কায় উদ্বেগে সে গাড়ী থামিয়ে দিল।

মাইকেল পিগাসকের মনের ভাব অনুভব করল। কিন্তু এ সব ব্যাপারে তার মোটেই বিশ্বাস ছিল না। কাজেই সে নানা কথায় বন্ধুকে চাঙ্গা ক'রে তুলবার চেষ্টা করল।

মাইকেল বলল : ভেবো না, ও কিছু নয়।

পিগাসক বিবর্ণমুখে বলল : আমি জানি বন্ধু, তোমার পক্ষে ও কিছু নয়। —এ বোনটির পক্ষেও অশুভ নয়। কিন্তু যত কিছু আমার বেলায় হবে। —তারপর একটা ঢোক গিলে বলল : যাক, ভেবে আর কি হবে ? ও আমার অদৃষ্ট—কপালের লেখা।

এই ব'লেই সে ঘোড়াকে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ীটাকে চালিয়ে দিল।

দ্বিধা সঙ্কোচের ভেতর দিয়ে সেদিন কাটল নির্বিঘ্নে।

পরদিন ১৬ই সেপ্টেম্বর। বিশ্রাম করার জন্যে তারা গাড়ী থামাল একটা সাদা বাড়ীর সামনে।

গাড়ী থেকে নেমেই নাদিয়া কুড়িয়ে পেল দুখানি ছোরা। সাইবেরিয়ার শিকারীরা এ রকম ছোরা ব্যবহার করে। নাদিয়া একটি মাইকেলের হাতে দিল এবং আর একটি লুকিয়ে রাখল নিজের কাছে।

পিগাসকের মন তখনও উসখুস করছিল। কিছুতেই সে আগের মতো শান্ত হ'তে পারল না। যে অমঙ্গল চিহ্ন সে দেখেছে, তাতে যে একটা কিছু না ঘ'টে যাবে না—এ বিশ্বাস তার কিছুতেই গেল না। যে লোক এতক্ষণ

সাত-পাঁচ কথা না ব'লে থাকতে পারে না, এ ব্যাপারের পর সে সম্পূর্ণ বোবা হয়ে গেল। নাদিয়া কত চেষ্টা করল—তার মনে উৎসাহ ফিরিয়ে আনতে, কিন্তু সবই বৃথা হ'ল। সংস্কার-অন্ধ সমাজে পিগাসফের জন্ম। কাজেই সমাজে প্রচলিত এ রকম ধারণাকে কিছুতেই সে মিথ্যে ব'লে উড়িয়ে দিতে পারে না।

এখন থেকে গাড়ী তাড়াতাড়ি চলতে লাগল। পিগাসফের আর কোনদিকে খেয়াল নেই। ঘোড়াটির ওপরেও নয়। এখন যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি গন্তব্যস্থানে পৌঁছোবার জন্যে সে ব্যাকুল। বিপদের আশঙ্কায় সে ভীত—ইরকুটস্কের সীমায় না পৌঁছানো পর্যন্ত যেন তার স্বস্তি নেই।

তারপর সত্যসত্যই বিপদ-বিপর্যয়ের চিহ্ন চোখে পড়ে। পথে পথে যে দৃশ্য দেখা গেল, তাতে নাদিয়ার মনেও সন্দেহ জাগে। মাইকেলের কানে কানে সে বলে: আমার, বিপদ এখনও কাটেনি।

পথের দু'দিকে আবাদী জমি। জমির ফসল মাড়িয়ে নষ্ট ক'রে কারা যেন দ্রুত এগিয়ে গেছে ব'লে বোধ হ'ল। মাঠের ওপর ঘোড়ার পায়ের হাজার হাজার স্পষ্ট দাগ। শুধু তাই নয়, রাস্তার আশেপাশের ঝোপঝাড় পর্যন্ত মোচড়ানো—দোমড়ানো। গ্রামগুলি শ্রীহীন, ভাঙাচুরো আধপোড়া ঘরবাড়ী। দেওয়ালের গায়ে অসংখ্য গোলাগুলির দাগ।

মাইকেলের মনে মহা দুর্ভাবনার ঝড় উঠল। কিন্তু পাছে নাদিয়া ও পিগাসফ বিচলিত হয়ে পড়ে, এই ভয়ে সে মনের কথা প্রকাশ করল না। সে স্থির করল, কোন দুর্লঙ্ঘ্য বাধা যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ এগিয়েই যাবে। তারপর যা হয় দেখা যাবে। গাড়ী ক্রমাগত চলতে থাকে। মাঝে মাঝে রাশিরাশি কুণ্ডলী-পাকানো কালো ধোঁয়া দেখা যায় আকাশে। কোন কোন গ্রাম এখনও জ্বলছে দাউ দাউ ক'রে।

পথে পথে এমনি দৃশ্য দেখতে দেখতে সারা রাত্রি কাটে। ভোর বেলা গাড়ী হঠাৎ গেল থেমে। ঘোড়াটি কি দেখে লাফিয়ে পিছিয়ে পড়ল। সার্কোও ঘেউ ঘেউ করতে লাগল।

মাইকেল ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করল: ব্যাপার কি দেখতো, নাদিয়া।

—একটা লোক রাস্তার ওপর পড়ে আছে।—এই ব'লেই পিগাসফ গাড়ী থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে পড়ল।

একটি তাতার সেনার ছিন্নভিন্ন দেহ।

মাইকেলও নেমে এল। তারপর দুজনে দেহটাকে ধরাধরি ক'রে রাস্তার একপাশে সরিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ী চালিয়ে দিল। পথে পথে

এমন আরও দেখা গেল, অধিকাংশই মৃত তাতার সেনা—হাত-পা ছড়িয়ে প'ড়ে আছে।

সারাদিন ভয়ে ভয়ে তারা এগোতে থাকে। শেষবেলায় দেখা গেল নিজনী-ওডিনস্ক শহর। গির্জার চূড়োগুলো আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে। চারদিকে ধোঁয়ার মতো গাঢ় মেঘের কুণ্ডলী।

নাদিয়া ও পিগাসফ পথের সকল অবস্থা মাইকেলকে বলে। পরামর্শ চলে মাঝে মাঝে—কি করা যায়। এখানেও যদি কোন জনপ্রাণী না থাকে তো ভালোই। বিনা বাধায় এগিয়ে যাওয়া বরং সম্ভব হবে। কিন্তু যদি এ শহরও তাতারদের অধিকারে থেকে থাকে তা হ'লে তাদের এ পথ এড়িয়ে চলতে হবে।

মাইকেল বলল পিগাসফকে: সাবধানে চল বন্ধু—খুব হুঁশিয়ার!

অনেক দেখে নাদিয়ার মনে সন্দেহ জাগে। ভয়ে ভয়ে বলে: আকাশে ঐ যে কালো-কালো কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে ওগুলো কি মেঘ? আমার মনে হয়, ও মেঘ নয়। রাশি রাশি গাঢ় ধোঁয়া। শহরে আগুন লেগেছে যেন।

নাদিয়ার অনুমান সত্য। আরও কিছুদূর যেতেই ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে আগুনের হল্কা দেখা গেল। কিন্তু শহরে আগুন লাগাল কে? তাতারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে রাশিয়ানরাও এ কাজ করতে পারে। হয়ত এমন কোন সরকারী আদেশ হয়েছে—জেনিসী নদীর তীরভূমি থেকে প্রত্যেকটি গ্রাম শহর নগর পুড়িয়ে দিতে হবে, যাতে আমীরের সেনাদল কোথাও এসে আশ্রয় না পায়—সামান্য রসদও সংগ্রহ না করতে পারে।[1]

মাইকেল কিছুক্ষণ কি ভাবল। পরে বলল: বন্ধু, এবার সোজাপথ ছেড়ে চল প্রান্তরে নেমে পড়ি। প্রত্যুত্তরে পিগাসফ কি কথা বলতে গেল, কিন্তু বলার আগেই দক্ষিণদিকে গুড়ুম করে বন্দুকের আওয়াজ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঘোড়াটি প'ড়ে গেল মাটিতে।

সকলেই এ ব্যাপারে চমকে উঠল। নাদিয়া ও পিগাসফ ঘাড় ফিরিয়ে দেখে দশ-বারো জন অশ্বারোহী ছুটে আসছে ঝড়ের বেগে।

অশ্বারোহীরা বিদ্রোহী দলের লোক। কিন্তু খাস আমীরের দলের লোক নয়। ওরা খুবশ ও হুতুকের সর্দারের অধীন। এই দল এগিয়ে আসে অন্য দিক দিয়ে। আইভান ওগারেফ বুঝতে পেরেছিল পূর্ব-সাইবেরিয়া জয় করতে হ'লে অন্য দিক দিয়েও একদল সৈন্য পাঠানো দরকার ইরকুটস্কের

---

১ যুদ্ধের সময়ে এ হ'ল পোড়ামাটির নীতি।

দিকে। তারই ইঙ্গিতে ও পরামর্শে বলখাস হ্রদের দক্ষিণ দিক দিয়ে আলতাই পর্বতের পাশ দিয়ে খুৎও ও কুতুজের সর্দারেরা এগোতে থাকে। তারপর আসে জেনিসী নদীর ধারে এবং তাদের অবাধ লুটপাট চলতে থাকে ইরকুটস্কের পথে, গ্রামে গ্রামে—শহরে নগরে।

নাদিয়া, মাইকেল স্ট্রগফ ও পিগাসফ ধরা পড়ল এ দলের হাতে।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই অশ্বারোহীরা বন্দীদের নিয়ে এল নিজনী-উডিনস্ক শহরে। কুকুরটিও তাদের সঙ্গ ছাড়েনি।

বিধ্বস্ত শহর। তখনও অনেক বাড়ীতে দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলছিল।

বিদ্রোহীরা নাদিয়া, মাইকেল ও পিগাসফকে নিয়ে আবার চলতে থাকে। পিগাসফ ভাগ্যের উপর নির্ভর ক'রে চুপ ক'রে রইল। নাদিয়া নির্ভর করল মাইকেলের ওপর। আর মাইকেল? সে যেন সম্পূর্ণ উদাসীন।

মাইকেল অন্ধ — এ কথা বিদ্রোহীরা প্রথমে বুঝতে পারে নি। কিন্তু পরে তারা যখন টের পেল, তখন তাদের নবরঙ্গ বেড়ে গেল—নিষ্ঠুর খেলা চলল মাইকেলকে নিয়ে।

একজন ব'লে উঠল: এইরে, সোনার চাঁদ যে চোখ বুঁজে চলে দেখছি।

তারপরেই স্বাভাবিক নিষ্ঠুরতাকে আর একটু শানিয়ে বিশুদ্ধ ক'রে নিল। তাদের একটি ঘোড়া দুর্বল হয়ে পড়েছিল। একজন ছুরির খোঁচা দিয়ে ঘোড়াটির চোখ দুটি অন্ধ করে দিয়ে মাইকেলকে চড়িয়ে দিল তার পিঠে।

দলের সবাই এ ব্যাপারে হো-হো ক'রে হেসে উঠল।

এ আশঙ্কাজনক অবস্থায় মাইকেল একান্ত গম্ভীর হ'য়ে পড়ল। তবে একটি শব্দও তার মুখ দিয়ে প্রকাশ পেল না। ঘোড়াটি অনবরত তাড়া খেয়ে হঠাৎ গেল ক্ষেপে। মাইকেলকে নিয়ে সে ইতস্তত ছুটতে লাগল। বিদ্রোহীরাও হৈ হৈ ক'রে উঠল। মহাবিপদ! সামনেই ছিল একটা গভীর খাদ। অন্ধ ঘোড়া সোজা ছুটে গেল সেদিকে।

পিগাসফ তাড়াতাড়ি এগিয়ে ঘোড়াটাকে থামাতে চেষ্টা করল, কিন্তু বাধা দিল বিদ্রোহীরা।

অন্ধ ঘোড়া মাইকেলকে নিয়ে হুড়মুড় করে তলিয়ে গেল গভীর খাদে।

পিগাসফ ও নাদিয়ার কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে আসে কাতর চীৎকার। হতভাগ্য মাইকেল! এই বুঝি তার শেষ পরিণতি?

পরে সবাই এগিয়ে গেল সেদিকে। দেখা গেল, মাইকেল দাঁড়িয়ে আছে —

বিশেষ কোন আঘাত পায় নি। বিপদ বুঝে মাইকেল ঘাড়ের একদিকে লাফিয়ে পড়েছিল কিন্তু ঘোড়া বেচারা দু-পা ভেঙে তখন অচল হয়ে পড়েছে।

এবার বিদ্রোহীরা ঘোড়ার মুখ থেকে লাগাম খুলে নিয়ে তাই দিয়ে মাইকেলকে বেশ শক্ত ক'রে বেঁধে টেনে নিয়ে চলল। অন্ধ ঘোড়াটাকে আর তারা বই দিল না। শেষ পর্যন্ত বেচারী শেয়াল-নেকড়ের ভক্ষ্য হয়ে প'ড়ে রইল।

মাইকেল চলতে লাগল হেঁটে। এত নিষ্ঠুরতায়ও সে যেন উদাসীন—নীরব, নির্বিকার। সে যেন এখনো সেই লোহার মানুষ।

ছাব্বিশ

তারপর ১২ই সেপ্টেম্বর। সেদিন ঘটল এমন বিসদৃশ এক অঘটন—যার ফল হ'ল অত্যন্ত শোচনীয়।

রাত্রি হয়েছে। ডাকাতেরা বিশ্রামের জন্য থামল এক গ্রামে। বিশ্রামের অবসরে তারা এত মদ খেল যে শেষ পর্যন্ত বিশ্রামের কথা ভুলে গিয়ে অতিরিক্ত নেশার ঝোঁকে রাত্রেই আবার রওনা হ'ল।

এ পর্যন্ত ডাকাতেরা নাজিয়ার প্রতি কোন অসৎ ব্যবহার করেনি। কিন্তু এবার একটি লোক নেশার ঝোঁকে বিশ্রী আচরণ প্রকাশ করতে লাগল।

মাইকেল অন্ধ। কিন্তু এ ব্যাপার শিশাসফের চোখ এড়াল না। রাগে সে জ্ব'লে উঠল। এবং মাতালের সম্মুখ থেকে নাজিয়াকে সরিয়ে আনবার জন্যে সোজা এগিয়ে গেল। সে একবারও ভাবল না, এর ফল কি হ'তে পারে। মাতাল সেনা গেল ভীষণ ক্ষেপে।

বন্দুকের গুলি খেয়ে শিশাসফ প'ড়ে গেল মাটিতে।

তখনো দুর্বৃত্তের রাগ পড়েনি। সে তখুনি ছুরি খুলে শিশাসফের দেহটাকে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলবার জন্যে হাত উঠাল।

ঠিক এই মুহূর্তে দলপতির হুকুম হ'ল: চলো—

মাতাল সেনা মুহূর্তের জন্য থামল। তারপর তাড়াতাড়ি শিশাসফকে তার ঘোড়ায় তুলে নিল।

মাইকেল আগে থেকেই সুযোগমত দাঁত দিয়ে হাতের বাঁধন প্রায় কেটে ফেলেছিল। হঠাৎ হেঁচকা টান পড়তেই সেই বাঁধন গেল ছিঁড়ে। নেশার

ঝোঁকে বিদ্রোহীদের কোন দিকেই আর খেয়াল ছিল না। তারা বরাবর এগিয়ে গেল। মাইকেল ও নাদিয়া প'ড়ে রইল পেছনে।

এই শোচনীয় দুর্ঘটনায় মাইকেল ও নাদিয়া শোকে অধীর হয়ে পড়ল। দুর্গম পথযাত্রায় দৈবাৎ যে বন্ধুটির সহায়তা তারা পেয়েছিল, নির্মম ভাগ্যের চক্রান্তে তাকে হারিয়ে নিতান্ত অসহায় বোধ করল।

তখন রাত্রি প্রায় ১০টা। পৃথিবী আঁধারে ছেয়ে গেছে। ঘরবাড়ি, মাঠ ঘাট কিছুই আর দেখা যায় না। শত্রুদল এতক্ষণে বহুদূরে চ'লে গেছে। বিশাল প্রান্তরে কেবল এই দুটি প্রাণী—মাইকেল আর নাদিয়া। একে অপরকে যে কি ব'লে সান্ত্বনা দেবে, সে ভাষাও যেন হারিয়ে ফেলেছে তারা।

অনেকক্ষণ পরে নাদিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাইকেলকে ডাকল: ব্রাদার…

মাইকেল নীরব। নাদিয়া আপন মনে বলে: হায় অদৃষ্ট! আমাদের সঙ্গ নিয়েই বেচারা শোচনীয় বিপদ ডেকে এনেছিল। আমার জন্যেই সে প্রাণ দিল।

এবারেও মাইকেল নীরব। দু'হাতে মুখ ঢেকে সে কি ভাবছে।

নাদিয়া আবার জিজ্ঞেস করল: ব্রাদার, এবার কি হবে? এখন আমরা কোথায় যাবো?

সহসা মাইকেলের চেতনা ফিরে এল যেন। সংক্ষেপে উত্তর দিল: ইরকুটস্কে।

নাদিয়ার মনে পড়ে মাইকেলের প্রতিজ্ঞার কথা। তাই সে আর কোন কথা না ব'লে উঠে দাঁড়ায়। শুধু বলল: তাহ'লে চল।

—হাঁ, চল বোন।—মাইকেল নাদিয়ার হাত ধ'রে উঠে দাঁড়াল।

রাত্রি কেটে যায়। ভোর হয়। দিনও প্রায় শেষ হয়ে আসে। মাইকেল ও নাদিয়ার চলার বিরাম নেই। তাদের আগে আগে তাতার সেনারাও এ পথ দিয়ে এগিয়ে গেছে, রাস্তার দু'দিকের অবস্থা দেখে স্পষ্ট বুঝা যায়। কোথাও প'ড়ে আছে মরা ঘোড়া, কোথাও-বা ভাঙা গাড়ী। বিদ্রোহীরা অবাধে লুটপাট চালিয়ে গেছে পথে পথে।

এবার সম্মুখে তেমন বিপদের ভয় ছিল না—যত ভয় ছিল পেছনে। বিশ্বাসঘাতক আইভান ওগারেফ আমীরের সেনাদল নিয়ে যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে এ আশঙ্কাই ছিল বেশি। কিন্তু নাদিয়া সব সময়েই সতর্ক ছিল। এমন কি বিশ্রামের সময়ে সে কোন পাহাড়ে বা উঁচু ঢিবির ওপর উঠে লক্ষ্য রাখত পশ্চিম দিকে। কিন্তু এপর্যন্ত বিশাল প্রান্তরের কোথাও ধুলোবালি পর্যন্ত উড়তে দেখা গেল না।

একদিন মাইকেল বলে : আহা নাদিয়া, তুমি কাতর হয়ে পড়েছ বোন ?

নাদিয়া জবাব দেয় : না ব্রাদার।

—কিন্তু তুমি যখন আর চলতে পারবে না—কষ্ট হবে, আমায় তখন ব'লো। বলবে তো ?

নাদিয়া মাথা নেড়ে বলে : আচ্ছা, বলব। এমনি কথায় কথায় এসে পড়ে বৃদ্ধা মার্ফা'র কথা। মাইকেল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে : মায়ের কথা আর কি বলব নাদিয়া, আমার জন্যেই তাঁর এই দুর্দশা। আমি শপথ করেছিলাম—মায়ের সঙ্গে দেখা করব না। কিন্তু সে শপথ আমি রাখতে পারিনি—আমি মহাপাপ করেছি।

নাদিয়া তাকে সান্ত্বনা দেয় : কিন্তু তুমি তো আর ইচ্ছে ক'রে শপথ ভঙ্গ করনি। দৈবাৎ দেখা হয়ে গেছে…

—কিন্তু আমার শপথ ছিল, নিজে ম'রে গেলেও অবিশ্বাসী হব না, ভুলেও দেখা করব না মায়ের সঙ্গে।

এ কথায় নাদিয়া অস্থির হয়ে পড়ে। তারপর ঠোঁট কামড়ে প্রত্যেক কথাটির ওপর জোর দিয়ে দিয়ে বলে : মাইকেল,—একবার ভেবে দেখতো, সন্তানের চোখের সামনে মায়ের ওপর এরকম অত্যাচার চলেছে, মায়ের পিঠের ওপর দুর্বৃত্তের নিদারুণ চাবুক উদ্যত—সে সময়েও কি ছেলে চুপ করে থাকতে পারে ? কক্ষণো নয়, মাইকেল। কোন শপথ—কোন প্রতিজ্ঞাই এক্ষেত্রে বাধা দিয়ে রাখতে পারে না।

—কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়েছে, বোন। আমি মহা অপরাধী। ভগবান আমায় ক্ষমা করুন।

এই ব'লে মাইকেল মাথা নোয়ায় ভগবানের উদ্দেশে।

নাদিয়া এবার ধীরে ধীরে বলল : একটা কথা তোমায় অনেকবার জিজ্ঞেস করব ব'লে ভাবছিলাম। ভাল মনে কর তো ব'লো। নইলে ব'লো না অবশ্য তাতে আমি দুঃখিত হব না।

মাইকেল বলল : বেশ, বলো তোমার কথা।

নাদিয়া বলল : তোমার হাতে যে চিঠিখানা ছিল, দুষ্ট আইভান তা কেড়ে নিয়েছে। তবু ইরকুটস্কে যাবার জন্যে তোমার এত তাড়াহুড়ো কেন ? তাহ'লে আমি কি মনে করব যে আমাকে বাবার কাছে পৌঁছে দেবার জন্যেই তুমি এতটা ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছ ?

মাইকেল নাদিয়ার হাত ধ'রে বলে : না নাদিয়া—তা নয়। আমি চলেছি

কর্তব্যের দায়ে। এখন তোমার চোখই আমার চোখ। তুমিই তো এখন আমাকে নিয়ে চলেছ! জানি না ভাগ্যে কি ঘটবে। কিন্তু আমাকে যে আইভান ওগারেফের আগে সেখানে পৌঁছুতেই হবে।

নাদিয়া বুঝতে পারে—আরও অনেক কথা আছে, যা মাইকেল তাকে বলতে পারে না। কর্তব্য সে করবেই।

তিন দিন পর।

১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে মাইকেল ও নাদিয়া আরও সত্তর ভার্সট দূরে এক গ্রামে পৌঁছুল। তখন নাদিয়ার অবস্থা শোচনীয় হ'য়ে উঠেছে। পা আর চলে না, সময় সময় যন্ত্রণায় সব শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে। তবু সে থামতে রাজি নয়। মুখ বুঁজে সে সব কষ্ট সহ্য ক'রে চলতেই থাকে।

এভাবে আরও তিন দিন গেল। পথে পথে দেখা গেল—অরণ্য শস্যক্ষেত্র—বাড়ীঘর জ্বলে পুড়ে নিভে গেছে। অসহায় অধিবাসীদের মৃতদেহ প'চে গলগল্ করছে পথে পথে।

বিদ্রোহীদের একদল কয়েকদিন আগেই এপথ দিয়ে চ'লে গেছে। এ সব বিকৃত দৃশ্য তারই প্রমাণ। কিন্তু তখন পর্যন্ত পেছনে আমীরের সেনাদলের আসার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। মাইকেলের মনে আশা জাগে। তার মন প্রত্যেকবারই তাকে সচেতন ক'রে দেয়: গ্র্যাণ্ড ডিউকের জীবন তোমার হাতে—রাশিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তোমার ওপর।

মাইকেলের সঙ্কল্প আরও কঠোর হয়—ইরকুটস্কে তাকে যেতেই হবে।

আবার মনে হয় পথের কথা। ইরকুটস্ক এখনো বহুদূর।

নাদিয়ার মুখে কোন কথা নেই। সে মাইকেলের হাত ধ'রে নীরবে চলে। কিন্তু মাইকেল যে নাদিয়ার অবস্থা বুঝতে পারে না—তা নয়। যতই মনের বল নাদিয়ার থাকুক, দেহের শক্তিতে কত আর পেরে উঠবে? হয়ত এবার যে কোন মুহূর্তে সে এলিয়ে পড়বে। মাইকেল অন্ধ, নতুবা নাদিয়া আগেই বলত—মাইকেল, আর আমি পারিনে। কিন্তু অন্ধ মাইকেলের একমাত্র অবলম্বন সে, কি ক'রে সে এ কথা বলে!

১৮ই সেপ্টেম্বর তারা এসে পৌঁছোয় এক গ্রামে। তখন সন্ধ্যার আঁধার নেমে এসেছে। নাদিয়া একটা পাহাড়ের উঁচু ঢিবিতে দাঁড়িয়ে দেখতে পায়—আকাশের সীমারেখায় একটি দীর্ঘ অস্পষ্ট রেখা।

মাইকেল বলে: ও একটা নদী—নাম ডিন্‌কা।

নাদিয়া মাইকেলের হাত ধ'রে আবার উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু পা আর চলে না। আর একটা গ্রাম পেরিয়ে এসেই একটা উঁচু ঢিবির ওপর সে ধপ্‌ ক'রে ব'সে পড়ে।

মাইকেল সবই বুঝতে পারল। কিন্তু বলল : নাদিয়া, আর একটু জিরিয়ে নেবে ?

নাদিয়া বলে : এখন রাত হয়েছে, তুমি একটু জিরুবে না ?

মাইকেল বলল : ঐ নদীটা পার হয়ে গেলেই ভাল হয়। এ সময়ে আমীরের সেনাদল যদি এসেও পড়ে, তাহ'লে নদীর ব্যবধানে থাকলে খুব সুবিধে হবে। কিন্তু তুমি তো আর পেরে উঠবে না দেখছি।

নাদিয়া বলে : না ব্রাদার, পারবো—চলো।

মাইকেলকে নিয়ে নাদিয়া আবার উঠে দাঁড়ায়।

আরও দু'ভার্স্ট দূরে নদী—ইরকুটস্ক রোডের মধ্য দিয়ে তর্‌তর্‌ ক'রে বয়ে চলেছে। হয়ত নাদিয়ার এই শেষ চেষ্টা। তারপর কি হবে কে জানে ? আঁধার রাত্রি। মাঝে মাঝে আকাশে বিজুলির খেলা। সে আলোকে নাদিয়া পথ দেখে এগিয়ে চলে—ধীরে ধীরে। সম্মুখে অনেকদূর পর্যন্ত মরুভূমির মতো সমতল প্রান্তর। গাছপালা বা পাহাড় কোথাও কিছু নেই। চারদিক নীরব। একমাত্র তাদের পদশব্দ ও নিশ্বাস-প্রশ্বাসের অস্পষ্ট ধ্বনি নীরবতা ভঙ্গ ক'রে অনেক দূর পর্যন্ত ভেসে বেড়ায়।

চলতে চলতে নাদিয়া হঠাৎ এমন ভাবে থেমে পড়ে—যেন চোরা বালিতে উভয়েরই পা আটকে গেছে।

দূর হ'তে ভেসে আসে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ।

নাদিয়া জিজ্ঞেস করে : শুনেছ ব্রাদার ?

মাইকেল কি বলতে গেল। এমনি সময় ভেসে এল এক অসহায় করুণ সুর—মুমূর্ষুর কাতর শব্দের মতো। মৃত্যুকালে মানুষ যেমন ক'রে শেষ প্রার্থনা জানায়, এ স্বর অনেকটা সেই রকমের।

একটা শোচনীয় অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাদিয়ার মনে জাগে। সে কাতরভাবে চেঁচিয়ে ওঠে : নিখালক—নিখালক

মাইকেল নাদিয়ার হাত সজোরে চেপে ধরে।

নাদিয়ার মুখে কথা বেধে যায়, ক্ষীণকণ্ঠে বলে : এসো,—এসো, তাড়াতাড়ি এগিয়ে চল, ব্রাদার।

উত্তেজনায় নাদিয়ার শরীরে সহসা যেন অসুরের বল ফিরে আসে। সে মাইকেলকে টেনে নিয়ে চলে।

এতক্ষণ তারা ধুলোবালিময় রাস্তা ধ'রে চলেছিল, এবার মাইকেল পায়ের তলায় ঘাসের ছোঁয়া অনুভব করল। জিজ্ঞেস করল: আমরা কি এবার রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে পড়েছি, বোন?

নাদিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে বলে: হাঁ দাদা। এদিকেই যে। ডানদিক থেকেই তো আর্তনাদ ভেসে আসছে!

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা নদীর কাছাকাছি এসে পড়ল।

আবার কুকুরের চীৎকার। সঙ্গে সঙ্গে আগের চেয়েও ক্ষীণতর একটা আর্তধ্বনি নিকটেই শোনা গেল।

নাদিয়া হা-হুতাশ ক'রে উঠল: হায় ভগবান! ঐ তো সার্কো চেঁচাচ্ছে। প্রভুভক্ত কুকুর—প্রভুর পিছু নিয়েছিল।

মাইকেল চেঁচিয়ে ডাকে: পিগাসফ—পিগাসফ।

কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর এলো না। মাত্র শোনা গেল, কয়েকটি নিশাচর পাখীর পাখার ঝটাপট শব্দ। তারপর সে-শব্দও আকাশে মিলিয়ে গেল।

মাইকেল এবার কান পেতে কি শুনতে যেন চেষ্টা করল। বিজলীর চকিত আলোকে নাদিয়া চারদিকে তাকাতে লাগল সতর্কভাবে। কিন্তু তেমন কিছু দেখা গেল না।

খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ তারা শুনতে পেল—কে যেন ডাকছে—মাইকেলের নাম ধ'রে।

অতি ক্ষীণ আর্তস্বর।

মাইকেল ও নাদিয়া এবার চঞ্চল হয়ে উঠল। এমনি সময় সার্কো লাফিয়ে লাফিয়ে তাদের কাছে এসে কাতরভাবে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল।

কুকুরটিও ভীষণ আহত, রক্তাক্ত শরীর।

পিগাসফ নিকটেই কোথাও আছে। ক্ষীণস্বরে সেই কাতরাচ্ছে—মাইকেলের নাম ক'রে। কিন্তু কোথায় সে? নাদিয়ার বুক কাঁপতে লাগল। তার মনের সকল শক্তি যেন শিথিল হয়ে গেছে মুহূর্তে! অস্পষ্টভাবেও সে কোন কথা বলতে পারল না।

মাইকেল হামাগুড়ি দিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে এগোতে লাগল।

আবার সার্কোর ক্রুদ্ধ গর্‌ গর্‌ গর্জন। বাতাসে শোনা গেল একটা শোঁ শোঁ

শব্দ। মনে হ'ল, যেন একটা শিকারী পাখী সোঁ করে নেমে আসছে। আর সার্কো তাকে বাধা দিচ্ছে প্রাণপণে।

বিদ্যুতের আলোকে দেখা গেল একটা প্রকাণ্ড শকুনি সার্কোর আক্রমণে ক্ষেপে উঠেছে। সার্কোও তার ওপর লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু শকুনি তার ধারালো ঠোঁট ভীষণভাবে বসিয়ে দিল সার্কোর মাথায়। সার্কো আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। টলতে টলতে প'ড়ে গেল মাটিতে।

ঠিক এই মুহূর্তে আবার পিপাসকের চীৎকার ভেসে এল। এ চীৎকার আরও ভয়ানক।

নাদিয়া পাগলের মত হয়ে উঠল! পাখী এবার বুঝি পিপাসককে আক্রমণ করেছে।

—ঐ যে মাইকেল—ওদিকে—ওখানে··· ব'লেই সে ছুটে গেল। এক অন্ধকারে হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে গেল পিপাসকের ওপর।

অসভ্য তাতার জাতি। অতি নিষ্ঠুর তাদের শাস্তির নিয়ম। তারা আক্রোশ মেটায় শত্রুর হাত পা শক্ত ক'রে বেঁধে সমস্ত শরীর মাটিতে পুঁতে রেখে। কেবল মাথাটি রাখে বাইরে। মাথার ওপর দিয়ে রোদবৃষ্টি বয়ে যায়,—ক্ষুধাতৃষ্ণায় লোকটি পাগল হয়ে ওঠে। ক্ষুধার্ত নেকড়ের পাল মাথার ওপর কামড়াকামড়ি করে, আর খাপটাখাপটি করে শিকারী পাখীর দল। এইভাবে বেচারার মৃত্যু হয়।

হতভাগ্য পিপাসক। তাতারেরা তাকেও এমনিভাবে মাটিতে পুঁতে রেখেছিল। তিন দিন ধ'রে এমনি অবস্থায় পিপাসক তিলে তিলে মৃত্যুর অপেক্ষায় ছিল। পরে হঠাৎ শকুনির দৃষ্টি পড়ে তার উপর। কিন্তু প্রভুভক্ত সার্কো এ পর্যন্ত প্রভুকে বাঁচিয়ে রেখেছিল শকুনির আক্রমণ থেকে। শেষ পর্যন্ত সেও জীবন দিল।

মাইকেল কোমর থেকে ছুরি খুলে মাটি খুঁড়তে লাগল এলোমেলোভাবে। পিপাসক এতক্ষণ চোখ বুঁজে প'ড়ে ছিল। এবার সে চোখ মেলে তাকাল। চিনতে পারল না'দিয়া আর মাইকেলকে। অতিকষ্টে বলল: বিদায় বন্ধু।

কিছুক্ষণ পরে ক্ষীণকণ্ঠে জানাল: মরবার আগে তোমাদের পেলাম। বড়ভাগ্য আমার। বন্ধু, এবার তোমরা আমার জন্যে শেষ প্রার্থনা কর···

মাইকেল কোন কথাই লক্ষ্য করল না। সে কেবল পাগলের মতো মাটি খুঁড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত অতিকষ্টে গর্ত থেকে পিপাসককে উঠাল। কিন্তু পিপাসকের আত্মা অনেক আগেই বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

মাইকেল আবার ছুরি চালাল মাটির উপর। যেখানে শত্রুরা পিগাসফকে পুঁতে রেখেছিল সেই গর্তটাকে আরও বড় ক'রে মৃতদেহটিকে সযত্নে শুইয়ে দিল। প্রভুভক্ত কুকুর মার্কো—তাকেও শুইয়ে দিল প্রভুর পাশে।

ঠিক এমনি সময়ে ঠকাঠক্ ঠকাঠক্ শব্দ শোনা গেল দূরে। মাইকেল ও নাদিয়া চমকে উঠল।

হাজার হাজার ঘোড়ার খুরের মিলিত শব্দ। বড় রাস্তা ধ'রে তাতার সেনাদল ছুটে আসছে ডিন্‌কা নদীর দিকে।

মাইকেল ধীরে ধীরে ডাকল নাদিয়াকে: নাদিয়া—নাদিয়া

নাদিয়া মৃতের সদ্গতির জন্ম ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছিল একমনে। এবার মাইকেলের ডাকে সে ফিরে তাকাল।

মাইকেল বলল: দেখতো নাদিয়া, কারা যেন এদিকেই আসছে?

নাদিয়া ভাল ক'রে তাকাল। আকাশে বিজলী চমকাচ্ছিল। সে আলোকে দেখা গেল দূরে পিঁপড়ের সারির মতো বিদ্রোহীরা ছুটে আসছে ঘোড়ায় চ'ড়ে!

—খুব হুঁশিয়ার নাদিয়া। আমাদের কাজ এখনও বাকী রয়েছে।

মাইকেল পিগাসফের সর্বাঙ্গে একবার হাত বুলিয়ে নিল। মৃতের দু হাত সাজিয়ে দিল বুকের ওপর। শেষে নাদিয়ার পাশে ব'সে শেষ প্রার্থনা করল।

শান্ত ভদ্র পিগাসফ! মনুষ্যত্বের আহ্বানে সে নিজের জীবন দিয়েছে। মাটি দিয়ে তাকে ভাল ক'রে ঢেকে দিয়ে মাইকেল একটা নিশ্বাস ফেলে বলল: চলো নাদিয়া, আমাদের কর্তব্য এখানে শেষ হ'ল। বড় রাস্তা ধ'রে যাওয়া এখন অসম্ভব। চলো অন্য পথে। ডিন্‌কা নদী পার হয়ে আর কাজ নেই।

কিন্তু নাদিয়া আর এক পা ও চলতে পারল না। অবসন্ন হয়ে সে ব'সে পড়ল। মাইকেল বুঝতে পারল, কিন্তু আর বিলম্ব করা চলে না। তাই বলল: কিছু ভেবো না নাদিয়া। এখনও আমার শক্তি রয়েছে। চলো, আমি তোমায় নিয়ে যাবো।

এই ব'লেই মাইকেল দুহাত ধ'রে নাদিয়াকে পিঠে তুলে নিল।

এবার যাত্রা চলে দক্ষিণ পশ্চিম দিক ধ'রে। অসহায়া নাদিয়া পথ দেখাতে লাগল। ইরকুটস্ক এখনো বহু দূরে—আরও চুয়ান্ন ভার্সট্ পথ। কি ক'রে এই দীর্ঘ পথ পেরিয়ে যাবে তারা? মাইকেলের দেহ কি পরিশ্রমে এলিয়ে পড়বে না? সম্মুখে সেয়ানস্ক পর্বত। এ পর্বত পেরিয়ে যেতে হ'লে অস্বাভাবিক

শক্তির দরকার। তেমন শক্তি সে এখন কোথায় পাবে? কিন্তু মাইকেল নাদিয়া কারও মুখে কোন কথা নেই—পথ চলারও বিরাম নেই।

বারো দিন পরে।

২রা অক্টোবর শেষ-বেলায় তারা এক বিশাল জলাভূমির পাশে এসে-দাঁড়াল। সম্মুখে সীমাহীন বৈকাল হ্রদ।

সাতাশ

বৈকাল হ্রদ। দৃশ্য অতি সুন্দর ও বিচিত্র। সমুদ্র থেকে উচ্চতা ১৭০০ ফিট। নয়শত ভার্স্ট তার দৈর্ঘ্য এবং এপার-ওপারের ব্যবধান একশত ভার্স্ট। গভীরতা যে কত—কেউ বলতে পারে না। মাঝি-মাল্লাদের কাছে এ হ্রদ অতি পবিত্র—'সাগর মা' ব'লে তারা সম্বোধন করে।

হ্রদের প্রায় সব দিকেই আগ্নেয়-পাহাড়ের প্রাচীর। প্রায় তিনশত নদ-নদী পড়েছে এর বুকে। মাত্র একটি নদী ঘুরে ফিরে বেরিয়ে অনেক দূরে য়েনিসী নদীতে গিয়ে মিশেছে। নদীটির নাম আঙারা এবং এই নদীর পারেই বিশাল সাইবেরিয়ার রাজধানী ইরকুটস্ক নগরী।

এই হ্রদ-অঞ্চলের আবহাওয়াও অদ্ভুত রকমের। সাধারণ নিয়ম-অনুসারে এখানে হাওয়ার গতি ঠিক থাকে না—প্রায়ই অকাল ঝড় দেখা যায়। যে-সময়ের কথা বলছি, তখন শরতের আরম্ভ। কিন্তু আগেই শীত প'ড়ে গেছে। পাঁচটা বাজতে না বাজতেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, রাত্রি বড় হয়, আবহাওয়া শূন্য ডিগ্রীরও নীচে নেমে পড়ে। পাহাড়ের চূড়োয় সাদা সাদা বরফ জমতে থাকে। শীত যখন একটু বেশি পড়ে, হ্রদের জল জমে পাথর হয়ে যায়, তখন তার ওপর দিয়ে স্লেজগাড়ী চালিয়ে বা ঘোড়ায় চ'ড়ে ব্যবসায়ীরা এদেশে ওদেশে চলাফেরা করে। গ্রীষ্মের আগে এ বরফ আর গলে না।

মাইকেল নাদিয়াকে নিয়ে বৈকাল হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এসে দাঁড়াল। নাদিয়া এলিয়ে পড়েছে তার দু'বাহুর ওপর। শরীর আচ্ছন্ন। কেবল চোখ দুটি এখনও সচেতন।

এ পর্যন্ত প্রদেশে মাত্র দুটি প্রাণী—অন্ধ মাইকেল, অক্ষম নাদিয়া। বিরাম নেই—বিশ্রাম নেই, আহারের সংস্থান নেই, ক্লান্তিতে শরীর অবশ। এ অবস্থায়

একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কি ভরসা করতে পারে তারা? নাদিয়ার মনে কেবল এই দুশ্চিন্তা। কিন্তু মাইকেলের মনে বারবার একই প্রশ্ন জাগে: আর কতদূর···ইরকুটস্ক আর কতদূরে?

ওখান থেকে আঙারা নদীর মোহনা ষাট ভারস্ট দূরে এবং মোহনা থেকে ইরকুটস্ক নগর আশি ভারস্ট।—মোট এই ১৪০ ভারস্ট পথ অতিক্রম করতে হবে। বেশি দূর না—হেঁটে গেলে একজন সুস্থ লোকের পক্ষে মাত্র তিন দিনের পথ। কিন্তু মাইকেল এখনো কি লোহার মানুষ?

মহা সমস্যা। সম্মুখে মহাপরীক্ষা।

সাইবেরিয় প্রান্তরের এক প্রান্তে এই পর্বতপ্রদেশ। কোথাও লোকালয় নেই। কিন্তু পর্বত-পথের আড়াল পেরিয়ে আসতেই নাদিয়া চমকে উঠল হ্রদের ধারে একদল লোক দেখে। সংখ্যায় তারা পঞ্চাশ-ষাট জন হবে।

নাদিয়ার বুক দুরদুর ক'রে উঠল। তাতার সেনা? এদিকেও কি ওরা পাহারা বসিয়েছে?

পরক্ষণেই তার ভুল ভাঙল—আশার আলো ফুটল তার চোখে। মুখে স্বর জড়িয়ে গেছে, তবু সে উচ্ছ্বসিত আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল: রাশিয়ান—ওরা রাশিয়ান···

এইটুকু ব'লেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

হঠাৎ চীৎকার শুনে লোকগুলি ফিরে তাকাল তাদের দিকে। তারপর ছুটে এল সেদিকে। নাদিয়াকে সাবধানে উঠিয়ে এনে ভেলার ওপর শুইয়ে দিল সযত্নে।

এরা সবাই নিরীহ লোক—পলাতক, তাতারদের ভয়ে ঘরবাড়ী ছেড়ে নানা জায়গা থেকে এসে এখানে জড় হয়েছে। সবারই এক উদ্দেশ্য—ইরকুটস্কে যাওয়া। কিন্তু ডাঙা পথে যাবার আর কোন উপায় ছিল না। আঙারা নদীর দুই পারেই তাতার দল হানা দিয়েছে। কাজেই বৈকাল হ্রদ পেরিয়ে রাতের আঁধারে আঙারা নদী বেয়ে ইরকুটস্কে গিয়ে পৌঁছুতে পারবে, এই তাদের এক ভরসা।

মাইকেলের মন নেচে ওঠে পরামর্শ শুনে। এই শেষ সুযোগ। কিন্তু সে-মনের অতিরিক্ত উচ্ছ্বসিত ভাব চেপে রাখে। কেননা তার আসল পরিচয় এবং উদ্দেশ্য এখানে সে প্রকাশ করতে পারে না।

কিন্তু কি ক'রে তারা যাবে জলপথে?

সবাই চেষ্টা করেছিল—নৌকোর বন্দোবস্ত করা যায় কি না। কিন্তু সে-চেষ্টা কাজে এল না—নৌকো পাওয়া গেল না কোথাও। তাই সবাই মিলে-জুলে তখন এমন কতকগুলো গাছপালা যোগাড় ক'রে ভেলা তৈরি ক'রে নিয়েছে এবং ডাল-পালা বিছিয়ে এমন সুন্দর প্ল্যাটফর্ম করেছে যে তার ওপর একশ'ও লোক অনায়াসে বসতে পারে।

অনেকক্ষণ পরে নাদিয়ার জ্ঞান ফিরে আসে। সঙ্গীরা চেষ্টা ক'রে তাকে কিছু খাওয়ালে। কিন্তু তাতেও তার অবসাদ কাটল না। শেষ পর্যন্ত সে ঘুমিয়ে পড়ল।

কেউ কেউ মাইকেলকে তাদের সম্বন্ধে দু-একটি কথা জিজ্ঞেস করেছিল। কিন্তু সে নিজের পরিচয় দিল ক্রেসনয়েয়ার্স্কের লোক ব'লে।

গভীর রাতে ভেলা ছেড়ে দেওয়া হ'ল। তীরের যে পাশ ঘেঁসে স্রোত চলছিল, সে স্রোতে ভেলা চলতে লাগল ধীরে ধীরে। কয়েকজন বলিষ্ঠ লোক লগি হাতে নিয়ে দাঁড়াল।

সঙ্গে ছিল একজন বুড়ো মাঝি। বৈকাল হ্রদের বুকে সে আজীবন মাঝি-গিরি ক'রে কাটিয়েছে। বয়স তার পঁয়ষট্টির ওপর। রোদে-বাদলে তার শরীরের চামড়ার কটা বাদামী রং ধরেছে। বুকের উপর ঝুলে পড়েছে পালকের মত ঘন পাকা দাড়ি। মাথায় লোমশ টুপি। পরনে কালো রং-এর লম্বা ঢিলে জামা। এই লোকটি ভেলার পেছন দিকে ব'সে পথ দেখাতে লাগল।

আরোহীরা নানা জায়গা থেকে নানা অবস্থায় এসে এখানে জড়ো হয়েছিল। ধনী-গরীব, ছেলে-বুড়ো এমন কি কয়েকটি স্ত্রীলোকও এই সঙ্গে ছিল। দু'তিন জন তীর্থযাত্রী তীর্থক্ষেত্রে বেরিয়েছিল। তাতারদের এই আকস্মিক বিদ্রোহে তারাও হতবুদ্ধি হয়ে এ পথে এসে পড়ে। শেষে কয়েকজন সন্ন্যাসী ও পুরোহিত এ দলে যোগ দেয়। তীর্থযাত্রীদের হাতে লম্বা লাঠি, লাঠির মাথায় পোঁটলা-পুঁটলি, কোমরে ঝুলানো জলের ভাঁড়। এদের দলের একজন এসেছে উক্রেন অঞ্চল থেকে, একজন এসেছে পবিত্র শ্বেত নদী দর্শন ক'রে এবং অপর একজন ফিনল্যান্ড থেকে। আর সন্ন্যাসীরা এসেছে উত্তর দেশ থেকে। সন্ন্যাসীদের পরনে লম্বা আলখাল্লা, গলায় জড়ানো রঙীন চাদর।

পুরোহিত লোকটি এসেছে একা। সাধারণ গ্রাম্য পুরোহিত—তাতারদের ভয়ে সে আগেই স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও অন্যান্য পরিজনদের উত্তর-প্রদেশে পাঠিয়ে দিয়ে এতদিন নিজের আখড়া আগলে রেখেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন

শুনল যে, ডাকাতরা ইরকুটস্কের পথেও হানা দিয়েছে, তখন প্রাণের ভয়ে নানা রাস্তা ঘুরে এ পথে এসে পড়ে।

সন্ন্যাসীরা বসেছিল ভেলার সম্মুখ ভাগে। ভেলা ছাড়তেই তারা সমস্বরে ভগবানের নামগান সুরু করল। নীরব—থমথমে রাত। দারুণ শীত—সবাই কাঁপছে হি-হি ক'রে। সন্ন্যাসীদের সুর এক একবার থেমে যায়, নিস্তব্ধতা আরও বেড়ে ওঠে। আবার নীরবতা ভঙ্গ ক'রে তারা করুণ গম্ভীর কণ্ঠে গায় জেতা বগো—জেতা বগো· ভগবানের জয় হোক—জয় হোক।

সারারাত নাদিয়ার আচ্ছন্ন ভাবে কাটে। মাইকেল তারই পাশে বসে। চোখে তার ঘুম নেই।

ভোরবেলা উল্টোদিক থেকে জোর বাতাস বইতে থাকে। ফলে ভেলার স্বাভাবিক গতি গেল ক'মে। এভাবে মোহনার চল্লিশ ভারস্টের কাছাকাছি গিয়ে আরোহীরা অনুমান করল বিকাল তিনটা-চারটের মধ্যেই তারা নদীতে পড়তে পারবে। বাতাসের বিপরীত গতিতে যে বিলম্ব হবে তাও তারা গ্রাহ্য তেমন করে না। কেননা, নদীতে গিয়ে যদি রাত হয় তাতে তাদের সুবিধেই হবে। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ভেলা ইরকুটস্কে গিয়ে পৌঁছুবে নিরাপদে।

কিন্তু বুড়ো মাঝির মনে দুর্ভাবনা জাগে। প্রচণ্ড শীতে হ্রদের জল তখন কোন কোন দিকে জমতে সুরু করেছে। মাঝে মাঝে বরফের চাপ প্রবল স্রোতে ভেসে চলেছে নদীর দিকে। মোহানা ছাড়িয়ে বরফখণ্ড যদি নদীতে গিয়ে পড়ে তাহলে অবশ্য ভয়ের কারণ নেই, কিন্তু তা না হয়ে, নদীমুখে যদি আটকে পড়ে, তাহ'লে ভয়ানক বিপদ হবে।

হ্রদের ঠিক অবস্থা জানবার জন্য মাইকেলও ব্যগ্র হয়ে পড়েছিল। নাদিয়ার ঘুম ভেঙেছে কিছুক্ষণ আগে। সে এখন ধীরে ধীরে মাইকেলকে বলে—কি, অবস্থার ভেতর দিয়ে ভেলা চলেছে, কোন্ দিকে বরফ জমেছে, সেগুলো কত বড়। মাইকেল সবই শুনে যায় আগ্রহভরে।

বেলা শেষ হয়ে এসেছে, এমনি সময় বুড়ো মাঝি কি দেখে সহসা দাঁড়িয়ে অদ্ভুত রকম ইসারা করল। তার মুখে উল্লাসের ভাব।

সবাই ব্যস্তভাবে সম্মুখের দিকে তাকায়। দূরে আঙারা নদীর মোহনা ঐ দেখা যায়। মোহনার দুপাশে দুইটি উঁচু পাহাড়, তার মাঝ দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে জলস্রোত। আরও কিছুদূরে দক্ষিণ পারে দেখা যায় অস্পষ্ট বাড়ী-ঘর, আর গির্জার চূড়ো—আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে।

একজন বলল : ঐ দেখ, সিডেনিচনেস্না বন্দর।

একটা স্বস্তির ভাব দেখা যায় আরোহীদের মুখে।

কিন্তু বুড়ো মাঝি নিশ্চিন্ত নয়। তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল যেদিকে বরফ খণ্ড স্রোতে ভেসে চলেছে সেদিকে। এদিকে ভেলাটির কোন কোন অংশ ছিঁড়ে হয়ে পড়েছিল। কাজেই মেরামতের প্রয়োজন। একথা জানাতেই যারা লগি হাতে দাঁড়িয়েছিল তারা বন্দরের কাছে এসে ভেলাটিকে পারে ভিড়াল।

সিডেনিচনেস্না আঙারা নদীর তীরে একটি নামকরা বন্দর। কিন্তু এ সময়ে এখানেও লোকজন ছিল না। তাতারদল স্থলপথে আক্রমণ করেছে জেনেই উপদ্রব ও লুটপাটের ভয়ে অধিবাসীরা ধনজন নিয়ে নৌকাপথে রাজধানীতে আশ্রয় নিয়েছিল।

বুড়ো মাঝি আশাও করেনি যে এখনো এখানে কোন লোক অসহায় অবস্থায় প'ড়ে আছে, অথবা কেউ তাদের সহযাত্রী হবে। কিন্তু কি আশ্চর্য, ভেলা পারে ভিড়তেই দুটি লোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল তাদের দিকে।

নাদিয়া চমকে উঠল। এবং নিজেকে সামলাতে না পেরে মাইকেলের দু'হাত সজোরে জড়িয়ে ধরল।

—কি, কি হোল নাদিয়া!—মাইকেল জিজ্ঞেস করল ব্যস্তভাবে।

নাদিয়া ফিস্‌ফিস্ ক'রে জানাল মাইকেলের কানে কানে : আমাদের চেনা লোক দু'জন ছুটে আসছে।

—কাদের কথা বলছ? উরাল পর্বতে যাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল তারা কি?

নাদিয়া বলল : হাঁ ব্রাদার।

এ কথায় মাইকেলের মন বিচলিত হ'ল। এতক্ষণ সে নিজের আসল পরিচয় গোপন রেখেছিল, এবার বুঝি তা প্রকাশ হ'য়ে পড়ে! কিন্তু অদ্ভুত তার উপস্থিত বুদ্ধি। একটু চুপ ক'রে থেকে শেষে নাদিয়াকে বলল : নাদিয়া, ওরা যখন ভেলায় উঠবে, তখন ওদের বলো আমার কাছে বসতে। কেমন?

কৌতূহল জাগে—সাংবাদিক হ্যারি ব্লাউন্ট আর অলসাইভ জুলিভেট এখানে এলো কেমন ক'রে? ইচ্ছে করে তারা এখানে আসেনি, ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়েই তারা এ পথে এসে পড়েছিল। যাবেজিয়ায়ো থেকে তারা ঘোড়ায় চ'ড়ে রওনা হয় ইরকুটস্কের দিকে। আমীরের সৈন্যদলকে পেছনে রেখে তারা অনেক দূর এগিয়ে আসে। কিন্তু অপর দিক থেকে ফুওফার এবং খুবজের তাতারদল ধূমকেতুর মতো এসে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন তারা বাধ্য হ'য়ে

পিছিয়ে পড়ে বৈকাল হ্রদের দিকে। তারা আশা করেছিল—— লিস্তেনিচনেয়া থেকে নৌকো ক'রে অগ্রসর হওয়া যাবে। কিন্তু বন্দরে এসে দেখে নৌকো তো দূরের কথা, একটি জনপ্রাণীও সেখানে নেই। কি আর করা যায়? অদৃষ্টের উপর নির্ভর ক'রে তারা তিনদিন ধরে ব'সে থাকে—নদীতীরে এক কাঠের বাড়িতে।

অলসাইড জুলিভেট সরাসরি এসেই বুড়ো মাঝির সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল। তার কথা: মাঝি যদি এই দুই বন্ধুকে ইরকুটস্কে পৌঁছে দিতে রাজি হয় তাহ'লে যত টাকা সে চায়, তাই তারা দেবে।

বুড়ো মাঝি গম্ভীর হয়ে জবাব দেয়: উহুঁ, এখানে কোন ভাড়া নিয়ে দরাদরির প্রশ্ন নেই বাপু। সবারই সমান বিপদ। প্রাণের দায়। প্রাণটা বাঁচাতে পারলেই ঢের। তোমরা এখন উঠে পড়।

এই কথার পর দুই বন্ধু ভেলায় উঠে বসল। নাদিয়া দেখল, আগের চেয়ে তারা যেন বেশি গম্ভীর। হয়ত অবস্থার বিপর্যয়েই তাদের এ গাম্ভীর্য।

অলসাইড জুলিভেট ঠিক হয়ে বসতেই হঠাৎ তার চোখ পড়ল নাদিয়ার ওপর। এ অবস্থায় তাকে দেখে সে কি বলতে চেষ্টা করল।

নাদিয়া মুখে আঙুল চাপা দিয়ে বারণ করল কথা বলতে। এ ব্যাপারে অলসাইড জুলিভেট আরও বিস্মিত হ'ল। এবার নাদিয়া ইঙ্গিতে জানাল তাদের কাছে আসতে। অলসাইড জুলিভেট বন্ধুকে নিয়ে এগিয়ে গেল সেদিকে। মাইকেল স্ট্রগফ তাদের আগমন টের পেয়েছে ব'লে বোধ হ'ল না। সে আগের মতোই চুপচাপ ব'সে রইল।

অলসাইড জুলিভেট আরও আশ্চর্য হল। সে তাকাল নাদিয়ার মুখের দিকে।

নাদিয়া বলল: ক্ষমা করুন, আমার ভাই অন্ধ। তাতাররা তার দু'চোখ নষ্ট ক'রে দিয়েছে।

নাদিয়া দেখল—অলসাইড ও হ্যারি ব্লাউন্টের চোখ জলে ভ'রে উঠেছে। তারা ধীরে ধীরে মাইকেলের পাশে ব'সে পড়ল এবং হাত রাখল মাইকেলের হাতের ওপর। কিন্তু সহসা কোন কথাই তারা বলতে পারল না।

মাইকেল তখন ধীরে ধীরে নমস্কার জানাল: বন্ধুগণ! আগেই একটা অনুরোধ। মনে করো—তোমরা কিছুই জান না—চেন না আমি কে। কি আমার পরিচয়। আমার সম্বন্ধে কোন কথাই যেন প্রকাশ না পায়। আমার কথা দেবে কি?

—হাঁ বন্ধু, আমি শপথ করছি···বলতে গিয়ে অলসাইড জুলিভেটের কথা থেমে যায়।

—যুদ্ধের কথাই শপথ।—হ্যারি ব্লাউন্ট বলল।

মাইকেল খুশি হয়ে ধন্যবাদ জানাল।

এ সময়ে অলসাইড জুলিভেট বলল: কিন্তু আমরা কি তোমার কোন উপকার করতে পারি না? ধরো, তোমার উদ্দেশ্য সফল করতে?

মাইকেল হাসিমুখে বলল: বন্ধু, আমার কাজ আমি নিজেই করতে চাই।

—কিন্তু অসভ্য তাতাররা তোমার চোখের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে···

মাইকেল হেসে বলল: নাদিয়া সঙ্গে রয়েছে। সেই আমার পথ দেখাবে।

আধঘণ্টা পরেই ভেলা ছেড়ে দেওয়া হ'ল এবং ধীরে ধীরে আঙারা নদীতে গিয়ে পড়ল। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

আঙারার প্রচণ্ড স্রোত। সেই স্রোতে বরফের চাপ ঠেলে ভেলা ভেসে চলল তরতর করে পেছনে দাগ রেখে। দু'পারে গাছ পালার মনোরম চলন্ত শোভা। মনে হয়, দু'পাশের সব কিছুই যেন মহাবেগে ছুটে চলেছে আর নদীর বুকে ভেলাটি লোকজন নিয়ে নিশ্চল ছবির মতো স্থির, অচল। একদিকে কালো পাথরের পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সগর্বে, অপর দিকে পার্বত্য জলপ্রপাতের গর্জন। মাঝে মাঝে দেখা যায় সুদূরের গ্রাম। গ্রামের ওপর আকাশের গায়ে রাশি রাশি কালো ধোঁয়া। মাঝে মাঝে জ্বলন্ত পাইন গাছের সারি। সবদিকেই নিষ্ঠুরতার সুস্পষ্ট চিহ্ন। কিন্তু কোন দিকেই তাতারদের সাড়াশব্দ নেই। সম্ভবত তারা ক্রমে ইরকুটস্কের দিকেই এগিয়ে গেছে।

তখনও তীর্থযাত্রী ও সন্ন্যাসী আরোহীদের কণ্ঠে ভজন চলেছে ধীর গম্ভীর সুরে। বুড়ো মাঝি হাতে লগি নিয়ে বরফের চাপ ঠেলে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে।

আঙারার তীব্র স্রোতে ভেলা তরতর ক'রে ছুটে চলেছে রাজধানী ইরকুটস্কের দিকে।

আটাশ

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। সন্ধ্যার পর থেকেই চারদিক আঁধারে ছেয়ে গেছে। নদীর দুই কূল আর দেখা যায় না। আকাশে ধূসর কালো খণ্ড খণ্ড মেঘ। পাহাড়ের চূড়োগুলো মেঘের কালিমায় একাকার। কোথায় পাহাড়, কোথায় গাছপালা, কোথায় আকাশের সীমা, কিছুই আর চেনা যায় না। মাঝে মাঝে

পূবে-হাওয়ার ঝাপটা আসে হু হু ক'রে, পরক্ষণেই নদীর কূল ঘেঁসে নানাদিকে বয়ে যায়।

আরোহীরা হি হি করে কাঁপতে থাকে।

রাত্রির এ রকম আঁধার মানুষ হয়ত সব সময়ে চায় না। কিন্তু পলায়মান আরোহীদল এ রকম আঁধারই চেয়েছিল। নদীর দুই পারে কোথাও কোথাও তাতারদল ছাউনি ফেলেছে, তারই মাঝ দিয়ে নদীপথে তারা চলেছে আঁধারের আড়ালে লুকিয়ে।

চারদিক নীরব। ভেলার ওপরেও শান্ত নীরবতা। তীর্থযাত্রী ও সন্ন্যাসীদলের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরও থেমে গেছে অনেক আগে। এখন প্রার্থনা চলেছে মনে মনে। অধিকাংশ যাত্রীই শীতে মুড়িসুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে। একটি মাত্র লোক তখনও কাজে ব্যস্ত। সে বুড়ো মাঝি। লোকটি সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে বরফের চাপগুলোকে ধীরে ধীরে দূরে সরিয়ে দেয় সতর্ক কৌশলে।

রাত্রির গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়ার ভীষণ পরিবর্তন হ'ল। অবিরাম তুষার পতন। ফলে আরোহীদের সারা দেহে সূঁচ ফোটানো জ্বালা সুরু হ'ল। তবু তারা মুখ বুঁজে পড়ে রইল পাছে তাতারদল তাদের গতিবিধি টের পায়।

অলসাইড জুলিভেট ও হ্যারি ব্লাউন্ট যথাসম্ভব ঘেঁসাঘেঁসি ব'সে সাইবেরিয়ার প্রথম শীতের তীব্রতা সকল শক্তি দিয়ে অনুভব করে।

আর মাইকেল? তার কানে শুধু বাজে কর্তব্যের আহ্বান। সে আহ্বানেই সে মসগুল। আর কোনদিকে তার খেয়াল নেই। পর পর এত দুর্যোগে প'ড়েও সে এতটুকুও নিরুৎসাহ হয়ে পড়েনি।

নাদিয়াও মনের বল হারায় নি। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তার শারীরিক শক্তি ক'মে এসেছিল কিন্তু উপযুক্ত বিশ্রামে আবার সে ফিরে পেল নূতন বল। সে কেবল ভাবে মাইকেলের কথা। কী চমৎকার তার হৃদয়! বিপদে সে রক্ষাকর্তা, ভ্রমণ-পথে মনোরম সঙ্গী, স্নেহ-মমতায় আপন ভাই। আবার মনে পড়ে—বাবার কথা। তার বাবা প্রিয় পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক শত্রু কবলিত দেশে নির্বাসন ভোগ করছেন। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। ভগবান যদি বিরূপ না হন, তাহ'লে কাল ভোরেই সে বাবার বুকে মাথা রেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে।

হঠাৎ দৃশ্যের পরিবর্তন হয়। যারা জেগে ছিল—তারা দেখে, নদীর পারে

নিকটে ও দূরে কয়েকটি গ্রামে আগুন জ্বলে উঠেছে। আলোর ঝলকে এক-একবার আঙারার এপার-ওপার আলোময় হয়ে ওঠে। দিনের বেলায় এ-রকমের দৃশ্য অনেক দেখা গেছে, কিন্তু রাতের আঁধারে এ দৃশ্য কী ভীষণ! ময়লের ছাপগুলো দেখা যায়—বড় বড় আয়নার মতো। এক-একবার ঝিকমিক ক'রে ওঠে, আর স্রোতের মুখে সেগুলো ঘুরপাক খেয়ে তলিয়ে যায়।

কিন্তু বিপদ বিপত্তি কেবল এখানেই ছিল না। এমন একটি সঙ্কট আরোহীদের অলক্ষ্যে জমা হয়ে ছিল, যা কারও পক্ষেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আকস্মিকভাবে এ ব্যাপার আবিষ্কার করে অলসাইড জুলিভেট। খেয়ালবশে একবার সে জলে হাত দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই চমকে ওঠে। হাত উঠিয়ে দেখে, এক রকম আঠালো পদার্থ তার সকল হাতে জড়িয়ে গেছে। সন্দেহ বশে হাতটাকে নাকের কাছে নিতেই সে বুঝতে পারল, জলের ওপর ভেসে চলেছে তরল ন্যাফথার আস্তরণ।

ন্যাফথা খনিজ তেল, অনেকটা মেটে তেলের মতো। কিন্তু দাহ্যগুণ পেট্রোলের মতো। আগুনের ছোঁয়া পেলেই দপ্‌ ক'রে জ্বলে ওঠে। এ অবস্থায় অলসাইড জুলিভেটের মনের ভাব কি রকম হ'ল তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই ন্যাফথার স্রোত কি ক'রে নদীর জলে ভেসে এল? আঙারার জলস্রোতে কি এ ভীষণ জিনিস স্বভাবতই মেশানো থাকে? অথবা বিদ্রোহীরা কি দুর-অভিসন্ধি নিয়ে নদীর জলে ছড়িয়ে দিয়েছে? কিন্তু এ তো যুদ্ধের প্রথা নয়? সভ্যজাতি সকল যুগেই এমন হীন অভিসন্ধিকে ঘৃণার চোখে দেখে।

অলসাইট জুলিভেট হ্যারি ব্লাউন্টকে এ ব্যাপার জানাল। তারপর দু'জনে পরামর্শ ক'রে ঠিক করল যে, এ ব্যাপার আরোহীদের জানানো উচিত হবে না। তাহলে সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠবে নিদারুণ বিপদের সম্ভাবনায়।

মধ্য-এশিয়ার অনেক জায়গার মাটিতে তরল হাইড্রোকেন মেশানো থাকে। পারস্য সীমান্তে, বাকু উপকূলে, আবশেরন উপদ্বীপে, কাস্পিয়ান সাগর-কূলে, এশিয়া মাইনরে, চীনদেশে, ইউয়েন-কিয়াংএ এবং ব্রহ্মদেশের অনেক জায়গায় এমন খনিজ তেলের ফোয়ারা আছে।

বাকু অঞ্চলের অধিবাসীরা—যারা অগ্নিদেবতার উপাসক—কোন পর্ব বা উৎসব উপলক্ষে যখন আমোদ-প্রমোদে মত্ত হয়, সে সময়ে তারা তরল ন্যাফথা সাগর-জলে ঢেলে দেয়। ন্যাফথা স্বভাবতই অতি সহজে জলে ভেসে ছড়িয়ে পড়ে। রাত্রিবেলা সেই ন্যাফথার উপর আগুন দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সাগর-বক্ষ আলোকিত হয়ে ওঠে। দেখলে মনে হয়, বিশাল সাগরজলে যেন

আগুন লেগেছে। স্রোতের মুখে ঢেউএর তালে তালে ঐ আগুন নেচে নেচে এক অপূর্ব রহস্যের সৃষ্টি করে। কিন্তু যাত্রুর অধিবাসীদের চোখে যা রহস্যময় আমোদ-উল্লাস, এ সময়ে আঙারার বুকে তা এক ভীতিজনক দুর্ঘটনার ইঙ্গিত। দুষ্ট মতলব নিয়ে কেউ যদি নিতান্ত অবিবেচকের মতো জলে আগুন ধরিয়ে দেয়, তা হ'লে চক্ষের পলকে এক প্রলয়কাণ্ড ঘটবে।

অবশ্য আরোহীদের দিক থেকে এ রকম ভয়ের কারণ ছিল না। আশঙ্কা শুধু নদী-পারের জলন্ত গ্রামগুলো থেকে। কোন রকমে যদি আগুনের সামান্য হলকা—এমন কি একটুকরো খড়কুটোও উড়ে এসে নদীতে পড়ে, তাহ'লেই আর রক্ষা নেই। চক্ষের পলকে নদীস্রোতে প্রলয়ঙ্কর আগুনের দাপাদাপি সুরু হয়ে যাবে।

হ্যারি ব্লাউন্ট বলল: এখন পারে নেমে পড়াই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়?

মাইকেল স্ট্রগফের দিকে তাকিয়ে অলসাইট জুলিভেট জবাব দেয়: বিপদ যত ভয়ঙ্করই হোক—একটি লোককে আমি জানি, এ প্রস্তাবে সে কোনমতেই রাজি হবে না।

তখন রাত্রি প্রায় একটা। হ্যারি ব্লাউন্ট কি দেখে হঠাৎ সচকিত হয়ে ওঠে। যেন অনেকগুলো জীবন্ত কালো ছায়া বরফের উপর দিয়ে ভেলার দিকে লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে।

তাতার!

হ্যারি ব্লাউন্ট সাহসে ভর ক'রে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল বুড়ো মাঝির কাছে এবং ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল চলন্ত ছায়াগুলোকে।

মাঝি স্থিরদৃষ্টিতে সেদিকে তাকাল। গম্ভীরকণ্ঠে জানাল: তাতার নয়—নেকড়ের পাল। যা হোক, তাতারের চেয়ে ও-জাতটাকে আমি বেশি পছন্দ করি। এবার সবাইকে বলো প্রস্তুত হ'তে। কিন্তু সাবধান, সামান্য শব্দও যেন না হয়। কেউ যদি বন্দুক বা পিস্তল না ছোড়ে। কেননা তা হ'লে তাতার দল তাদের গতিবিধি টের পেয়ে যাবে।

দুর্দান্ত বন্য জানোয়ার। শীতের তাড়নায় এবং ক্ষুধার জ্বালায় ওরা হাহাকার ক'রে ঘুরে বেড়ায়। মানুষের গন্ধ পেলে পাগল হয়ে ওঠে।

আরোহীদের সবার অন্তরই ভয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল নেকড়ে-দল হানা দিয়েছে জেনে। শিশু এবং স্ত্রীলোকদের সরিয়ে ভেলার মাঝখানে বসিয়ে দিয়ে

অনেকেই দাঁড়াল লগি এবং লাঠিসোটা নিয়ে। কেউ-বা ছুরি, কেউ-বা ভোজালি হাতে প্রস্তুত হ'ল।

এভাবে আরোহীরা নীরবে প্রাণপণে যুঝতে থাকে। আহতও হ'ল অনেকে। এমন কি নেকড়ের কামড় খেয়েও কারও মুখে একটি কাতর শব্দ শোনা গেল না।

কিন্তু বিপদ কেটে গেল আকস্মিকভাবে। হঠাৎ দেখা গেল—বাঘদের দল পালাবার চেষ্টা করছে। বরফের চাপ ডিঙিয়ে ওরা সটান ছুটেছে পারের দিকে।

নেকড়ে বাঘ ভয়ানক জেদী। সচরাচর অন্ধকারেই ওরা শিকারে পটু। কিন্তু হঠাৎ আলো বা আগুন দেখলে ভয়ে পালায়।

এসময়ে তাতার সেনারা নদীর পশ্চিম পারে পোষকভ শহরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। ফলে নদীবক্ষ পর্যন্ত আলোকিত হয়ে ওঠে। এই দেখেই আক্রমণকারী নেকড়ে বাঘের দল ভয়ে পালিয়েছিল।

দেখতে দেখতে শহরের সব দিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এক সঙ্গে শতশত মশালের মতো জ্বলতে থাকে কাঠের বাড়ীঘর। অবিরাম কড়হাড়, ফড়ফাড়, টুসটাস শব্দ, আর এক-একবার তাতার-সেনাদের বিকট উল্লাস-চীৎকার।

ভেলার আরোহীরা এ ব্যাপারে আরও হতাশ হয়ে পড়ে। এবার তারা শত্রুর মুখোমুখি এসে পড়েছে। পাছে তাতারদল তাদের দেখতে পায়, এই ভয়ে সবাই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

অলসাইড জুলিভেট ও হ্যারি ব্লাউন্টের মনে তখন তুমুল দুর্ভাবনার ঝড়। কি-হয় কি হয় ভাব। যদি কোনরকমে এক টুকরো জ্বলন্ত বস্তু নদীর জলে এসে পড়ে, তাহ'লে? তাহ'লে চক্ষের পলকে আলকাতরার বুকে সুরু হবে দুরন্ত আগুনের মাতামাতি। এপারে ওপারে মহাপ্রলয় বেধে যাবে।

কিন্তু সৌভাগ্য যে বাতাসের গতি ছিল বিপরীত দিকে। এ কারণে তখনও তেমন কোন দুর্ঘটনার মুখে তারা পড়েনি। অলসাইড জুলিভেট ও হ্যারি ব্লাউন্ট বিস্মিত নয়নে চেয়ে থাকে পারের দিকে। পুবের-হাওয়া তখন আগুনের হল্কাগুলোকে পশ্চিম দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেলাটি স্রোতের টানে শহরের সীমা ছাড়িয়ে দূরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কিন্তু এদিকেও নদীর এপারে ওপারে টহল দিয়ে ফিরছে তাতার-সেনা। তাদের অস্পষ্ট কথাবার্তাও মাঝে মাঝে ভেসে আসে ভেলার আরোহীদের কানে। কিন্তু ভেলা চলতে থাকে তাদের অলক্ষ্যে আঁধারে লুকিয়ে।

দুপুর রাতের পর থেকে শীতের প্রকোপ আরও প্রচণ্ড ব'লে বোধ হল। জলও জমে উঠতে থাকে। আরোহীদের মনে আশঙ্কা জাগল। বরফের চাপে ভেলা আটকে না পড়ে। বুড়ো মাঝি আরও সতর্ক হয়ে উঠল।

মাইকেল স্ট্রগফ কান পেতে শুনতে থাকে—মাঝিরা কি বলাবলি করে।

—দেখ—দেখ—ঐ ডান দিকে··

—বাঁ দিকে অসংখ্য বরফ—না?

—আহা, লাকশিটা দিয়ে ওদিকে ঠেলে দাও না·

—যেভাবে বরফ ভেসে আসছে, ভয় হয়, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আবার আটকে পড়ব।

—ভগবান ভরসা।···বুড়ো মাঝি হাত নেড়ে বলে। : এ মতলবই যদি তাঁর হয়ে থাকে, তাহ'লে আমরা সাধারণ মানুষ আর কি করতে পারি—বলো।

অলসাইড জুলিভেট ফিস্‌ফিস্ ক'রে মাইকেলের কানে কানে বলে: শুনতে পাচ্ছ কি? মাইকেল উত্তর দেয় হাঁ, ভগবান আমাদের সঙ্গে আছেন।

তারপর সব চুপ। জলের ওপর কেবল বরফ খণ্ডের ঠুকঠাক শব্দ।

মাইকেল স্ট্রগফের মন মহা দুশ্চিন্তায় চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। ভেলা যদি হঠাৎ থেমে যায়, তখনই অসংখ্য বরফের প্রচণ্ড চাপে অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠবে। ভেলার জোড়গুলো ভেঙে যাবে, ফলে গাছের গুঁড়িগুলো আলগা হয়ে স্রোতের পাকে তলিয়ে যাবে সহসা। তখন বরফের চাপ আঁকড়ে ভেসে থাকা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় থাকবে না। তারপর রাত্রি প্রভাত হবে, তাতারেরা দেখতে পাবে এবং নিষ্ঠুরভাবে চলবে তাদের হত্যাকাণ্ড।

মাইকেল ধীরে ধীরে নাদিয়াকে ইঙ্গিত করল। নাদিয়াও এতক্ষণ নীরবে সব অবস্থাই লক্ষ করছিল। আস্তে আস্তে জানাল: আমি প্রস্তুত, ব্রাদার।

বরফের সঙ্গে সঙ্গে ভেলাটি আরও কয়েক ভার্স্ট এগিয়ে গেল। তারপরেই গতি ক'মে এল ধীরে ধীরে। বুড়ো মাঝি এবং আরও কয়েকজন মিলে যথাসাধ্য চেষ্টা করল বাধা এড়াতে কিন্তু তাদের সব চেষ্টা-পরিশ্রমই শেষ পর্যন্ত নিষ্ফল।

রাত্রি প্রায় দেড় ঘটিকা। এ-সময়ে তারা এমন যায়গায় এসে পৌছুল যেখান থেকে বেরুবার আর কোন পথ রইল না। নদীর দু'পার থেকে বরফ জমে জমে সেখানে নদীর মুখ প্রায় বন্ধ হয়ে পড়েছিল।

ঠিক এই মুহূর্তে গুম গুম শব্দ শোনা গেল। কয়েকটি গুলিও শোঁ শোঁ ক'রে আরোহীদের মাথার ওপর দিয়ে চ'লে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম পাড় থেকেও গুলি ছুটে এল।

বুড়ো মাঝি চঞ্চল হয়ে জানাল : সর্বনাশ, শত্রু টের পেয়েছে।

আরোহীরা নিরুপায়। দু'দিকের গুলিবৃষ্টির মাঝখানে তারা ডাকাতদের লক্ষ্য হয়ে পড়ল।

এই মুহূর্তে মাইকেল নাদিয়ার হাত টেনে ইঙ্গিত করল : এসো নাদিয়া।

নাদিয়া নিঃশব্দে মাইকেলের হাত ধ'রে ভেলা ছেড়ে বরফের উপর অতি সন্তর্পণে নেমে পড়ল।

মাইকেল কানে কানে বলল : ভয় নেই নাদিয়া, কিন্তু হুঁশিয়ার! কেউ যেন টের না পায়।

অন্ধকারে তাদের গতিবিধি কারো চোখে পড়ল না।

নাদিয়া আগে, আর পেছনে মাইকেল। অতি সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে চলে দুজনে। এবড়ো খেবড়ো বরফের চাপ—দুজনেরই হাত-পা কেটে রক্ত ঝরতে থাকে। কিন্তু কারও লক্ষ্য নেই সেদিকে।

দশ মিনিটের মধ্যেই তারা এই অবরুদ্ধ বরফের এক পাশে গিয়ে পৌঁছোয়। দেখে—সেখান থেকে নদীস্রোত আবার বেরিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে বরফের বড় বড় চাঁই এই বাঁধ থেকে ভেঙে ভেঙে প্রবল স্রোতে ভেসে চলেছে ইরকুটস্কের দিকে।

মাইকেল বলল : এই খণ্ড বরফই এখন আমাদের আশ্রয়।

নাদিয়া সহজেই বুঝতে পারল মাইকেলের মনোভাব। আশায় আলো ফুটল তার চোখে—তার চেহারায়।

ঠিক এই সময় একটা প্রকাণ্ড চাঁই বাঁধ থেকে ভেঙে পড়বার উপক্রম হ'ল। নাদিয়া সাহসে ভর ক'রে মাইকেলকে নিয়ে সেই বরফখণ্ডের উপর আশ্রয় নিল। দুজনের ভারে বরফ-খণ্ড হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়ল। প্রথমে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে তারা আবার বসল ঠিক হয়ে।

প্রবল স্রোতের মুখে নাদিয়া ও মাইকেল ভেসে চলেছে। মাঝে মাঝে তারা শুনতে পায় বন্দুকের আওয়াজ, অসহায়ের আর্ত চীৎকার আর ডাকাতদের ক্রূর উল্লাস ধ্বনি। তারপর ক্রমে ক্রমে সবই অস্পষ্ট হয়ে দূরে মিলিয়ে যায়। যাত্রীদলের দুর্দশায় তাদের মন করুণ হয়ে ওঠে।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই মাইকেল ও নাদিয়া অনেক দূরে চ'লে এল। প্রতি মুহূর্তে তাদের ভয় ছিল—যদি এই বরফের চাঁই হঠাৎ তলিয়ে যায়।

মাইকেল ও নাদিয়া কারও মুখে কথা নেই।

মাইকেলের কানের পর্দা দ্রুত দপ্‌, দপ্‌ করছে আশায় এবং উত্তেজনায়। এবার তার উদ্দেশ্য সফল হবে। রাশিয়ার রাজদূত যথাসময়ে গিয়ে পৌঁছোবে রাজধানী ইরকুটস্ক নগরে।

মাইকেলের দু'হাত জড়িয়ে ধরে নাদিয়াও মুখ বুঁজে আছে। তার চোখে কেবল ভাসে নির্বাসিত পিতার ছবি।

তখন রাত্রি প্রায় দুইটা।

অন্ধকার ভেদ ক'রে দু'সারি আলোরেখা দেখা যায় নদীর দু'পাশে একদিকে ইরকুটস্ক নগরী, অপর পারে বিদ্রোহী তাতারদের শিবির।

ঐ—ঐ দেখা যায় ইরকুটস্ক নগর। আর মাত্র আধ ভার্স্ট দূর। তারপর—তারপর...

মাইকেল স্থির—অবিচল।

সহসা শোনা গেল প্রচণ্ড সোঁ সোঁ শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে বরফ-খণ্ড কেঁপে ওঠে পায়ের তলায়। নাদিয়া চীৎকার ক'রে ওঠে—বুকফাটা চীৎকার! মাইকেলের মন চঞ্চল হয়ে পড়ে বিপদের আশঙ্কায়। দু'হাত তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ায় সে। ঝড়ের তাণ্ডব যেন সুরু হয় তার মস্তিষ্কে। চারদিকে ফুটে ওঠে নীলাভ আলোর আভা। সেই আভায় মাইকেলের চেহারা ভয়ঙ্কর দেখায়। তীব্রভাবে সে তাকাল সামনের দিকে। আলোর সম্মুখে তার অন্ধ-দৃষ্টি যেন খুলে গেছে। সে দৃষ্টি ধক্‌ধক্‌ ক'রে জ্বলছে আগুনের মতো।

—নাদিয়া—নাদিয়া—মাইকেল প্রাণপণে চেঁচিয়ে ওঠে।

নাদিয়া তখন মুখ চোখ দু'হাতে চাপা দিয়ে কাঁপছিল। মাইকেলের তাকে সাড়া দেয়: আদার...

—জলে ঝাঁপিয়ে পড়ো। ভগবান বিরূপ হয়েছেন।

উনত্রিশ

সাইবেরিয়ার রাজধানী ইরকুটস্ক। আঙারা নদীর পারে এই সুপ্রসিদ্ধ নগর। সাধারণত এখানকার লোকসংখ্যা ত্রিশ হাজার, কিন্তু এ-সময়ে নানাপ্রদেশের অধিবাসীরা এখানে আশ্রয় নিয়ে লোকসংখ্যা তিনগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। তা'ছাড়া এ নগর বাণিজ্যের একটি বড় কেন্দ্র। এখান থেকে বহু রকমের পণ্য চীনদেশে, মধ্য-এশিয়ায় এবং ইউরোপে আমদানি ও রপ্তানি হয়।

পূর্ব-সাইবেরিয়ার গভর্নর-জেনারেল এখানে বাস করেন। তাঁর অধীনে একজন সিভিল গভর্নর থাকেন। প্রদেশের শাসনভার তাঁর হাতে। তা'ছাড়া রাশিয়ার বহু বিশিষ্ট নির্বাসিত লোক এখানে বাস করেন। তাঁদের ওপর কর্তৃত্ব করার ভার পুলিশের বড়কর্তার ওপর। তার পরেই পদস্থ অফিসার এখানকার মেয়র। যিনি বেশ অর্থবান, এবং সাধারণের ওপর যাঁর বেশি প্রভাব, এরকম লোকই এখানকার মেয়র হয়ে থাকেন।

এ সময়ে মহামান্য গ্র্যাণ্ড ডিউক ঘটনাচক্রে এ নগরে এসে আটকে পড়েছিলেন। হঠাৎ বিদ্রোহ দেখা দেওয়ায় কোন রকমেই তিনি রাশিয়ায় ফিরতে পারেন নি।

মহামান্য গ্র্যাণ্ড ডিউক রাজকার্যে সুদূর মধ্য এশিয়ায় বেরিয়েছিলেন। বিশাল সাম্রাজ্য ভ্রমণ ক'রে তিনি ইরকুটস্কের দিকে রওনা হন। উদ্দেশ্য ছিল, সেখান থেকে বরাবর মস্কোতে ফিরবেন। এমনি সময় হঠাৎ খবর এল তাতাররা রাজ্য আক্রমণ করেছে। গ্র্যাণ্ড ডিউক তাড়াতাড়ি ইরকুটস্কে আসেন। তখনও তার চলাচল বন্ধ হয়নি। মস্কো এবং সেন্টপিটার্সবার্গ থেকে দু'একটা খবরও পেলেন। কিন্তু জবাব পাঠাবার মুহূর্তে বিদ্রোহীরা টেলিগ্রাফের লাইন কেটে দেয়। এভাবে ইরকুটস্ক শহরের যোগসূত্র সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এই দুর্বিপাকেও গ্র্যাণ্ড ডিউক কর্তব্যবুদ্ধি হারালেন না। স্বভাবতই তিনি ধীর-মস্তিষ্ক ও শান্তপ্রকৃতি। তিনি বিদ্রোহীদলকে প্রচণ্ডভাবে বাধা দেবার বিরাট আয়োজন করতে লাগলেন।

তিনি খবর পেয়েছিলেন, ইশিম তাতারদের হাতে বিধ্বস্ত হয়েছে, ওমস্ক এবং টমস্ক এর পতন হয়েছে। এ অবস্থায় যেমন ক'রেই হোক রাজধানী রক্ষার জোড়জোড় করবার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। বাইরে থেকে কিছুকাল পর্যন্ত কোন সাহায্য পাবার আশা ছিল না। আমুর প্রদেশের এবং ইরকুটস্ক অঞ্চলের নানাস্থানে যে-সব সৈন্য-সামন্ত ছিল, তারা সংখ্যায় এত কম যে বিশাল তাতারবাহিনীর সামনে দাঁড়াতে পারে না। সুতরাং শত্রুদলও যে অনায়াসে ইরকুটস্কে হানা দিতে পারে, তাতে সন্দেহ রইল না। কাজেই এখন এমন একটা আয়োজন করার দরকার হয়ে পড়ল—যাতে অন্তত কিছুকালের মধ্যে শত্রুদল নগরে ঢুকতে না পারে।

তিনি লোক পাঠিয়ে প্রত্যেক নগরে, শহরে, বন্দরে—এমন কি গ্রামে গ্রামে

তাতার-বিদ্রোহের খবর জানিয়ে দিলেন। যে-সব অঞ্চল আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা, সে সব অঞ্চলের প্রজাদের আদেশ দিলেন, ধন জন এবং শস্যসম্ভার নিয়ে রাজধানীতে আশ্রয় নিতে। বিদ্রোহীরা কোথাও যেন একটুকরো খড়কুটো না পায়। তা'ছাড়া তিনি এ আদেশও দিলেন যে জলপথে বা স্থলপথে যত রকম যানবাহন আছে, সবই যেন সরিয়ে দেওয়া হয় বা ভেঙেচুরে নষ্ট করা হয়।

এই আদেশ প্রচারের ফলে সকল দিক থেকেই প্রজারা তাদের সমস্ত সম্বল নিয়ে চ'লে আসে রাজধানীতে। ধনে জনে রাজধানী ভ'রে গেল। যুদ্ধকালে খাদ্যাভাবের সম্ভাবনা দূর হ'ল এভাবে। তা'ছাড়া প্রত্যেক প্রজাই আত্মরক্ষার দায়ে যোগ দিল সেনাদলে। বাইরে থেকে সাহায্য বাহিনী বা সেনাদল না আসা পর্যন্ত বিদ্রোহীদের অনায়াসে বাধা দিয়ে রাখা যাবে—এমন ব্যবস্থা হ'ল।

মহামান্য গ্র্যাণ্ড ডিউক প্রজাদের উৎসাহ উদ্যম দেখে চমৎকৃত হ'লেন। দিন নেই, রাত নেই—সকলেই অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করছে। কয়েকদিনের ভেতরেই বিরাট প্রাচীর উঠল শহরের তিনদিকে। তারপর প্রাচীরের বাইরে একটি গভীর নালা কেটে আঙারা নদীর সঙ্গে যোগ ক'রে দেওয়া হ'ল। একদিকে প্রশস্ত আঙারা নদী। সেদিক দিয়ে আক্রমণের তেমন ভয় ছিল না। শহর এবং শহরতলীর মাঝ দিয়ে সরু ইরকুট নদী। যাতায়াতের সুবিধার জন্যে এ নদীর ওপর যে দুটি প্রকাণ্ড সেতু ছিল এদিক দিয়ে শত্রুপক্ষকে বাধা দেবার সুবিধা হবে ব'লে সে দুটিকে ভেঙে দেওয়া হ'ল।

তাতারদের যে তৃতীয় দলটি জেনিসী নদীর তীর ধ'রে চলেছিল, তারা অন্যান্য দলের আগেই ইরকুটস্কের অদূরে এসে পড়েছিল। আঙারার আশে-পাশে এবং শহরতলীর গ্রামগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল এরাই। শেষ পর্যন্ত ইরকুটস্ক নগর বরাবর আঙারার অপর পারে তারা ছাউনি ফেলে অপেক্ষা করতে লাগল অপর দুটি দলের আশায়। উদ্দেশ্য—আমীরের বাহিনী এবং তার সহকর্মী আইভান ওগারেফের পরিচালিত দল এসে পড়লেই তারা মিলিত শক্তি নিয়ে নগর আক্রমণ করবে।

২৪শে সেপ্টেম্বর। আমীর এবং ওগারেফের সৈন্যদল এসে পৌঁছুল। তৃতীয় দলটি যোগ দিল তাদের সঙ্গে।

আইভান ওগারেফ দেখল—নগর বরাবর নদী পার হওয়া সম্ভব নয়। তাই

তারই পরামর্শে আমীর আরও কয়েক ভার্স্ট পথ এগিয়ে নদী পার হবার চেষ্টা করল। চেষ্টা বিফল হ'ল না। নৌ-সেতু তৈরী ক'রে বিদ্রোহীরা নদীর অপর পারে গিয়ে উঠল।

প্র্যাণ্ড ভিউক এখানে তাতারদের কোন বাধা দিলেন না। কারণ তাদের তখন আত্মরক্ষার প্রশ্নই ছিল বড়—আক্রমণের প্রশ্ন নয়।

তাতার সেনাদল এবার অগ্রসর হয় নদীর তীর ধ'রে। পথের পাশে গভর্ণর জেনারেলের গ্রীষ্মাবাস। তারা প্রথমে সেখানে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারপর নগর অবরোধ ক'রে আক্রমণের অপেক্ষা করতে থাকে।

আইভান ওগারেফ যেমন সুচতুর, যুদ্ধকৌশলেও তেমনি পটু। তার উদ্দেশ্য ছিল, রাশিয়ান দল প্রস্তুত হবার আগেই সে আকস্মিকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে ইরকুটস্কের উপর। অপ্রস্তুত নগরবাসীরা তখন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু তার সে আশা সফল হ'ল না। চক্ষের সম্মুখে সে দেখতে পেল, অবস্থা অদ্ভুত রকম ঘোরালো হয়ে গেছে। এ অবস্থায় অবরোধ ক'রে ব'সে থাকাও নিরর্থক। যেমন ক'রেই হোক তাড়াতাড়ি নগরের পতন ঘটাতে হবে।

আইভান ওগারেফ সেই পরামর্শ দিল আমীরকে। এবং পর পর দু'বার আক্রমণও করা হ'ল। কিন্তু প্রতিবারেই তারা ফিরে এল হাজার হাজার সেনা হারিয়ে। প্র্যাণ্ড ভিউক নিজে দাঁড়িয়ে প্রাচীর রক্ষার জন্য সকলকে উৎসাহিত করতে লাগলেন।

দ্বিতীয়বারের আক্রমণে একটি প্রবেশ পথ ভেঙে পড়েছিল এবং ঐ পথে হৈ হৈ করে হাজার হাজার শত্রুসেনা ঢুকে পড়েছিল আঙারার তীর পর্যন্ত। কিন্তু কশাক, পুলিশ, এবং নাগরিক সেনাদল এমনভাবে আক্রমণ চালাল যে তাতারদল বেশিক্ষণ টিকতে পারেনি।

কিন্তু তাতেও আইভান ওগারেফ নিরাশ হ'ল না। সে আর এভাবে শক্তিক্ষয় না ক'রে প্রতারণার আশ্রয় নিল। অবশ্য এই অভিসন্ধিই তার বরাবর ছিল।

আইভানের সঙ্গিনী সাঙারেও তাকে উত্তেজিত ক'রে তুলল—এই রকম প্ররোচনা দিয়ে।

আইভান জানত, আক্রমণে বিলম্ব হ'লেই মহাবিপদ ঘটবে। কারণ খবর এসেছিল—ইয়াকুটস্ক শহর থেকে একদল রাশিয়ান সেনা ইরকুটস্কের দিকে রওনা হয়েছে। সম্ভবত এতক্ষণে তারা লেনা নদীর তীর ছাড়িয়ে উপত্যকার

উপর এসে পড়েছে। সুতরাং ছয়দিনের মধ্যে নগর অধিকার করতে না পারলে তাতারদের সমস্ত আয়োজন বিফল হবে। আইভান ওগারেফ আর ইতস্তত করল না।

২রা অক্টোবর সন্ধ্যাবেলায় গভর্নর-জেনারেলের প্রাসাদের এক প্রকোষ্ঠে পরামর্শ সভা বসে। মহামান্য গ্র্যাণ্ড ডিউক এখানেই থাকেন।

বলসিয়া স্ট্রিটের শেষ প্রান্তে এই বিরাট প্রাসাদ। নিচে নদী। এবং জানালা-পথে নদীর ওপর দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। নদীর অপর পারে তাতার শিবির।

গ্র্যাণ্ড ডিউক, গভর্নর জেনারেল, মেয়র, ব্যবসায়ীদের দলপতি এবং আরও কয়েকজন পদস্থ রাজপুরুষ পরামর্শ সভায় মিলিত হয়েছেন।

গ্র্যাণ্ড ডিউক বললেন: মাননীয় বন্ধুগণ, আমরা এখন কি রকম সঙ্কটময় অবস্থায় পড়েছি, আপনারা তা জানেন। আপনারা এ-কথাও শুনেছেন যে ইয়াকুটস্ক থেকে সেনাদল আমাদের সাহায্যের জন্যে রওনা হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে-দল এসে না পড়া পর্যন্ত আমাদের যা আয়োজন, তাই দিয়ে বর্বর শত্রুদলকে বাধা দিয়ে রাখতে পারব। এখন নগরবাসীরা যদি এই সঙ্কটে দেশরক্ষার সঙ্কল্প ভুলে যায় এবং যুদ্ধ না করে—তাহ'লে নিশ্চয়ই সে-দোষ আমার হবে না।

গভর্নর-জেনারেল উঠে দাঁড়ালেন: মহামন, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে ইরকুটস্কের প্রত্যেকটি লোক বিশ্বাসী—তাদের উপর বিশ্বাস রাখা যেতে পারে।

গ্র্যাণ্ড ডিউক বললেন: হাঁ, আমি তাদের দেশপ্রেমে বিশ্বাস করি। প্রাচীর রক্ষার জন্যে যে সাহস তারা পর পর দেখিয়েছে তা অপূর্ব। কিন্তু এই শুধু যথেষ্ট নয়; আরও সাহসের প্রয়োজন। আমি আশা করি মাননীয় মেয়র মহোদয় আমার এ আবেদন নগরবাসীদের জানাবেন।

মেয়র শ্রদ্ধা জানিয়ে বললেন: এ নগরের পক্ষ থেকে আমি মহামান্য গ্র্যাণ্ড ডিউককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু নগরবাসীরা কি জানতে পারে—কবে ঐ সাহায্যকারী সৈন্যদল এসে পৌঁছোবে?

গ্র্যাণ্ড ডিউক উত্তরে বললেন: হাঁ, নিশ্চয়। আমি আশা করি, এই ছয় দিনের মধ্যেই জেনারেল কিসেলেফের অধীনে পঞ্চাশ হাজার শিক্ষিত সেনা

দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ ক'রে অনন্ত ডাকাতদের ছিন্নভিন্ন ক'রে দেবে। আমরা নিশ্চয়ই আসন্ন সঙ্কট থেকে রক্ষা পাব।

মেয়র বললেন : এখানে এ কথাও মহামনকে জানিয়ে রাখি—নগরবাসীরা বিদ্রোহীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। আদেশ পেলেই···

গ্র্যাণ্ড ডিউক বললেন : উত্তম। কিন্তু আমাদের সাহায্যের জন্যে যারা ছুটে আসছে, তারা এগিয়ে আসুক। তখন দু'দিক থেকে শত্রুদলকে আমরা পিষে ফেলার বন্দোবস্ত করব।

তারপর গভর্নর জেনারেলের দিকে ফিরে বললেন : এ সময়ে নদীপথের ওপর আমাদের কড়া নজর রাখতে হবে। অসংখ্য বরফ স্রোতে ভেসে চলেছে. যে রকম শীত পড়েছে, নদীর জলও জমে পাথর হয়ে যাবে। কাজেই তার ওপর দিয়ে ডাকাতদল বরাবর নগর আক্রমণের চেষ্টা চালাতে পারে।

মেয়র বললেন : হুজুরের আদেশে আমি কি সে কাজের ভার পেতে পারি?

গ্র্যাণ্ড ডিউক বললেন : বেশ, এ ভার আপনার।

পুলিশের বড় কর্তা এবার উঠে দাঁড়ালেন। গ্র্যাণ্ড ডিউক জিজ্ঞেস করলেন : আপনার কোন বক্তব্য আছে?

—হাঁ মহামন, একটি কথা জানাবার আছে। এ সভায় একটা আবেদন পেশ করবার জন্যে আমি অনুরুদ্ধ হয়েছি।

—এ আবেদন কারা করতে চায়?

—সাইবেরিয়ার নির্বাসিত রাজবন্দীরা। মহামন হয়ত জানেন যে এখন এ নগরেই পাঁচশত রাজবন্দী বাস করে। সাইবেরিয়ার নানা যায়গায় তারা নির্বাসিত হয়েছিল। তাদের কেউ ডাক্তার, কেউ অধ্যাপক, কেউ ব্যায়ামশালার অধ্যক্ষ, কেউ জাপানী স্কুলে কাজ করত, আর কেউ বা ছিল নৌ বিভাগের কর্মচারী। দেশের এই দুর্দিনে তারা এখানে এসে নগর রক্ষায় প্রস্তুত হয়েছে।

গ্র্যাণ্ড ডিউক বললেন : আমি তাদের স্বদেশপ্রেমে বিশ্বাস করি। তারা কি চায়?

—তারা নিজেরা একটা বিশেষ সেনাদল গড়ে সমস্ত সেনাদলের সম্মুখে থেকে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক। এই অনুমতিই তারা প্রার্থনা করে।

এ কথাতে গ্র্যাণ্ড ডিউকের অন্তর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বললেন : উত্তম। নির্বাসিতেরা সবাই রাশিয়ার অধিবাসী। দেশের জন্যে যুদ্ধ করার দাবী

তাদের অজানা নয়। কিন্তু তাদের ভার একজন সেনানায়কের হাতে থাকবে। সে ভার কে নেবে?

—তাদের মাঝেই এমন একজন লোক আছেন। তাঁকেই তারা সেনাপতি করতে চায়।

—কি নাম?

—ওয়াসিলি ফেডর।

এই ওয়াসিলি ফেডরই নাদিয়ার পিতা। তিনি একজন বিচক্ষণ ডাক্তার। নির্বাসিত হয়ে তিনি ইরকুটস্কে চিকিৎসা ব্যবসা করছেন। তিনি দয়ালু, সাহসী ও খাঁটি দেশপ্রেমিক। রুগ্নপীড়িতের সেবায় নিযুক্ত থেকেও তিনি একটি রক্ষীদল গড়ে তুলেছিলেন। এ দলের প্রত্যেকটি লোক বিশ্বাস করে—রাশিয়া তাদের পবিত্র পিতৃভূমি। মহামান্য জারের শাসন-নীতির সঙ্গে তাদের মতের মিল সর্বক্ষেত্রে ছিল না, এই জন্যেই তারা নির্বাসিত। কিন্তু তাই ব'লে তারা দেশদ্রোহী নয়।

গ্র্যাণ্ড ডিউক বললেন: এ নাম তা'র অপরিচিত নয়। এই নির্বাসিত সন্তান পিতৃভূমির প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখিয়েছেন সেদিন মহাবিক্রমে যুদ্ধ ক'রে। কিন্তু কোন অনুগ্রহ বা পুরস্কার প্রার্থনা করেন নি।

গভর্ণর জেনারেল বললেন: বাস্তবিক, ওয়াসিলি ফেডর উপযুক্ত লোক সহকর্মীদের ওপর তাঁর যথেষ্ট প্রভাব।

—কতদিন ধ'রে তিনি ইরকুটস্কে আছেন?

—দু' বছর হোল।

—তাঁর স্বভাব-চরিত্র?

পুলিশের বড়কর্তা বললেন: স্বভাব চরিত্র ভাল—নিষ্কলঙ্ক। খুব কর্তব্যপরায়ণ। এ পর্যন্ত তিনি আইনভঙ্গ করেন নি।

গ্র্যাণ্ড ডিউক বললেন: কোথায় তিনি? অনুগ্রহ ক'রে তাকে এখানে উপস্থিত করেন।

আধ ঘণ্টা পরে। ওয়াসিলি ফেডর এসে দাঁড়ালেন মহামান্য গ্র্যাণ্ড ডিউকের সমুখে। পেশীবহুল সুদীর্ঘ দেহ। দৃঢ় সংযত চেহারা। দেখলে মনে হয়, জন্ম থেকে অসংখ্য কঠোরতার ভেতরও জীবন-যুদ্ধে তিনি অপরাজিত।

গ্র্যাণ্ড ডিউক যুক্ত হলেন। বললেন: ওয়াসিলি ফেডর!

ওয়াসিলি ফেডর অভিবাদন জানিয়ে আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

গ্র্যাণ্ড ডিউক আবার বললেন: ওয়াসিলি ফেডর, আপনার নির্বাসিত

সহকর্মীগণ একটা অতিরিক্ত সেনাদল গ'ড়ে সকল দলের সম্মুখে থেকে যুদ্ধ করতে চায়। এ আবেদন তারা জানিয়েছে। কিন্তু একটি কথা: এ-দলের প্রত্যেকেরই জানা দরকার—দরকার হ'লে হয়ত শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হবে—নগর রক্ষা করতে হবে।

—এ কথা তারা ভাল ক'রেই জানে মহামন।

—তারা আপনাকে তাদের সেনাপতি করতে চায়।

—আমাকে! আমি!

—তাঁদের এ প্রস্তাবে কি আপনি রাজি নন?

—তাতে যদি পিতৃভূমি রাশিয়ার মঙ্গল হয়, তাহ'লে আমার আপত্তি করবার অধিকার নেই।

—সেনাপতি কেন্ডর, আজ হতে আপনি আর নির্বাসিত নন। আপনি মুক্ত!

ওয়াসিলি কেন্ডর পিতৃভাবে ধন্যবাদ জানালেন। তারপর বললেন: মহামন, আমার সহকর্মীরা এখনও নির্বাসিত, তাদের জন্যে মহামান্য ভিউকের করুণা প্রার্থনা করতে পারি কি?

গ্রাণ্ড ডিউক ওয়াসিলি কেন্ডরের বন্ধুপ্রীতি দেখে খুব সন্তুষ্ট হলেন। বললেন: আজ হতে তারাও আর নির্বাসিত নয়।

গ্রাণ্ড ডিউকের এই মহানুভবতায় আনন্দে উত্তেজনায় ওয়াসিলি কেন্ডরের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একদিনে নির্বাসনে যারা ছিল বন্ধু, ভ্রাতা— আজ তারা মুক্ত—এই যুদ্ধক্ষেত্রে তারা সহকর্মী।

গ্রাণ্ড ডিউক হাসিমুখে তাঁর হাত ধ'রে বললেন: মহামান্য জার এই কথা মঞ্জুর করবেন। সাইবেরিয়ার রাজধানী রক্ষার জন্যে উপযুক্ত বীরের প্রয়োজন ছিল। এবার আমি কিছু নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিলাম।

এভাবে নির্বাসিতজনের প্রতি করুণা দেখিয়ে মহামান্য গ্রাণ্ড ডিউক সুবিচার ও পরিণত রাজনীতির পরিচয় দিলেন।

তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। জানালার-পথ দিয়ে দেখা যায়, তাতার শিবিরের অসংখ্য মশালের আলো এবং আঙ্কারার জলে তারই প্রতিচ্ছায়া। রাশি রাশি তুষারখণ্ড ভেসে চলেছে নিম্নদিকে।

গ্রাণ্ড ডিউক সভা শেষ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। এমনি সময় প্রকোষ্ঠের দরজা ঠেলে ব্যস্তসমস্তভাবে একজন প্রহরী এসে জানাল: হুজুর, রাশিয়ার রাজদূত বাইরে দাঁড়িয়ে।

ত্রিশ

সকলেই সচকিত হয়ে উঠল। একযোগে তাদের দৃষ্টি পড়ল সম্মুখে দরজার দিকে। রাশিয়ার রাজদূত! মহামান্য জারের পত্রবাহক ইংকুটস্কে! এ খবর তাদের মনে কেমন অদ্ভুত শোনাল।

গ্রাণ্ড ডিউক দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে গেলেন। বললেন: কোথায় দূত?

একটি লোক ব্যস্তভাবে ভেতরে প্রবেশ করল। অতিরিক্ত পথশ্রমে লোকটি ক্লান্ত শীর্ণ। পরনে সাইবেরিয়ান কৃষকের বেশ, ছিন্ন মলিন, অনেক জায়গায় গোল ছিদ্র করা—যেন বন্দুকের গুলি লেগে ছিঁড়ে গেছে। মাথায় রাশিয়ান টুপি। গালের ওপর একটা আধ-শুকনো ক্ষত চেহারাকে অন্যরকম ক'রে দিয়েছে। পায়ের জুতো ছেঁড়া, সেলাই খোলা: লোকটি যেন বহুকষ্টে সুদীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে এসেছে।

প্রকোষ্ঠে ঢুকেই লোকটি মাথা নুইয়ে কুর্নিশ জানাল: মহামান্য গ্রাণ্ড ডিউকের জয় হোক।

গ্রাণ্ড ডিউক বরাবর তার সামনে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন: তুমিই মহামান্য জারের পত্রবাহক?

—হাঁ হুজুর!

—তুমি এসেছ

—মস্কো থেকে, হুজুর।

—কবে রওনা হয়েছিলে?

—১৫ই জুলাই।

—তোমার নাম?

—মাইকেল স্ট্রগফ।

এই লোক আর কেউ নয়—বিদ্রোহী আইভান ওগারেফ। মাইকেল স্ট্রগফের নাম ভাঁড়িয়ে সে এসেছে দুষ্ট মতলব নিয়ে—কতগুলো মেটাতে। সে যে রাশিয়ার রাজদূত—এখন এটুকু প্রমাণ করতে পারলেই হয়।

আইভান ওগারেফের কথা শেষ হতেই গ্রাণ্ড ডিউক সকলকে স'রে যেতে ইঙ্গিত করলেন। তখন সবাই চ'লে গেলেন প্রকোষ্ঠ ছেড়ে।

গ্র্যাণ্ড ডিউক একা এবং এই প্রতারক সংবাদবাহক।

গ্র্যাণ্ড ডিউক কয়েক মিনিট তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন: ১৫ই জুলাই তুমি মস্কো ছেড়েছ?

হাঁ হুজুর। ১৫ই জুলাই রাত্রিতে নূতন প্রাসাদে আমি মহামান্য জারের সম্মুখে উপস্থিত ছিলাম।

এই ব'লেই সে কোমর থেকে রাজকীয় চিঠিখানা খুলে গ্র্যাণ্ড ডিউকের হাতে তুলে দিল। হাতের চাপে বা অন্য যে-কোন কারণেই হোক, চিঠিখানা জড়িয়ে পিণ্ডাকার হয়ে গিয়েছিল।

—চিঠিখানা কি এ অবস্থায়ই তোমাকে দেওয়া হয়েছিল? গ্র্যাণ্ড ডিউক জিজ্ঞেস করলেন।

—না হুজুর। তাতার সেনাদের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে আমিই খামখানা ছিঁড়ে জড়িয়ে রেখেছিলাম।

—তুমি কি তাতারদের হাতে ধরা পড়েছিলে?

—হাঁ হুজুর। আমি বন্দী হয়েছিলাম। তাইতো ১৫ই জুলাই রওনা হয়েও আজ ২রা অক্টোবর—এই উনিশ দিন লেগেছে এখানে আসতে।

গ্র্যাণ্ড ডিউক চিঠির ভাঁজ খুললেন। আগেই লক্ষ করলেন মহামান্য জারের সাঙ্কেতিক সহির ওপর। চিঠিখানা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই রইল না। প্রথম দৃষ্টিতে আইভান ওগারেফের চেহারা যে তাঁর মনে কিঞ্চিৎ দ্বিধা সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছিল—এবার তা দূর হ'ল।

গ্র্যাণ্ড ডিউক কিছুক্ষণ কি ভাবলেন। তারপর ধীরে ধীরে চিঠির প্রত্যেকটি লাইন পড়তে লাগলেন সতর্কভাবে।

পরে মাথা তুলে জিজ্ঞেস করলেন: মাইকেল! তুমি জান—এ চিঠিতে কি লেখা আছে?

—জানি হুজুর, চিঠিখানা তাতারদের হাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিল তাই নষ্ট ক'রে ফেলবার চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু চিঠির খবর হুজুরের কাছে যথাসময়ে এসে যদি জানাতে পারি, সেজন্য প'ড়ে মুখস্থ ক'রে রেখেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চিঠিখানা নষ্ট করতে হয়নি।

—তুমি জান—এ চিঠিতে আদেশ হয়েছে রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা বাঁচাতে হবে?

—জানি হুজুর।

—আরও জান যে, বিদ্রোহ দমনের জন্যে একদল সৈন্য রওনা হয়েছে?

—জানি হুজুর। কিন্তু তারা জয়ী হ'তে পারবে না।

এই উত্তরে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল মহামান্য গ্র্যাণ্ড ডিউকের চেহারায়। বললেন: কি বললে তুমি?

আইভান ওগারেফ এবার ধীরে ধীরে বলল: হুজুর হয়ত সংবাদ পেয়েছেন ইসিম, ওমস্ক, টমস্ক প্রভৃতি বড় বড় শহর নগর বন্দর বিদ্রোহীরা অতি সহজে কেড়ে নিয়েছে।

—কিন্তু সে-সব জায়গায় কোন যুদ্ধ হয়নি কি? আমাদের কশাক সেনা কি তাদের বাধা দেয়নি?

—হাঁ হুজুর, যুদ্ধ হয়েছিল, বাধাও দিয়েছিল···

—তারা কি পরাজিত হয়েছে?

—হাঁ হুজুর. বিদ্রোহী তাতার দলের সম্মুখে দাঁড়াতে পারে, তাদের সংখ্যা তত বেশি ছিল না।

—তুমি জান, কোন্ কোন্ জায়গায় শত্রুদের বাধা দেওয়া হয়েছিল?

—জানি হুজুর। কলিভানে, টমস্ক শহরে···

এ পর্যন্ত আইভান ওগারেফের কথায় সত্যের সংস্রব ছিল, এবার সে প্রতারণার ফন্দিতে মিথ্যার আশ্রয় নিল। ইরকুটস্কের অধিবাসীরা যাতে তাতারদের নামে অতিরিক্ত ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে, এই মতলবে সে অতিরঞ্জিত ক'রে বলল: এবং তৃতীয়বার ক্রেস্‌নয়েয়ার্সিক শহরে।

গ্র্যাণ্ড ডিউকের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল: কি বলছ? এ আক্রমণেও কি···

আইভান ওগারেফ কথায় আরও জোর দিয়ে জানাল: আক্রমণ নয় হুজুর, রীতিমতো যুদ্ধ।

—যুদ্ধ!

—হাঁ হুজুর, টবলস্ক আর সীমান্ত প্রদেশের কুড়ি হাজার সৈন্য দেড় লক্ষ তাতার সেনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু এত পরাক্রম দেখিয়েও শেষ পর্যন্ত তারা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে।

গ্র্যাণ্ড ডিউক এতক্ষণ রাগে গরগর্ করছিলেন। এবার গর্জে উঠলেন: মিথ্যাবাদী···

—না হুজুর, আমার কথা সত্য। ক্রেস্‌নয়েয়ার্স্কির যুদ্ধে আমি উপস্থিত ছিলাম এবং সেখানেই আমি বন্দী হয়েছিলাম।

গ্র্যাণ্ড ডিউক থেমে গেলেন। পরে বললেন: এই যুদ্ধ কবে হয়েছে?

—২রা সেপ্টেম্বর তারিখে, হুজুর।

—বিদ্রোহীরা সংখ্যায় কত হবে অনুমান করতে পার ?

—প্রায় চার লক্ষ হুজুর। —এবারেও আইভান ওগারেফ দুই বক্তব্যে অতিরঞ্জিত ক'রে বলল।

গ্র্যাণ্ড ডিউক আবার জিজ্ঞেস করলেন : তা হ'লে আমরা কি পশ্চিম-প্রদেশ থেকে কোন সাহায্যের আশা করতে পারি না ?

—না হুজুর। শীতের আগে তো নয়ই।

গ্র্যাণ্ড ডিউক এবার ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন : যা হোক, শোন মাইকেল ষ্ট্রগফ, পূর্ব বা পশ্চিম-প্রদেশ থেকে সাহায্যের আশা না থাকে —না থাক। তবে ঠিক জেনো, আমি কখনো অসভ্য তাতারদের হাতে এ দেশ ছেড়ে দেব না। তারা চার লক্ষ হোক, আর ছয় লক্ষই হোক—তবু নয়।

আইভান ওগারেফের কুটিল দৃষ্টি সহসা কুঞ্চিত হয়ে উঠল। গ্র্যাণ্ড ডিউক কি এখনও বুঝতে পারেন নি যে এ প্রতারণার পরিণাম কি হবে।

গ্র্যাণ্ড ডিউক কিছুক্ষণ নীরবে পাইচারি করতে করতে আবার চিঠিখানা খুলে পড়লেন। শেষে বললেন : তুমি আরও জান যে, এ চিঠিতে আমাকে সতর্ক ক'রে দেওয়া হয়েছে। আমাকে সাবধানে থাকতে হবে।

—হাঁ হুজুর, বিশ্বাসঘাতক আইভান ওগারেফ আপনার উপর প্রতিশোধ নেবার ফন্দি এঁটেছে।

—সে চেষ্টা করবে ছদ্মবেশে নগরে ঢুকতে। তারপর আমার বিশ্বাসভাজন হয়ে সুযোগ মতো প্রতারণা ক'রে বিদ্রোহীদলকে নগর আক্রমণে সাহায্য করবে।

—সবই জানি, হুজুর। এবং আরও জানি যে সেই বিশ্বাসঘাতক আইভান ওগারেফ নাকি প্রতিজ্ঞা করেছে, সে নিজের হাতে প্রতিশোধ নেবে।

—কেন ?

—শুনেছি, হুজুর নাকি তাকে একবার অপমান ক'রে উচ্চপদ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

—হুঁ। এবার মনে পড়েছে বটে। কিন্তু তা ব'লে যে লোক আপন দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বহু তাতারজাতিকে বিদ্রোহী ক'রে তোলে, আক্রমণের বুদ্ধি যোগায় সেই শয়তান ঐ ছাড়া আর কিছুই আশা করতে পারে না।

—মহারাজ আর এই দুরভিসন্ধির খবর পেয়ে ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন।

—হাঁ, এ চিঠিতে সবই জানিয়েছেন।

—মহামান্য আর আমাকেও সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন।

—আইভান ওগারেফের সঙ্গে তোমার কোথাও দেখা হয়েছিল?

—হাঁ হুজুর। সেই কোলিবেয়ানস্কের যুদ্ধের পর। কিন্তু সে আমাকে চিনতে পারেনি তাই রক্ষা।

—তুমি তো বন্দী হয়েছিলে; কি ক'রে পালালে?

—ইরতিসের জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম।

—এখানে কি ক'রে এলে?

আজ শেষ-বেলায় তাতারদের ওপর যখন আক্রমণ চলে সে সময়ে রক্ষীসেনাদলের সঙ্গে নগরে ঢুকি। আমার পরিচয় দিতেই তারা হুজুরের নিকটে আসবার সুবিধা ক'রে দেয়।

গ্র্যাণ্ড ডিউক তার সাহসের প্রশংসা করলেন। বললেন: এ বিপদেও তুমি ভয়ানক দুঃসাহস ও উদ্যম দেখিয়েছ! তোমার কথা আমার মনে থাকবে। কোন প্রার্থনা আছে তোমার?

ওগারেফ বিনীতভাবে জানাল: না হুজুর। তবে গ্র্যাণ্ড ডিউকের পাশে থেকে যুদ্ধ করতে পারি এইটুকু অধিকার আমি প্রার্থনা করতে পারি কি?

গ্র্যাণ্ড ডিউক সন্তুষ্ট হলেন। বললেন: তাই হবে মাইকেল স্ট্রগফ। আজ হ'তে তুমি আমার দেহরক্ষী। এই প্রাসাদেই তুমি থাকবে।

ওগারেফ বলল: কিন্তু আইভান ওগারেফ যদি তার দুরভিসন্ধি নিয়ে ছদ্মনামে হুজুরের সামনে এসে উপস্থিত হয়।

—এখানে তার ছদ্মবেশ ধরে পড়বে। তুমি তো তাকে চেনো—তা হ'লে আর ভাবনা কি? তারপর চাবুকের আঘাতে তার প্রাণদণ্ড হবে।

এ পর্যন্ত সুন্দরভাবে কৃত্রিম অভিনয় ক'রে গেল ছদ্মবেশী, আইভান ওগারেফ। গ্র্যাণ্ড ডিউকের পার্শ্বরক্ষী সে। একই প্রাসাদে থাকবে, এমন কি অনেক সময় গোপন পরামর্শও সে জানতে পারবে। ইরকুটস্কে কেউ তাকে চেনে না। তার ছদ্ম-আবরণ খসিয়ে ফেলবে—এমন লোক এখানে নেই। কাজেই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কাজ সমাধা করবার জন্যে সে ঝুঁকে পড়ল। সে জানত ইরাকুটস্কের সৈন্যদল এখানে শীঘ্রই এসে পড়বে। তার আগেই নগরের পতন ঘটাতে হবে। তাতাররা নগর অধিকার করতে পারলে, রাশিয়ান সেনার সাধ্য নেই যে সহজে তাদের হঠাতে পারে। আর পারলেও তাতার-সেনাদল নগর ধ্বংস ক'রে দিয়ে যাবে। তা ছাড়া এর আগেই গ্র্যাণ্ড ডিউকের ছিন্নশির আইভান ওগারেফের পায়ের তলায় গড়াগড়ি যাবে।

আইভান ওগারেভ এখন মহামান্য গ্র্যাণ্ড ডিউকের দেহরক্ষী। কাজেই সব ব্যাপারেই তার ছিল অবাধ অধিকার। গ্র্যাণ্ড ডিউকের সঙ্গে সঙ্গে থেকে সে দু'দিনেই নগরের পথঘাট সবই ভাল ক'রে দেখে নিল। নগরবাসীরা তাকে যথেষ্ট সম্মান দেখায়। কোন কোন সময় তার যাত্রাপথের মিথ্যা কাহিনী সে সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলে নগরবাসীদের কাছে। নগরবাসীরা অবাক হয়ে শোনে। সব কথাই সে এমন ভয়ে ভয়ে বলে—যাতে কারও মনে একটুও সন্দেহ না জাগে। তাতারদের কথায় রক্ষীসেনাদলের মনে হতাশার ভাব জেগে উঠুক, এই সে চায়। সে এক একবার ভান ক'রে জানায় যে, এ-সব কথা বলার তার আগ্রহ নেই। তবে সে মাঝে মাঝে বলে, সেও কেবল পীড়াপীড়ির দায়ে প'ড়ে—নেহাৎ অনিচ্ছাবশে। তারপর সে এই ব'লে তার বক্তব্য শেষ করে: যাই হোক আমাদের শেষ-রক্তবিন্দু দিয়ে যুদ্ধ করতে হবে। নগর উড়িয়ে দেব, তবু পরাজয় স্বীকার করব না।

এই রকম মিথ্যা প্রচারের ফল খুবই অনিষ্টকর, কিন্তু ইরকুটস্কের সেনাবাহিনী এবং নাগরিকদলের হৃদয় ছিল দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। কিছুতেই তারা বিচলিত হ'ল না। তা' ছাড়া বর্বর তাতারদের ওপর তাদের ছিল উৎকট ঘৃণা।

এভাবে আরও দু'দিন গেল।

এদিকে আইভান ওগারেভ নগরের সর্বত্র ঘুরে ফিরে দেখে নেয়—কোথায় কোন্ দুর্গ, কোন্ দিকে প্রাচীর, কোন্ দিকে পথ, কোথায় কতটুকু আয়োজন চলেছে, কোন দিকে গলদ আছে কিনা, কোন্ দিক দিয়ে আক্রমণ করলে তাতার দল সুবিধা করতে পারে। সবই সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খুঁজে বেড়ায় কুতাভার অভিসন্ধি নিয়ে। বিশেষ ক'রে বলশিয়া প্রাসাদের গেটের ওপরই তার বেশি নজর। সুবিধা বুঝে এ পথই সে খুলে দেবে—এই মতলব।

শেষ বেলার দিকে দু-দু'বার সে ঐ দ্বারপথে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াল কয়েকবার। এই প্রাচীর থেকে প্রায় একমাইল দূরে তাতারদল ছাউনি ফেলে অপেক্ষা করছে তারই ইঙ্গিতের আশায়।

এই দু'দিন তাতারবাহিনী নগর আক্রমণের কোন চেষ্টাই করেনি। তাই কিছুটা শান্তভাব দেখা গেল সবদিক থেকেই। অবশ্য এর মূলে আইভান ওগারেফেরই পরামর্শ ছিল। নগরে প্রবেশ করার পর একটি বন্দুকের শব্দও শোনা গেল না বিদ্রোহীদের ছাউনি থেকে। আইভান ওগারেফ এই আশা করেছিল যে, এ অবস্থায় দু-একদিন থাকলে নগররক্ষীরা একটু নিশ্চিন্ত হয়ে কাজে ঢিলা দেবে—প্রাচীরের ওপর অতটা নজর রাখা দরকার মনে করবে না।

তাই হ'ল। ওগারেক সুযোগ বুঝে একটা মোড়ানো কাগজের টিরকুট প্রাচীরের বাইরে ফেলে দিল। রাত্রির অন্ধকারে জিপসী পাহারে সেই কাগজ এনে দিল আমীর ফেওকার খানের হাতে।

তাতার সেনাধ্যক্ষগণ জানতে পেল—পরদিন ৫ই অক্টোবর দুপুর রাত্রির অন্ধকারে নগরের বলসিয়া ফটক খোলা থাকবে!

একত্রিশ

আইভান ওগারেকের উদ্দেশ্য—বলসিয়া ফটক পাহারামুক্ত রাখা এবং তাতার-সেনার সম্মুখে খুলে দেওয়া। যদি অজানিতভাবে অবস্থা ঘোরালো হয়ে না পড়ে, তাহ'লে তার এ অভিসন্ধি নিঃসন্দেহে সফল হবে।

সতর্ক কৌশলে প্রতারণার সকল আয়োজন ঠিক হ'ল।

আমীরের সঙ্গে ওগারেকের পরামর্শ ছিল, তাতার দল আঙারার অপর পার থেকে শহরতলী বরাবর নদী পেরিয়ে আক্রমণ চালাবার ভান করবে। তখন নগররক্ষীগণ স্বভাবতই বলসিয়া ফটক ছেড়ে শহরতলীর দিকেই শত্রুর আক্রমণে বাধা দেবার জন্ত ঝুঁকে পড়বে। আর সেই সুযোগে আইভান ওগারেক খুলে দেবে বলসিয়া ফটক।

৫ই অক্টোবর। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সাইবেরিয়ার রাজধানী সুপ্রসিদ্ধ ইরকুটস্ক নগর আমীরের কবলিত হবে। গ্র্যাণ্ড ডিউক হবে বন্দী। বন্দী অভিভূত হয়ে দেখবে, তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে মহাশত্রু আইভান ওগারেক।

সেদিন রাজপ্রাসাদের জানালা-পথে স্পষ্ট দেখা গেল—নদীর পরপারে বিপক্ষের সেনাদলে যুদ্ধের তোড়জোড় চলেছে। অসংখ্য তাতারসেনা আমীরের দলবৃদ্ধি করছে নানাদিক থেকে এসে।

আইভান ওগারেক গ্র্যাণ্ড ডিউককে সচেতন ক'রে তুলল যে তাতারদলের উদ্দেশ্য দুইদিক থেকেই নগর আক্রমণ করা। কাজেই তাদের বাধা দেবার জন্তে এ সময়ে উত্তর দিকেই সেনা মজুত রাখা দরকার।

গ্র্যাণ্ড ডিউকও এ কথা স্বীকার করলেন। তখন অন্যান্ত দিক থেকে অধিকাংশ রক্ষীদলকে সরিয়ে এনে সমাবেশ করা হ'ল নগরের দুই প্রান্তে।

আইভান ওগারেক দুরভিসন্ধি পূরণের জন্তে যা চেয়েছিল তাই হ'ল। এবার তার উদ্দেশ্য সফল হবে। নির্দিষ্ট সময়ে বলসিয়া ফটক খুলে দেবে সে।

পূর্বদিকে পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে আছে তাতারদের বাছা বাছা সেনাদল। সঙ্কেত পেলেই তারা বিনাবাধায় ঝড়বৃষ্টি ক'রে নগরে ঢুকে পড়বে।

আক্রমণের মুখে তাতারদলকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিতে হবে—এ সঙ্কল্প নিয়ে বিরাট আয়োজন চলল সারাদিন ধ'রে। গ্র্যাণ্ড ডিউক নিজে এবং নগরের মেয়র দেখাশোনার ভার নিয়েছেন। নগরের উত্তর-ভাগেই প্রচণ্ড আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল। সেদিক রক্ষার ভার পড়ল নির্বাসিত দলের সেনাপতি ভরাসিলি ফেডরের ওপর। ভরাসিলি ফেডর মহা-উৎসাহ নিয়ে তাঁর নব-গঠিত দল সেদিকে সমাবেশ করলেন।

সূর্য অস্ত গেল। গোধূলি বেলার রাঙা আভা মিলিয়ে গেল মেঘের আনাগোনায়। কৃষ্ণপক্ষ। আকাশে কালো মেঘ। কিছুক্ষণ পরেই গাঢ় আঁধারে ঢেকে যাবে পৃথিবী। এই আঁধারেই আইভান ওগারেফের দুষ্কর্মের সুবিধা হবে।

কয়েকদিন ধ'রেই অবিরাম তুষার-বৃষ্টি প্রচণ্ড শীতের আগমন-সম্ভাবনা জানিয়ে তুলেছিল। সাইবেরিয়ার শীত। বিশেষ ক'রে সেদিন শেষবেলা থেকেই শীত অনুভূত হল নিদারুণভাবে। আঙারার স্রোতে দেখা গেল অসংখ্য বরফের চাপ।

গ্র্যাণ্ড ডিউক ও অন্যান্য কর্মচারীদের মনে আশা জাগল। এই অবস্থায় নৌকো বা ভেলা চলবে না। আর নদীর জল যদি জমেও যায়, তাহ'লেও নদীর ওপর দিয়ে হেঁটে পার হওয়া তাতারদলের পক্ষে সম্ভব হবে না। তাদের ভার সইতে পারবে না নূতন জমাট বরফ।

প্রাকৃতির যে আবহাওয়া নগরবাসীদের মনে অনুকূল আশা জাগিয়ে তুলেছিল, আইভান ওগারেফ তাতে উদ্বেগ বোধ করতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি। তার কারণ এই বিশ্বাসঘাতক ভাল ক'রেই জানত যে তাতারদল কোন মতেই নদী পেরিয়ে এসে নগর আক্রমণের চেষ্টা করবে না। তাতারদের এই যে আক্রমণের তোড়জোড়—এ শুধু নগরবাসীদের লক্ষ্য অন্যদিকে সরিয়ে রাখবার ছল-কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়।

রাত্রি তখন ১টা। নদীর অবস্থা হঠাৎ অদ্ভুত রকম বদলে গেল। নদী পার হবার যে দারুণ বাধা ছিল, সে বাধা কেমন ক'রে গেল স'রে। আঙারার বুকে আবার দেখা গেল তরল জলস্রোতের তরতর্ গতি। অগণিত বরফের চাপ আর বড় নেই। মাঝে মাঝে যে দু-একটি চাপ দেখা গেল, সেগুলো যেন বিস্তীর্ণ বরফের পাহাড় ভেসে-পড়া সাধারণ টুকরো।

গ্রাণ্ড ডিউক ভাবিত হলেন। সবারই ধারণা হল—হয়ত কোথাও বরফ ধসে ধসে নদীর এপারে ওপারে বাঁধ প'ড়ে গেছে। নদীর এই রকম হঠাৎ পরিবর্তন এই কারণেই।

তাই হয়েছিল। নাদিয়া, বাইকেল ক্লীক, বিদেশী দুজন সাংবাদিক এবং অন্যান্য পলায়মান আরোহীদলের ভেলা সেই সময়েই বরফে আটকে পড়েছিল।

আতারা নদীপথ এখন আক্রমণকারীদের সম্মুখে সম্পূর্ণ মুক্ত। এ সুযোগে তারা নৌকো বা ভেলা-যোগে সহজেই নদী পার হতে পারে। নগররক্ষীরা আরও সতর্ক হয়ে উঠল।

দুপুর রাত্তির পর্যন্ত এভাবে কাটল। পূর্ব-প্রান্তে বলসিয়া কটক এখন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। আকাশে কালো মেঘ। চারদিকে গভীর রাত্রির কালো আঁধার। নগরের অদূরে কালো পাহাড়ের সারি। সবই একাকার, কালিময়।

ঠিক এমনি সময় তাতার শিবিরে দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলে উঠল কয়েকটি মশাল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের চঞ্চল গতিবিধিও সুরু হ'ল।

এই বুঝি আক্রমণের ইঙ্গিত? কিন্তু মশালগুলো আবার একে একে নিভে গেল। তার পরেই সব চুপচাপ।

আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল। নূতন কিছুই দেখা গেল না। একই রকম থমথমে অবস্থা। গ্রাণ্ড ডিউক এবং অন্যান্য কর্মচারীদের মনে কেমন একটা সন্দেহ জাগল—হয়ত কোথাও কোন গোলমাল রয়ে গেছে। নগররক্ষীদের হতচকিত ক'রে তোলাই কি তাতারদলের অভিপ্রায়?

কিন্তু কি হেতু?

বলসিয়া প্রাসাদের নিচতলায় আইভান ওগারেফের বাসকক্ষ। বাইরে প্রশস্ত বারান্দা। দু-এক পা এগিয়ে এলেই নিচে নদীর দৃশ্য চোখে পড়ে।

সে কক্ষও এখন অন্ধকার। ওগারেফ জানালার ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে। সময়ের অপেক্ষা করছে সে—সুযোগ বুঝে সঙ্কেত করবে তাতারদলকে, এবং ঝড়ের বেগে ছুটে গিয়ে বলসিয়া কটক খুলে দেবে।

বাঘ যেমন শিকার দেখে ঝোপের আড়ালে ওৎ পেতে থাকে—ঠিক তেমনি ভাবে আইভান ওগারেফ জানালার চাতালের ওপর—যেখানে আঁধার বেশ গাঢ় হয়ে উঠেছে, সেখানে হামাগুড়ি দিয়ে ব'সে রইল। অদূরে শিকার চলাফেরা করছে। সুযোগ বুঝে সে লাফিয়ে পড়বে।

দুটো বাজবার কয়েক মিনিট আগে গ্র্যাণ্ড ডিউক একবার আইভান ওগারেফের খোঁজ করলেন। একজন রক্ষীসেনা তাকে খুব ডাকাডাকি ক'রে গেল। কিন্তু আইভান ওগারেফ কোন সাড়া দিল না। জানালার গোড়ার দিকে আরও এগিয়ে অন্ধকারে লুকিয়ে রইল।

গ্র্যাণ্ড ডিউক খবর পেলেন—রাশিয়ার রাজদূত প্রাসাদে নেই।

গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল।

এই-ই সময়। সঙ্কেত পেলেই তাতারবাহিনী বলশিয়া ফটক আক্রমণ করবে—আমীরের সঙ্গে এই বন্দোবস্তই তার ছিল। আইভান ওগারেফ বারান্দার রেলিং ধরে এবার উঠে দাঁড়াল। তার ডানহাতে বারুদ-মাখান এক গোছা সুতো।

নিচে আঙারা নদী। প্রবল স্রোতের গভীর আওয়াজ শোনা যায়। ওগারেফ পকেট থেকে দেশলাই বের ক'রে সুতোর গোছায় আগুন ধরিয়ে ফেলে দিল নদীর জলে।

নির্দিষ্ট সময়ে ইর্কুটস্ক নগরে একটা প্রবল অগ্নিকাণ্ড ঘটাবার আয়োজনও আইভান ওগারেফ ক'রে রেখেছিল। কিছুদূরে পোষ্‌কাভস্ক শহর। সেখানে বড় বড় জালা ভর্তি ক'রে প্রচুর পরিমাণে খনিজ তৈল ন্যাফথা জমিয়ে রাখা হয়েছিল।

প্রহরীদের উপর আইভান ওগারেফের আদেশ ছিল, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই এই তৈলধারা ধীরে ধীরে নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে হবে।

তাতার-রক্ষীরা তাই করেছিল।

কয়েক ঘণ্টা আগে সাংবাদিক অলসাইড জুলিভেটও খেয়ালবশে জলে হাত দিয়ে টের পেয়েছিল—আঙারার জলে তরল ন্যাফথার স্রোত ভেসে চলেছে।

আইভান ওগারেফের এ জঘন্য আয়োজন যুদ্ধের নিয়ম নয়। কিন্তু সে রাশিয়ান হলেও এখন অসভ্য তাতারদের সহকর্মী। তাই এই জঘন্য মনোবৃত্তি নিয়ে নিজের দেশের বিরুদ্ধে এমন নির্মম ঘৃণিত কাজ করতে একটুও ইতস্ততঃ করল না।

তুবড়ির মতো চিড়বিড় ক'রে সুতোর গোছা পড়ল নদীর জলে। বিদ্যুৎ চমকের মতো আগুন ছড়িয়ে পড়ল স্রোতের পেছনে ও সম্মুখ দিকে। নীল রঙের শিখা দাউ দাউ ক'রে ছুটে গেল নদীর এপার-ওপারে। রাশি রাশি ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে লাগল উপরের দিকে। যে-সব বরফখণ্ড

ভেসে চলেছিল, আগুনের ছোঁয়া পেয়ে গ'লে যেতে লাগল মোমের মতো। নিদারুণ হিস্‌-হিস্‌ আওয়াজ এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করল।

পরক্ষণেই দেখা গেল শহরের উত্তরে ও দক্ষিণে শহরতলীতে আগুন ধ'রে গেছে।

—তারপর!·· দাঁতে দাঁত চেপে বলল আইভান ওগারেফ।

সঙ্কেত পেয়ে তাতার-সেনাদল উল্লাসে কোলাহল ক'রে উঠল। অস্ত্রের ঝঙ্কার উঠল বেজে, সহস্র সহস্র বন্দুক পিস্তলের আওয়াজ হতে লাগল।

বিব্রত হয়ে পড়ল নগররক্ষীদল। একদিকে তাতারদের অগ্রগতি, অপর দিকে আগুনের লেলিহান শিখা। নদীকূলের ঘরবাড়ী জ্বলছে দাউ দাউ ক'রে। সে আগুন লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটেছে এগিয়ে—এখনি সমস্ত নগর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দেবে।

বিপদ-সঙ্কেত বেজে উঠল:

একদল মরীয়া হয়ে ছুটল নদীর ধারে প্রাচীরের পাশে তাতারদের প্রতিরোধ করতে, আর একদল আগুন নেভাবার জন্যে পাগল হয়ে উঠল।

বলশিয়া কটক এখন সম্পূর্ণ মুক্ত।

আইভান ওগারেফ বারান্দা ছেড়ে কক্ষে ঢুকল। তখন এ-কক্ষও আলোকিত হয়ে উঠেছে। এবার সে বেরিয়ে পড়বার উপক্রম করল।

কিন্তু দরজা খুলতেই দমকা বড়ের মতো ঘরে ঢুকল একটি স্ত্রীলোক। তার সর্বাঙ্গ সিক্ত। পরিচ্ছদ বেয়ে টপ্‌টপ্‌ ক'রে জল ঝরছে। মাথার চুল এলোমেলো।

—সাঙারে···

বিস্মিতকণ্ঠে ওগারেফ বলল। তারই একমাত্র সহচরী জিপসী রমণীটি ছাড়া এ সময়ে আর কেউ এখানে আসতে পারে, এ কল্পনাও সে করতে পারেনি।

কিন্তু এ সাঙারে নয়—নাদিয়া।

যখন নাদিয়া ও মাইকেল প্রকাণ্ড বরফখণ্ডের ওপর আশ্রয় নিয়ে ভেসে চলেছিল ইরকুটস্কের দিকে, সে-সময়ে হঠাৎ নদীর জলে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। নাদিয়া চেঁচিয়ে ওঠে এই আসন্ন বিপদে। আগুনের হাত এড়াবার জন্যে মাইকেল নাদিয়াকে নিয়ে ডুবে যায়। প্রায় একশত গজ দূরে ছিল ইরকুটস্কের বড় জেটি। অতিকষ্টে জলের নিচ দিয়ে সাঁতরে তারা জেটিতে ওঠে।

এমনি ক'রে মাইকেলের দুর্গম যাত্রাপথ শেষ হয়।

আগুনের শিখা দুরন্ত সাপের জিহ্বার মতো লিক্‌ লিক্‌ ক'রে প্রাসাদের প্রাচীর লেহন করছিল, কিন্তু তখনও আগুন ধরিয়ে দিতে পারেনি।

নাদিয়ার হাত ধ'রে মাইকেল এসে দাঁড়াল ইয়ুকুটিকের বাড়িতে। তারপর দশ মিনিটের মধ্যে আসে রাজপ্রাসাদের প্রবেশ পথে।

এই বিপদে নগরবাসীদের সুবিধার জন্যে নদীর দিকে প্রাসাদের ফটক খুলে দেওয়া হয়েছিল। নাদিয়া ও মাইকেল সে-পথে প্রাসাদে ঢুকে পড়েছিল।

প্রাসাদের নিচতলায় বিব্রত সেনাপতি ও অন্যান্য রাজকর্মচারীরা আত্ম কর্তব্যের আদেশের জন্যে ছুটোছুটি করছিলেন। এ কারণে সেখানে ভিড় জমে গিয়েছিল।

এই ভিড়ের মাঝে মাইকেল ও নাদিয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নাদিয়া তখন ব্যতিব্যস্ত-ভাবে ছুটোছুটি ক'রে খুঁজতে থাকে মাইকেলকে। মহামান্য গ্র্যাণ্ড ডিউকের কাছে এখনি তাকে নিয়ে যেতে হবে।

হঠাৎ একটি কক্ষের দরজা-পথে উজ্জ্বল আলো তার চোখে পড়ে। অজ্ঞভাবে সে ঢুকে পড়ে সেই কক্ষে এবং ঢুকেই সে চমকে ওঠে। তার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে সেই লোক—যাকে সে প্রথমে দেখেছিল ইসিমে, তারপর টমস্কে। সেই দুরাত্মার পাপ হাত—এখন একটি স্বাধীন নগরকে অসভ্য শত্রুর হাতে তুলে দিতে উন্মুখ।

নাদিয়া হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল: আইভান ওগারেফ…

ছদ্মবেশী আইভান ওগারেফের অন্তর কেঁপে উঠল এই চীৎকার শুনে। তার নাম—তার আসল পরিচয় এবার প্রকাশ হয়ে পড়ে বুঝি! তার সকল অভিসন্ধি মুহূর্তে বুঝি বিফল হয়ে যায়! কিন্তু কি করবে সে এখন? একমাত্র উপায়—যে তার নাম উচ্চারণ করেছে, এই মুহূর্তে তাকে হত্যা করা।

আইভান ওগারেফ নাদিয়ার দিকে রুখে এল। অসহায়া নাদিয়া! চক্ষের নিমেষে সে কোমর থেকে ছোরা বের ক'রে আত্মরক্ষার জন্যে কঠোর হয়ে দাঁড়াল দেওয়ালের গা ঘেঁসে। সঙ্গে সঙ্গে আবার চেঁচিয়ে উঠল: আইভান ওগারেফ…

নাদিয়ার একমাত্র আশা—এই ঘৃণিত নাম শুনে কেউ যদি তার সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসে!

ওগারেফ থমকে দাঁড়াল। দাঁতে দাঁত চেপে চাপা গলায় বলল: আঃ… আস্তে…চেঁচিও না…

ঘৃণায় নাদিয়ার সর্ব শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। ওগারেফের দুর্বলতায় এবার তার সাহস হ'ল দ্বিগুণ। কণ্ঠস্বর আরও দশগুণ বেড়ে গেল। সে আবার চেঁচিয়ে বলল: আইভান ওগারেফ… শয়তান…

আইভান ওগারেফের আর সহ্য হল না। রাগে তার দু'চোখ বড় বড় করে

জ্বলে উঠল। ক্ষিপ্রভাবে কোমর থেকে ছোরা বের ক'রে পাগলের মতো ছুটে এল নাদিয়ার দিকে।

নাদিয়া একটু স'রে কক্ষের এককোণে দেয়াল ঘেঁসে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার হাতের ছোরা বাইরের প্রচণ্ড আগুনের আলোয় ঝকঝক্ করে উঠল। এই বুঝি তার শেষ-চেষ্টা! আইভান তার ওপর লাফিয়ে পড়ল বুঝি!

কিন্তু চক্ষের নিমেষে নাদিয়া দেখল—একটা দুর্বার শক্তি দুর্বৃত্তকে সহসা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

—মাইকেল! ব্রাদার···আশায় আনন্দে নাদিয়ার চোখে জল দেখা গেল।

মাইকেল স্তব্ধ সম্মুখে দাঁড়িয়ে।

মাইকেল নাদিয়ার চীৎকার শুনতে পেয়েছিল। সেই চীৎকার লক্ষ্য ক'রে সে এগিয়ে এল এই সঙ্কট মুহূর্তে—খোলা দরজা দিয়ে।

—ভয় নেই নাদিয়া···এই ব'লেই মাইকেল আইভান ও নাদিয়ার মাঝে গিয়ে দাঁড়াল।

—আঃ · একটা জোর নিশ্বাস বেরিয়ে এল নাদিয়ার মুখ দিয়ে। চেঁচিয়ে বলল: সাবধান ব্রাদার···বিশ্বাসঘাতকের হাতে অস্ত্র রয়েছে···চোখও আছে তার। সাবধান ··

ওগারেফ উঠে দাঁড়াল। এবং একটি অন্ধ লোকের সম্মুখে নিজের অসম্ভব সুবিধার কথা ভেবে তখুনি সে লাফিয়ে পড়ল মাইকেলের ওপর।

নাদিয়া ভয়ে চোখ বুঁজে চেঁচিয়ে উঠল: ব্রাদার···

মাইকেল খপ্ ক'রে ওগারেফের বাহু চেপে ধরল! তারপর ছোরা কেড়ে নিয়ে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে ফেলে দিল মাটিতে।

অপমানে ওগারেফের চেহারা কালো হয়ে উঠল। এখনও সে অস্ত্রহীন নয়। একটা ঝন্‌ঝন্ শব্দ শোনা গেল। নাদিয়া দেখল—ওগারেফের হাতে ভীষণ তরবারি ঝকঝক্ করছে।

একজন অন্ধ। অন্ধের ওপর খাড়া তুলেছে আইভান ওগারেফ। তুলনায় সে কত শক্তিমান্!

নাদিয়ার বুক দুরদুর কেঁপে উঠল। সে ছুটে গেল দরজার দিকে। এবং সাহায্যের জন্য প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল।

—দোর বন্ধ ক'রে দাও, নাদিয়া।—মাইকেল বলল: ডাকাডাকি করো না। আমি একা লড়ব। একটা শয়তানের মুখোমুখী দাঁড়াতে ভয় করে না মহামান্য জারের সংবাদবাহক। সাহস থাকে তো আসুক সে! আমি প্রস্তুত।

ওপারেক একটা কথাও বলল না। সে নিঃশব্দে উঠে হামাগুড়ি দিয়ে ধ'সে আক্রমণের উপক্রম করল—রক্তলোভী বাঘ যেমন ক'রে নিঃশব্দে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঠিক তেমনিভাবে। সে এগোতে লাগল অতি নিঃশব্দে পা টিপে-টিপে—এমন কি তার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দও যাতে মাইকেলের কানে না পৌঁছে। বিশ্বাসঘাতক যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত না হয়ে গুপ্তহত্যার চেষ্টা করল।

মাইকেলের কথায় নাদিয়ার মনে বিশ্বাস ফিরে এল বটে কিন্তু ভয়ে তার সারা দেহ কাঁটা দিয়ে উঠল। তার চোখে-মুখে একই সঙ্গে দেখা গেল শ্রদ্ধার আভা এবং ভীতির ছায়া। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবার সে যেন সাক্ষী হয়ে দাঁড়াল এই ভয়ঙ্কর দ্বন্দ্বের। মাইকেলের একমাত্র অস্ত্র সেই লুকিয়ে রাখা সাইবেরিয়া দেশীয় ছোরা। কিন্তু সে অন্ধ। আর তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তলোয়ারধারী দুর্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী। কোন্ এক অদৃশ্য দেবতা যেন অন্ধের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। নতুবা কেমন ক'রে সে এমন নিঃশঙ্কচিত্তে পুনঃপুনঃ আত্মরক্ষা করে শয়তানের আক্রমণের মুখে?

আইভান ওপারেক মাইকেলের মুখের দিকে তাকাল। ভয় এবং দুর্ভাবনা জাগল তার মনে। তার প্রতিদ্বন্দ্বী অন্ধ—দৃষ্টিশক্তিহীন। কিন্তু তার এই অচঞ্চল সাহস তার ওপারেকের সাহসের বুক ছিন্ন ক'রে দিল। তবু সে নিরস্ত হ'ল না। সে কি দেখে শুনেও বলতে পারে এই অন্ধ মানুষটিই জয়ী হবে?

এবার তার আক্রমণ রোধে কে?

ওপারেক হঠাৎ লাফিয়ে পড়ল মাইকেলের বুক লক্ষ্য ক'রে।

কিন্তু মাইকেলের পাকা হাত। অদ্ভুত কৌশলে সে ব্যর্থ ক'রে দিল তরবারির প্রচণ্ড আঘাত। একটি আঁচড়ও তার গায়ে লাগল না! বীর-শান্তভাবে সে আবার দাঁড়াল দ্বিতীয় আক্রমণের প্রতীক্ষায়।

আইভান ওপারেকের মন দমে গেল। কয়েক ফোঁটা ঘাম ঝ'রে পড়ল তার কপাল বেয়ে। সে এক-পা পিছিয়ে গেল। তারপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল সামনের দিকে। কিন্তু এবারও তার তরবারির আঘাত ফিরে এল মাইকেলের ছোরায় ঘা খেয়ে।

অপমানে—আক্রোশে ওপারেক পাগল হয়ে উঠল। মাইকেল তখনও তার সম্মুখে অচল অটলভাবে দাঁড়িয়ে—যেন জীবন্ত পাষাণমূর্তি। হঠাৎ ওপারেকের চোখ পড়ল প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখের ওপর। এবং সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল সে। এ কি! তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে একজোড়া জীবন্ত বিস্ফারিত চক্ষু। জ্বলন্ত দৃষ্টি। সে দৃষ্টি তীরের ফলার মতো ছিন্নভিন্ন ক'রে দিল তার মর্মস্থল। যে চোখ দেখতে পায় না—দেখতে পারে না, সে চোখের দৃষ্টি তার মনের ওপর এক ভয়াবহ ঘোর ছড়িয়ে দিল।

অসহায়ের মতো আর্তনাদ ক'রে উঠল আইভান ওগারেফ।

—অন্ধের চোখ—দেখতে পাচ্ছে সে!

ভীত বন্যপশু যেমন এক-পা দু'পা ক'রে পিছিয়ে আত্মরক্ষার আশ্রয় খোঁজে গুহামুখে, তেমনি সেও ভয়চকিত দৃষ্টি মাইকেলের চোখের ওপর রেখে ধীরে ধীরে দরজার দিকে পিছুতে লাগল।

পাষাণমূর্তি এবার সজীব হ'ল। ওগারেফের দিকে এগিয়ে এল মাইকেল স্ট্রগফ। ঠিক তার সম্মুখে এসে বলল: হাঁ, দেখতে পাচ্ছি — স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বিশ্বাসঘাতকের মুখের ওপর সেই চাবুকের ছাপ। আর দেখছি এবার কোথায় তোমায় আঘাত করবো। কাপুরুষ! পারো তো নিজেকে বাঁচাও

—দেখতে পাচ্ছে!—নাদিয়া অবাক হ'ল। ভগবান একি সত্যি!

আইভান বুঝতে পারল—আর রক্ষা নেই। তাই সে মনের সকল সাহস সঞ্চয় ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাইকেলের ওপর। ছোরা ও তলোয়ারের ঠোকাঠুকিতে আগুনের কণা ছিটকে পড়তে লাগল। ছোরার নিপুণ লক্ষ্য,—সে নিপুণতা কেবল সাইবেরিয়ান শিকারীদের হাতেই শোভা পায়। প্রচণ্ড ঘা খেয়ে তলোয়ার দু-টুকরো হয়ে উড়ে গেল দু-দিকে। চক্ষের নিমেষে ছোরা আমূল ব'সে গেল ওগারেফের বুকে।

বিশ্বাসঘাতক আইভান ওগারেফের দেহ লুটিয়ে পড়ল।

ঠিক এই মুহূর্তে সশব্দে দরজা খুলে গেল। মহামান্য গ্র্যাণ্ড ডিউক—সঙ্গে জনকয় সশস্ত্র রক্ষী চঞ্চলপদে কক্ষে ঢুকলেন।

গ্র্যাণ্ড ডিউক এগিয়ে এলেন। দেখলেন—রাশিয়ার রাজদূতের প্রাণহীন দেহ রক্তে গড়াগড়ি যাচ্ছে। আর সামনে দাঁড়িয়ে একজন সাইবেরিয়ান যুবক ও একটি মেয়ে।

তিনি রাগে গর্জে উঠলেন: কে ওকে হত্যা করেছে?

—আমি!...মাইকেল স্ট্রগফ জবাব দিল।

একজন রক্ষীসেনা তার মস্তক লক্ষ্য ক'রে পিস্তল উঠাল। গ্র্যাণ্ড ডিউক হাত তুলে বাধা দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন: তোমার নাম?

—হুজুর!...মাইকেল বিনীতভাবে বলল: হুজুরের পায়ের তলায় প'ড়ে আছে—কে সে?

—রাশিয়ার রাজদূত। মহামান্য জারের সংবাদবাহক।

—না হুজুর, মহামান্য জারের সংবাদবাহক এ নয়। এর নাম আইভান ওগারেফ।

গ্র্যাণ্ড ডিউক চমকে উঠলেন: আইভান ওগারেফ!

—হাঁ হুজুর, বিশ্বাসঘাতক আইভান ওগারেফ।
—তা হ'লে তুমি কে?
—হুজুর! আমার নাম মাইকেল স্ট্রগফ।

বত্রিশ

মাইকেল অন্ধ নয়। তার চোখের দৃষ্টি বরাবরই ছিল আগের মতো। কি ক'রে তা সম্ভব হ'ল? মানুষের জীবনে সে এক অদ্ভুত রহস্য। শারীরিক এবং মানসিক প্রভাবও ছিল এর মূলে, যার ফলে গনগনে তরবারির ফলা চোখের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে নেওয়া সত্ত্বেও তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করতে পারেনি।

আমরা জানি, যখন মাইকেলের চোখ নষ্ট ক'রে দেবার আয়োজন হয়, সে-সময় তার মা মার্ফা স্ট্রগফ সেখানে ছিল এবং নিরুপায় আবেগে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ছেলের দিকে, মাইকেল জানত মায়ের স্নেহকরুণ মূর্তি আর সে দেখতে পাবে না—এই দেখাই তার জীবনের শেষ-দেখা। ঠিক এই অবস্থায় ছেলের পক্ষে মায়ের দিকে যেমন ক'রে তাকানো স্বাভাবিক, মাইকেলও তেমনি করুণ আবেগে তাকিয়েছিল। সে চেষ্টা করেছিল চোখের জল চেপে রাখতে, কিন্তু তার ফল হয় অন্য রকম। অশ্রুধারা তার অন্তর ঠেলে উপরে উঠতে থাকে, শেষে চোখের পাতার তলায় এসে জমা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখের ক্ষীণ পর্দার উপর ছড়িয়ে পড়ে। এই চোখের জলই তাকে বাঁচায়। জ্বলন্ত আগুনে-লাল তরবারির ফলা চোখের কাছে নিয়ে যেতেই তার উত্তাপে সঞ্চিত চোখের জল চোখের তারার উপর প্রচুর বাষ্প জমিয়ে তোলে। এই বাষ্পশক্তিই জ্বলন্ত তলোয়ারের ফলার ভীষণ প্রভাব নষ্ট ক'রে দেবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। লোহার কারখানায় যারা লোহা-গালাইয়ের কাজ করে, বাষ্পে হাত ডুবিয়ে গলিত লোহাকেও তারা ধরতে পারে অনায়াসে—তাতে কোন অনিষ্টই হয় না। ঠিক একই কারণে এমন হয়।

মাইকেল তখুনি বুঝতে পেরেছিল—সে অন্ধ হয়নি। কিন্তু একথা সে গোপন রাখল। এ অবস্থায় সে দেখতে পেয়েছিল—তার কর্তব্য-সাধনের নূতন পথ। যেহেতু সে অন্ধ, সেইজন্য তার চলার পথ অনেকটা বাধামুক্ত। অন্ধের উপর মানুষের একটা স্বাভাবিক সহানুভূতি থাকে, কাজেই এ সুযোগ সে নষ্ট করতে পারে না। অন্ধকে কে সন্দেহ করবে? নাদিয়ার কাছেও সে এ-কথা গোপন রাখল। এমন কি সে অন্ধ নয়, ভাব-ভঙ্গিতেও তা প্রকাশ পেল না।

একমাত্র তার মা মার্ফা স্ট্রগফ—তিনিই এ-কথা জানতেন। টমস্কের প্রান্তরে মাইকেলকে একা ফেলে শত্রুরা যখন স'রে গেল, তখন মাইকেল

মায়ের কপালে চুমু খেয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিল এবং কানে কানে এ-কথাও তাঁকে জানিয়েছিল।

ঘাতকের কাজ শেষ হবার পর ওগারেফ মাইকেলকে অন্ধ ব'লে ব্যঙ্গ করেছিল এবং তার চোখের সামনে মহামান্য জারের গোপন চিঠিখানা খুলে ধরেছিল। মাইকেল সেই সুযোগে চিঠিখানা প'ড়ে নেয়, এবং তখনই জানতে পারে বিশ্বাসঘাতকের জঘন্য মতলব। এ কারণেই সে আবার কঠোর সঙ্কল্প নিয়ে বিদ্রোহীদলের আগে ইরকুটস্ক পৌঁছাবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়েছিল। সে বুঝতে পেরেছিল, সাইবেরিয়ায় রাজ্যের নিরাপত্তা এবং মহামান্য গ্র্যাণ্ড ডিউকের জীবন একমাত্র তারই হাতে নির্ভর করছে। যেমন ক'রেই হোক, সে তার কর্তব্য করবে।

মাইকেল সব কথা সংক্ষেপে ব'লে গেল মহামান্য গ্র্যাণ্ড ডিউকের সম্মুখে। এবং যাত্রাপথে নাদিয়ার ত্যাগস্বীকারের কথা বলতে গিয়ে নিজেকে আর সামলে রাখতে পারল না,—উচ্ছ্বসিত আবেগে তার গলা কেঁপে উঠল।

গ্র্যাণ্ড ডিউক অবাক হলেন। জিজ্ঞেস করলেন : এ মেয়েটি কে?

মাইকেল বলল : নির্বাসিত ডাঃ ওয়াসিলি ফেডরের কন্যা।

—ক্যাপ্টেন ফেডরের মেয়ে! গ্র্যাণ্ড ডিউক বিস্ময়ে আনন্দে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন : মা, তুমি আর নির্বাসিতের মেয়ে নও। ইরকুটস্কে নির্বাসিত ব'লে কেউ নেই।

নাদিয়া নতজানু হয়ে ব'সে পড়ল গ্র্যাণ্ড ডিউকের পায়ের কাছে। শত বিপদ-আপদ, শোক-দুঃখ যার দেহমনকে একটুও টলাতে পারেনি, এবার পিতার মুক্তির সংবাদ শুনে আনন্দে তার দেহের সকল শক্তি যেন অভিভূত হয়ে পড়ল।

গ্র্যাণ্ড ডিউক সস্নেহে তার হাত ধ'রে উঠালেন এবং আর এক হাত বাড়িয়ে দিলেন মাইকেলের দিকে।

এক ঘণ্টা পরে।

পিতাকে জড়িয়ে ধ'রে নাদিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

তাতারবাহিনীর আক্রমণ বিফল হ'ল। দু'বার তারা নগর আক্রমণ করেছিল। বলগিয়া ফটক খুলে দেওয়া হয়েছে, এ ধারণা নিয়েই তারা এগিয়ে এসেছিল। ক্যাপ্টেন ফেডর তার আত্মঘাতক দল নিয়ে মহাবিক্রমে সেদিক রক্ষা করেন। বিচারবুদ্ধি-বলে হঠাৎ তাঁর মনে সন্দেহ জাগে এবং নজর পড়ে বলগিয়া ফটকের ওপর। তাতারদল সেখানে ভীষণ বাধা পায়,

আগুনও আর বেশি দূর ছড়াতে পারেনি। নগরবাসীদের প্রাণপণ শক্তি সেদিকে নিয়োজিত হয়েছিল। তখন ন্যাকড়া কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্বলে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। নগর রক্ষা পেল।

নগর প্রাচীরের আশে-পাশে অসংখ্য তাতার-সেনা প্রাণ হারান। ভোর-রাত্রেই আমীর ফেওফার খান অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে শিবিরে আশ্রয় নিলেন।

ঠিক বলশিয়া ফটকের মুখে একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ প'ড়ে ছিল। সে আর কেউ নয়—জিপসী রূপসী সাঙারে। সে সেনাদলের আগে আগে ছুটে এসেছিল, আশা ছিল—আইভান ওগারেফের সফলতায় সে-ই আগে তাকে সংবর্ধনা জানাবে। কিন্তু তার সে আশা বিফল হয় এবং ফিরে যেতেও পারেনি।

এই ঘটনার পর তাতারবাহিনী আর নগর আক্রমণের চেষ্টা করেনি। আইভান ওগারেফের মৃত্যুতে তারা হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল।

নগররক্ষীদল তবু সতর্ক হয়ে রইল।

তারপর ৭ই অক্টোবর। ভোরবেলায় হঠাৎ কামানের নির্ঘোষ শোনা গেল। নগরবাসীরা আশ্বস্ত হ'ল। ইয়াকুটস্ক থেকে রাশিয়ান বাহিনী এসে পড়েছে।

তাতারবাহিনী ভয় পেল। নগরের বাইরে আর একটা যুদ্ধের মুখোমুখি হবার মতো দুঃসাহস তাদের ছিল না। কাজেই তারা শিবির উঠিয়ে দিল।

ইরকুটস্কের বিপদ কাটল।

রাশিয়ান সেনাবাহিনীর অগ্রগামী দলের সঙ্গে দু'জন সাংবাদিক নগরে প্রবেশ করে। তারা অলসাইড জুলিভেট ও হ্যারি ব্লাউন্ট। আঙারা নদীর অগ্নিকাণ্ডের মুহূর্ত আগে তারা বরফের চাঁইয়ের ওপর দিয়ে কোন রকমে পারে আশ্রয় নেয়। অন্যান্য সঙ্গীরাও তাই করেছিল। এ বিষয়ে অলসাইড তার নোটবই-এ চমৎকার এক মন্তব্য লিখল :

> শরবতের পেয়ালায় লেবুর রসের মত নিশ্চিহ্ন হ'য়েই যেতাম! বরাত জোরে ছিটকে প'ড়ে বেঁচে গেছি।

মাইকেল ও নাদিয়ার সঙ্গে দেখা হল তাদের। ভারি খুশী হ'ল তারা। এবং আরও খুশী হল মাইকেল অন্ধ হয়নি জেনে। হ্যারি ব্লাউন্ট তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে টেনে বের করল নোটবই আর পেন্সিল। তারপর খস্‌খস্‌ ক'রে লিখল সাংবাদিকের ভাষায় :

> আগুনে লাল লোহার ফলা সব সময়ে চোখের দর্শনশক্তি নষ্ট করতে পারে না।

তারপর দুই বন্ধু ব্যস্ত হল তাদের ভ্রমণ-পথের বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিবৃত নিজ নিজ কাগজের উপযোগী ক'রে লিখবার জন্তে। কয়দিন পরে লণ্ডনে ও প্যারিসের নানা কাগজে তাতার-অভিযান সম্পর্কে দুটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ বেরুল। কিন্তু কি আশ্চর্য! এই দুই প্রবন্ধের ভেতর অতি সাধারণ বর্ণনায়ও কোথাও কোন মতের অমিল দেখা গেল না। বিভিন্ন সংবাদদাতাদের বর্ণনায় এমন অসাধারণ মিল কোনকালেই দেখা যায় না।

আমীর কেওকার খানের এত বড় অভিযান তাতারদলের পক্ষে ভয়ানক দুর্ভাগ্যজনক হয়েছিল। পথে পথে রাশিয়ান সেনার আক্রমণে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এবং যে-সব শহর তারা দখল করেছিল, সবই আবার রাশিয়ানদের অধিকারে চ'লে যায়। তা'ছাড়া শীতও এসে পড়েছিল। প্রচণ্ড শীতের তাড়নায় কাবু হয়ে গেল তাতারবাহিনী। শেষ পর্যন্ত মাত্র অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে আমীর কোন রকমে তাতার রাজ্যে ফিরল।

সাইবেরিয়ায় আবার শান্তি ফিরে এল।

গ্র্যাণ্ড ডিউক মস্কোতে ফিরে যাবার জন্তে ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু রাশিয়ান বাহিনীর বিজয়োৎসবে উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন বোধে আরও কিছুদিন তাঁকে অপেক্ষা করতে হ'ল।

কয়েকদিন পর!

মাইকেল নাদিয়াকে বলল: নাদিয়া, বোন আমার, তুমি যখন রিগা থেকে ইরকুটস্কে রওনা হও সে-সময়ে এক মা ছাড়া আর কারও জন্যে কি প্রাণ কাঁদেনি।

নাদিয়া বলল: না ব্রাদার, তেমন কোন পরিজন-বন্ধু আমার সেখানে নেই।

—তা'হলে কি বলতে চাও, সেখানে আর কোন রকমের বন্ধন নেই তোমার?

নাদিয়া জানাল: না ব্রাদার, কিছু নেই।

মাইকেল এবার বলল: তা'হলে নাদিয়া, আমার কি মনে হয় জান? দুর্গম চলার পথে দুঃখ-কষ্টের অগ্নিপরীক্ষায় আমাদের পরস্পরের মিলন—এ যেন ভগবানের নির্দেশ—এ যেন আমাদের চির-মিলনেরই ইঙ্গিত।

নাদিয়া মাথা নোয়াল।

ওয়াসিলি ফেডর বললেন: নাদিয়া, মা আমার, তোমার মতো মাইকেলও আমার সন্তান, একথা ভাবতেও আজ কী আনন্দ!

মাইকেল ও নাদিয়ার বিবাহ-ব্যাপারে সব চেয়ে বেশি আনন্দ হয়েছিল অলসাইড জুলিভেট ও হ্যারি ব্লাউন্টের। তারা এই উৎসবে গা ঢেলে দিয়েছিল

এবং এ-সমারোহের মনোরম বিবরণও তারা তাদের কাগজের উৎসুক পাঠক-পাঠিকাদের জন্য পরিবেশন করেছিল।

এই সময়ে লণ্ডন এবং প্যারিসের মধ্যে একটা জটিল সমস্যা দেখা দেয়।

হ্যারি ব্লাউন্ট বলল জুলিভেটকে: শেষ, জানতে পারছি লণ্ডন আর প্যারিসের মধ্যে একটা গোলমাল চলছে। যাবে তুমি প্যারিসে।

জলিভেট বলল: আরে, ঠিক এই কথাটাই আমি তোমায় বলতে যাচ্ছিলাম।

তারপর খবর সংগ্রহের নেশায় দুই বন্ধু সেদিনই চ'লে গেল চীনদেশে।

আরও কয়েকদিন পর।

মাইকেল ও নাদিয়া ফিরে রওনা হ'ল মস্কোর দিকে। ডাঃ ফেডর তাদের সঙ্গে গেলেন। একদিন যে-পথে দুঃখ-কষ্টের অন্ত ছিল না—সে-পথ আজ কত মধুর—কত আনন্দে ভরা!

এবার তাদের বাহন হল রেলগাড়ী। সাইবেরিয়ার বিশাল প্রান্তর বরফে ছেয়ে গেছে। রেলগাড়ী বিনা বাধায় শোঁ শোঁ করে ছুটে চলল।

ভিনকা নদীর তীরে এসে মাইকেল ও নাদিয়া খুঁজে বের করল অসময়ের বন্ধু শান্তপ্রকৃতি পিগাসফের কবর। একটি ক্রস্ সযত্নে পুঁতে দিল সেখানে। নাদিয়া নতজানু হয়ে বসল এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাল শেষবারের মতো।

আবার পথ চলা।

সুদীর্ঘ পথ।

শেষে একদিন রেলগাড়ী এসে থামল—ওমস্ক শহরে।

বৃদ্ধা মার্ফা মাইকেল স্ট্রগফ ও নাদিয়াকে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আজ তাঁর কী আনন্দ!

কিছুদিন ওমস্ক শহরে আনন্দে কাটল। তারপর নাদিয়া ও মাইকেল মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে আবার রওনা হল মস্কোর দিকে। ডাঃ ভাসিলি ফেডর সেন্ট্ পিটার্সবার্গে চ'লে গেলেন।

মহারাজা জার এই তরুণ সংবাদবাহককে আদরে সম্বর্ধনা জানালেন এবং নিজের হাতে পরিয়ে দিলেন বহু সম্মানিত 'সেন্ট জর্জ ক্রস্'।

কালে মাইকেল স্ট্রগফ বড় পদ পেয়েছিল। কিন্তু সে তার কৃতকার্যতার কাহিনী না—পুরস্কার-লাভের ইতিহাস।

এইরূপ নানা-প্রসঙ্গ উত্থিত হইতেছে, ইত্যবসরে সেই স্বর্গীয়-স্রোতস্বতী-কূলে এক তরণী আসিয়া উপস্থিত হইল। উহা হইতে দুইটী পরম-রূপসী রমণী অবতরণ করিলেন। তাঁহাদিগের পবিত্র প্রশান্তভাব সকলকে মোহিত ও অঙ্গ-সৌরভে উপবন আমোদিত /১২/ করিল। কল্পতরু তলস্থিত মহাপুরুষ-গণের আত্মা তাঁহাদিগের প্রতি বিশুদ্ধ চিত্তে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। রমণীদ্বয় বিশ্রামার্থ তৎপ্রদেশের অনতিদূরে এক মরকতময় আসনে উপবেশন করিলেন। তখন তত্রস্থ সকলের নির্দ্দেশানুসারে তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহাদিগকে সরল সম্বোধন ও বিনীত স্বরে জিজ্ঞাসিলেন, আপনাদিগের মুখকমলের অলৌকিক শ্রীদর্শনে, আমরা আপনাদিগকে দেবকন্যা অনুমান করিতেছি। এ সুকুমার দেবশরীরে ক্লেশ সহ্য করিয়া কোথা হইতে আগমন করিলেন? কোথায় কি উদ্দেশে শুভাগমন হইয়াছিল; উভয়ের নাম কি? অকাপট্যে সমস্ত প্রকাশিলে আমরা পরমাপ্যায়িত হই। প্রথমা কহিলেন, আমার নাম প্রমদা, আমার এই সঙ্গিনীর নাম প্রিয়বাদিনী। আমরা উভয়ে সৃষ্টিকর্ত্তা কমলযোনির নিবাসে থাকি, বিঘ্ন বিপদের শান্তি করিতে মধ্যে মধ্যে মর্ত্ত্যলোকে গমন করি, সম্প্রতি আমাদিগের তথায় যাইবার কারণ এই,—কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গদেশ হইতে এক আবেদন পত্র বিধাতার নিকট আইসে, তাহাতে নরগণ বর্ণনা করিয়াছেন, বঙ্গের স্ত্রীজাতি এক্ষণে অবশ্য-কর্ত্তব্য-প্রতিপালনে বিমুখ হইয়াছেন। স্ত্রীলোকেরাই সংসার বন্ধনের মূলীভূত, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্যের কি ব্যতিক্রম হইয়াছে, তদ্বাবতের তত্ত্বাবধান করিতে কমলযোনি আমাদিগকে বঙ্গভূমিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমরা সেই সমস্ত তদন্ত করিয়া আসিলাম। ইহা শ্রবণ করিয়া, সভাস্থ সকলেই প্রিন্সের নিকট নিবেদন করিলেন, ইঁহারা আধুনিক বঙ্গ-মহিলাদিগের ইতিবৃত্তান্ত সবিশেষ কহিতে পারিবেন, অতএব সে পক্ষে যত্ন করা অত্যাবশ্যক; তদনুসারে প্রিন্স্ যত্ন করাতে প্রিয়বাদিনী, বঙ্গরমনীগণের যথাযথ বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

আমরা দেখিয়া আসিলাম বঙ্গদেশের অনেক স্ত্রী, এক্ষণে স্নেহ ও ভক্তিশূন্য; গৃহকার্য্য, রন্ধনকার্য্য ও সন্তান প্রতিপালনে নিতান্ত অপটু; /১৩/ ইঁহারা পক্ষপাত, পরনিন্দা ও কুটুম্বজনের সহিত কলহে বিশেষ নিপুণ; ইঁহাদিগের লজ্জা ও নীতি জ্ঞানের মূলে নাটক ও নভেল লেখকেরা পুনঃ পুনঃ কুঠারাঘাত করিতেছেন।

বঙ্গদেশের স্ত্রীদিগের ধর্ম্মতরুর বঙ্গদেশের আয়তন বৃহৎ, নতুবা এতদিনে ঐ কুঠারাঘাতে নিপতিত হইত। এই স্ত্রীদিগের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমতী, তাঁহারা পতিকুলাবলম্বিনী।

এক্ষণে বঙ্গের নারীরা স্বামীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে না পারিলে সন্তুষ্ট হয়েন না। পূর্ব্বে প্রাচীনা স্ত্রীরা তীর্থস্থানে যাইতেন, যুবতীরা অসূর্য্যম্পশ্যা ছিলেন। কিন্তু এক্ষণকার যুবতীরা না গমন করেন এমন স্থানই নাই। ইঁহারা পূর্ব্বকালের ন্যায় ভগিনীপতিদিগের প্রতি সাংঘাতিক পরিহাস করেন না। যাড়, ননন্দ্ ও ভ্রাতৃ-জায়ার সহিত পূর্ব্ববৎ মনান্তরের কার্য্য করিয়া থাকেন। অসার স্বামীর কর্ণে এ, ও, তা বলিয়া অন্য পরিজনের প্রতি দ্বেষ জন্মাইয়া দেন। ইঁহারা বিদ্যাশিক্ষা উপলক্ষে কেবল নভেল নাটক প্রভৃতি সামান্য পুস্তক পড়িয়া জ্ঞানোন্নতির পরিবর্ত্তে দুর্ম্মতি, কদাচার, ও কুসংস্কারের বৃদ্ধি করিতেছেন। রমণীর নাম অবলা ও সরলা ছিল, এক্ষণকার স্ত্রীরা মুখরা ও কুটীলা হইয়াছেন। ইঁহারা পরিবারের মধ্যে কেবল স্বামী, পুত্র, কন্যাদিগকে আপন বলিয়া জানেন। কেহ কেহ মাতা ও ভ্রাতাকে কি জামাতাকে প্রতিবেশীর ন্যায় ঘনিষ্ঠ দেখেন, অপরের প্রতি তাঁহাদিগের দয়া দাক্ষিণ্য কিছুই নাই।

একত্র সহবাস জন্য নিঃসম্বন্ধীয় লোককে আপদগ্রস্ত ও সন্তাপিত দেখিলে তখনকার স্ত্রীলোকের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইত, সে সময় আর নাই। পিসী, মাসী, ভগিনী, যাড়, ননন্দ্, ভ্রাতৃ-জায়া সকলে এক্ষণকার স্ত্রীলোকের সমক্ষে পীড়িতা হইতেছে, লোকান্তর হইতেছে ; চাক্ষুস দেখিলেও তাঁহাদিগের কিছুমাত্র করুণার উদয় হয় না। তুল্য /৭৪ সম্বন্ধ স্বজনের প্রতি ইতরবিশেষ ও পক্ষপাত করা ইঁহাদিগের নূতন একটী স্বভাব হইয়াছে, ইহা নিতান্ত নীচ কার্য্য। যে হেতু ঐ পক্ষপাতিত্ব পাপে যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর স্বর্গারোহণ কালে অধঃপতন হইয়াছিল। আবার জিজ্ঞাসিলে স্পষ্টাক্ষরে বলেন, এরূপ ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। যে গাভী অধিক দুগ্ধ দেয়, তাহাকে অধিক যত্ন করা যায়। হা! একথা উল্লেখ করিতেও লজ্জা বোধ হয় না। তাঁহারা সকলেই আশা করেন যে সকলে তাঁহাদিগকে ভাল বাসেন, কিন্তু আজ কাল ভাল বাসার কাজ তাঁহারা কিছুই করেন না। ইঁহারা কোন অলঙ্কারই ব্যবহার করেন না। অথচ স্বামীকে দায়গ্রস্ত করিয়া নানা প্রকার অলঙ্কার সংগ্রহ করিয়া থাকেন। অলঙ্কার সংগ্রহের ফল কি কহিব, তাহা প্রস্তুত উপলক্ষে যত টাকা ব্যয় হয়, অর্দ্ধেকেরও অধিক প্রতারক স্বর্ণকারের ভোগে আসে।